'বনফুল'

স্বৰ্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে—

১

ঘড়িতে টং টং করিয়া এগারোটা বাজিতেই কুমার উঠিয়া বসিল, নূতন করিয়া যেন আবিষ্কার করিল রাত অনেক হইয়াছে। অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। সকালেই সে সব জায়গায় টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু আসিয়া দুইবার দেখিয়া গিয়াছেন। সে পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠনগুলিতেও তেল-ভরাইয়া রাখিয়াছে যদি দরকার হয়। শান্তা, মধু, ল্যাংড়া, বোধিয়া এই চারিজন বলিষ্ঠ ভৃত্যকে বাড়ি যাইতে দেয় নাই, তাহারা রাত্রে এখানেই খাইবে এবং থাকিবে। তাছাড়া গঙ্গা তো আছেই। ঊর্মিলা সকাল হইতে বাবার মাথার শিয়রে বসিয়া আছে। মাঝে শুধু একবার উঠিয়া গিয়া খাইয়া আসিয়াছে। সবই ঠিক আছে, এখানে যাহা করিবার সে করিয়াছে। এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করিবার নাই। একবার সে উৎকর্ণ হইয়া স্টেশনের দিকে চাহিল। গাড়ির শব্দ কি? না, হাওয়া। একটা ঝোড়ো হাওয়া উঠিয়াছে। কুমারের মনে হইল একটা ভালো বই পাইলে রাত জাগিবার সুবিধা হইত। যে নূতন বইটা সে স্টেশন হইতে কিনিয়া আনিয়াছিল তাহা ডাক্তারবাবু লইয়া গিয়াছেন। পুরাতন কোন বইয়ের সন্ধানে সে সন্তর্পণে পাশের ঘরে ঢুকিল। হঠাৎ চোখে পড়িল বাবার আলমারির চাবিটা দেওয়ালে টাঙানো রহিয়াছে। চাবিটা লইয়া সে বাবার আলমারিটাই খুলিল। বাবার আলমারিতে অনেক পুরাতন বই আছে। বাবা নিজের আলমারি কাহাকেও খুলিতে দিতেন না। আলমারিটা খুলিয়া কুমার কয়েক মুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মনে হইল বাবা যাহা পছন্দ করেন না তাহা করা উচিত হইবে কি? কিন্তু এ সঙ্কোচভাব কাটিয়া যাইতে বেশী

বিলম্ব হইল না, মনে হইল বই পড়িব তাহাতে দোষ কি, নষ্ট না করিলেই হইল। টর্চের সাহায্যে সে বইগুলি কৌতূহলভরে দেখিতে লাগিল। প্রত্যেকটি বই সযত্নে রক্ষিত, মলাট দেওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। প্রত্যেক বইটিতে বাবার নাম লেখা। কোন তারিখে কেনা হইয়াছিল তাহাও লেখা আছে। কুমার গীতা, রামায়ণ, দাশরথী রায়ের পাঁচালি, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ (যাহা বহুকাল পূর্বে এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইত), দামোদর গ্রন্থাবলী, গ্যারিবল্‌ডির জীবনচরিত, ফলের বাগান, পশু-পালন প্রভৃতি বইগুলি খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। মনোমত একটা বইও নজরে পড়িল না। হঠাৎ এককোণে একটা মোটা খাতা দেখিতে পাইল সে। খাতাটা খুলিয়া দেখিল প্রথম পাতাতেই লেখা—'স্মৃতিকথা'। উলটাইয়া উলটাইয়া দেখিল বাবারই হস্তাক্ষর। কৌতূহল সহকারে পড়িতে লাগিল।

"আমার জীবন-চরিতে লিখিবার মতো কি-ই বা আছে। আমি অতি সাধারণ মানুষ, দরিদ্রের ঘরেই জন্ম। সারাজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর যুদ্ধ করিয়া মধ্যবিত্ত সমাজে স্থান পাইয়াছি। ইহার বেশী আর কোন কৃতিত্বের দাবী আমার নাই। ইহাও জানি যতটুকু করিয়াছি তাহাও ভগবানের দয়ায়। ভগবান আমার উপর দয়া করিয়াছিলেন এ গর্বটুকু অবশ্য আমি করিতে পারি। আর একটা গর্বও আমার আছে। যে সব মহাপুরুষ বাঙালী জাতির এবং ভারতবর্ষের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, যাঁহারা সমগ্র মানবজাতিরই অলঙ্কার স্বরূপ, স্বাধীনদেশে জন্মগ্রহণ করিলে যাঁহাদের নাম কাব্যে, ইতিহাসে বহুভাবে বহুবার কীর্তিত হইত, আমি তাঁহাদের সম-সাময়িক। তাঁহাদের তুলনায় যদিও আমি নিতান্ত নগণ্য, তবু এই গর্বটুকু আমার আছে যে তাঁহাদের অনেককে আমি দেখিয়াছি, অনেকের কথা শুনিয়াছি।

আমার এ জীবন-চরিত আমি লিখিতাম না। আগাগোড়া জীবনের সব কথা লেখা সম্ভবও নহে। যাহা লিখিতেছি তাহা সামান্য স্মৃতিকথা মাত্র। শৈশবের ঘটনা কিছুই আমার মনে নাই। বড় হইয়া মাতামহীর মুখে যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহাই লিখিতেছি। কিন্তু ইহাও আমি লিখিতাম না, আমার বড় ছেলের অনুরোধে লিখিতেছি। সেই আমাকে এই খাতাখানা কিনিয়া দিয়া গিয়াছে। আমার হাতেও এখন প্রচুর সময়, চুপ করিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও কাজ নাই। তাই অনেকটা সময় কাটাইবার জন্যও নিজের জীবনকথা নিজেই লিপিবদ্ধ করিতেছি। বলা বাহুল্য, অতিশয় সসঙ্কোচেই করিতেছি। ভরসা আছে ইহা বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠির নয়নগোচর হইবে না, আমার সন্ততিদের মধ্যেই নিবদ্ধ থাকিবে…"

ঊর্মিলা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, কুমার টের পায় নাই। তাহার কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিল।

"বাবার গলাটা ঘড় ঘড় করছে। তুমি মাথাটা একটু ঠিক করে' দিয়ে যাও। মাথাটা বালিশ থেকে নেমে গেছে একটু"

খাতাটা বাহিরে রাখিয়া কুমার সন্তর্পণে আলমারিটা বন্ধ করিয়া দিল। বাবার মাথাটা সত্যই বালিশ হইতে নামিয়া পড়িয়াছিল। দুইজনে মিলিয়া ঠিক করিয়া দিল।

সূর্যসুন্দর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। নাড়ানাড়িতে আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল! প্রশ্ন করিলেন, "কে বিরু"

"আমি কুমার। দাদা এখনও আসে নি"

"উশনা?"

সবাইকে খবর দিয়েছি। এই ট্রেনেই হয় তো আসবে"

"হরিবোল, হরিবোল"

সূর্যসুন্দর ধীরে ধীরে আবার চোখ বুজিলেন। ঊর্মিলা আবার

মাথার শিয়রে বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। গঙ্গা নীরবে বসিয়া পা টিপিতেছিল। কুমার ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিয়া পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

"কি বলছ"

"স্টেশনে দুটো গাড়ি পাঠিয়েছিস তো?"

"হ্যাঁ। চারজন চাকরও গেছে"

"খেয়েচিস"

"আমার খাবার ইচ্ছে নেই"

"ইচ্ছে না থাকলেও খেতে হবে তো কিছু। তখন আমি হালুয়াটা খাই নি, ওঘরে কোণে ঢাকা দেওয়া আছে, সেইটে খেয়ে নে—"

গঙ্গা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। হালুয়ার খোঁজে গেল না, পুনরায় সূর্যসুন্দরের পদসেবা করিতে লাগিল।

গঙ্গার সহিত ইহাদের রক্তের সম্পর্ক নাই। গঙ্গা বিহারী বৈশ্য। গঙ্গার বাবা হরিচাঁদ বহুকাল পূর্বে সূর্যসুন্দরের চাকর ছিল। গঙ্গা যখন দশ বছরের বালক তখন সে-ও একবছরের শিশু কুমারের বাহন ছিল। সেজন্য অনেকে তাহাকে ঠাট্টা করিয়া 'ময়ূর' বলিত। গঙ্গা এখন ব্যবসায় করে, অর্থাভাব নাই, তাহার ছেলে আই. এ. পাস করিয়াছে কিন্তু এখনও সে নিজেকে এ বাড়ির চাকর বলিয়াই পরিচয় দেয়। এখন সে কুমারের নির্ভরযোগ্য বন্ধু; দক্ষিণ হস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

গঙ্গার পিছু পিছু কুমার আবার আসিয়া বাবার ঘরে ঢুকিল।

"খেলি না?"

"বললাম তো খাবার ইচ্ছে নেই"

তাহলে পশ্চিম দিকের বারান্দায় গিয়ে একটু শুয়ে পড়। মধুকে না হয় পা টিপতে বসিয়ে দে"

"দেখি"

গঙ্গা উঠিল না। কুমার তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল, তাহার পর পাশের ঘরে চলিয়া গেল। কোণে টেবিলের ধারে একটা ক্যাম্পচেয়ার ছিল তাহারই উপর বসিয়া পড়িল সে। টেবিলের উপর যে বাতিটা কমানো ছিল তাহা বাড়াইয়া দিয়া জীর্ণ খাতাটি খুলিয়া পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিল।

"বাংলা ১২৭২ সালে পয়লা বৈশাখ মাতুলালয়ে আমার জন্ম হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া আমার মাতামহী আমার নাম রাখিয়াছিলেন সূর্যসুন্দর। মাতামহীর সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল, মাতামহ ছিলেন টোলের ন্যায়রত্ন। মাতামহীকে তিনি যখন বিবাহ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার বয়স ছিল দশবৎসর মাত্র। মাতামহীর ছিল চার। বিবাহ করা সত্ত্বেও তাঁহাদের পড়াশোনা বিঘ্নিত হয় নাই। এখন এসব গল্পের মতো শোনায় কিন্তু তখন ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল। আমার মাতামহ আমার মায়ের নাম রাখিয়াছিলেন বারাহী এবং মামার নাম শক্তিনারায়ণ। আমার মাতুলবংশ শাক্ত ছিলেন। বারাহী নামের অর্থ কি তাহা আমি অনেকদিন জানিতাম না। পরে জানিয়াছি ইহা দুর্গার নাম। পঞ্চসাগরে যে পীঠস্থান আছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বারাহী। আমার পিতার নাম কেদারনাথ। আমার পিতার বিবাহ-সম্বন্ধে একটি কৌতুকজনক গল্প মাতামহীর মুখে শুনিয়াছিলাম। গ্রামের জমিদার তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নানা স্থান হইতে বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞ ওস্তাদদের আহ্বান করেন। সেই সময় নিমন্ত্রিত হইয়া আমার পিতাও আসিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে বিখ্যাত একজন সেতারীর আসিবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়াতে নিজে আসিতে পারেন নাই,

তাঁহার প্রিয় শিষ্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমার পিতাই সেই শিষ্য। তাঁহার বয়স তখন কুড়ি বছর। দীর্ঘকান্তি গৌরবর্ণ ছিল তাঁহার। সত্যই রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। জনতার মধ্যেও তাঁহার চেহারা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার রূপ দেখিয়া এবং বাজনা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল। লোকটির পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইল অনেকে। কেহ কেহ গিয়া তাঁহাকে প্রশ্নও করিল। খবরটা মাতামহীর কর্ণগোচর হইতেও বিলম্ব হইল না। মাতামহী যখন শুনিলেন যে তিনি রাঢ়ীশ্রেণীর মুখোপাধ্যায় বংশের, তখন তাঁহার মনে হইল যে সমস্যায় তিনি পীড়িত হইতেছেন মা মঙ্গলচণ্ডী তাহার সমাধান বুঝি করিয়া দিলেন। কন্যা বারাহীর বিবাহের জন্য তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মনোমত সৎপাত্র কোথাও মিলিতেছিল না, সুন্দর, সুগায়ক, পণ্ডিতবংশের কেদার-নাথকে দেখিয়া তাঁহাকে জামাই করিবার জন্য তিনি মনে মনে ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। অরক্ষণীয়া কন্যা লইয়া তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলেন, মায়ের বয়স বারো পার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কে আগাইয়া গিয়া সম্বন্ধ করিবে? কিছুকাল পূর্বে আমার মাতামহ মারা গিয়াছিলেন, আমার মামার বয়স তখন আট বৎসর মাত্র। আট বৎসরের বালকই শেষে অভিভাবকের কাজ করিল। সেই গিয়া তরুণ সেতারী কেদারনাথকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া আসিল। দিদিমা নানারকম রান্না করিয়াছিলেন, কিশোরী কন্যা বারাহী সেগুলি পরিবেশন করিল। কথায় কথায় দিদিমা জানিতে পারিলেন যে বাবারও কোনও অভিভাবক নাই। তিনি বাল্যেই পিতৃমাতৃহীন হইয়াছেন! অর্থাৎ বিবাহ ব্যাপারে আর কাহারও অনুমতি বা মতামত লইবার প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে তিনি নিজে যাহা স্থির করিবেন তাহাই হইবে। সুতরাং আহারাদির পর দিদিমা সসঙ্কোচে তাঁহারই নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি করিলেন।

বাবা না কি হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার তো একটি বিয়ে হয়ে গেছে। দ্বিতীয়বার বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই"

দিদিমা আকাশ হইতে পড়িলেন।

"বিয়ে হ'য়ে গেছে! কোথায়?"

"আমার সেতারের সঙ্গে"

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

বাবা বলিলেন, "হাসির কথা হ'তে পারে, কিন্তু মিছে কথা নয়। সেতার নিয়েই দিনরাত থাকি। অন্যদিকে মন দিতে পারি না। রোজকার তো কিচ্ছু নেই।"

দিদিমা ইহাতে দমিলেন না। বলিলেন, "সেজন্য তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা। টাকার ভাবনা আমরা ভাবব। আমার কন্যাদায়টি তুমি উদ্ধার করে' দাও"

"কিন্তু পরিবার পালন করবার সামর্থ্য যে আমার নেই"

"পরিবার তোমাকে পালন করতে হবে না, সে ভার আমি নিচ্ছি"

বাবা গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "ঘরজামাই হ'য়ে থাকাও আমার পোষাবে না। আমি গানের আসরে আসরে ঘুরে বেড়াই। আজ কাশী, কাল মুঙ্গের, পরশু লখ্‌নউ—"

"বেশ তো তাতেও আমার আপত্তি নেই। তোমার যখন যেখানে খুশী যেও"

"ছেলেমেয়ে হলে আপনারাই তাদের ভার নেবেন?"

"নেব"

বাবা ক্ষণকাল গম্ভীর থাকিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "আমার মতো ভব-ঘুরেকে আপনি জামাই করতে চাইছেন কেন"

"তুমি বড় বংশের ছেলে বলে'। অধ্যাপকের বংশধর তুমি। এ রকম বংশ আর কোথায় পাব। আমার কন্যাদায়, বড় বিপদে পড়েছি বাবা। মনে হচ্ছে ভগবানের দয়াতেই তোমার মতো

সৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছি। আমাকে দায় থেকে উদ্ধার কর তুমি বাবা—"

"আমি সংসারের কোন ভার নিতে পারব না, এ শুনেও আপনার বিয়ে দিতে আপত্তি নেই ?"

"কিছুমাত্র না"

"বেশ, তাহলে আয়োজন করুন।"

কিছুদিন পরেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরই কিন্তু বাবা নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বছরখানেক পরে আবার ফিরিয়া আসিলেন, সপ্তাহখানেক থাকিয়া আবার চলিয়া গেলেন। এইরূপে মাঝে মাঝে তিনি আসিতেন, আবার উধাও হইয়া যাইতেন। তাঁহাকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করিত না, কারণ এই সর্তেই তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। এইভাবেই কিছুদিন চলিল।

আমার মাতুল গ্রামের পাঠশালাতেই বাংলা পড়াশোনা করিয়াছিলেন। তখন গ্রামে ইংরেজি পড়াশোনার তত সুবিধা ছিল না। কেহ ইংরেজি পড়িতে চাহিলে তাহাকে কলিকাতা যাইতে হইত। মামার অর্থাভাব, কলিকাতায় যাইবার সঙ্গতি ছিল না। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা এককালে খুব বর্ধিষ্ণু ছিলেন, কিন্তু চঞ্চলা লক্ষ্মী কোথাও অচলা হইয়া থাকেন না। ইংরেজি শাসন বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলেই প্রায় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। পরিবারে লোকসংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছিল, বিষয়সম্পত্তি বহুভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কলিকাতায় গিয়া ইংরেজি শিখিয়া চাকরি বা ইংরেজের অধীনে ব্যবসা করাই তখন অর্থোপার্জনের উপায় ছিল। গ্রামে যাহাদেরই সঙ্গতি ছিল তাহারাই কলিকাতার সহিত নিজেকে কোন না কোন ভাবে যুক্ত করিয়াছিলেন। মামার সে সঙ্গতি ছিল না। আর একটা বাধাও ছিল, সেটা আর্থিক নয়, মানসিক। তখন অনেক হিন্দুসন্তান খৃষ্টান বা ব্রাহ্ম হইয়া যাইতেছিল।

মাতামহীর ভয় ছিল ছেলে কলিকাতায় গেলে হয় খৃষ্টান, না হয় ব্রাহ্ম হইয়া যাইবে। গ্রামের মধ্যেই উদাহরণও ছিল। ত্বলে পাড়ার একটি ছেলে কলিকাতায় গিয়া খৃষ্টান হইয়া এক নীচজাতীয়া খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়া আনে। গ্রামের লোকেরা তাহাকে কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিয়াছিল। সুতরাং মামার কলিকাতা যাওয়া হয় নাই। তিনি বাংলা লেখাপড়া গ্রামে বসিয়াই করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি নিকটবর্তী হিজলী গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারের অধীনে থাকিয়া ডাক্তারি শিখিতে লাগিলেন। শ্রীনাথ ডাক্তার দিদিমার দূর সম্পর্কের আত্মীয় হইতেন। তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে ডাক্তারি পাস করেন, ইচ্ছা করিলে শহরে খুব বড় চাকরি করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। গ্রামেই প্র্যাকটিস করিতেন। তাঁহার মধ্যে তৎকালসুলভ সাহেবিয়ানাও কিছু ছিল না, গলাবন্ধ কোট এবং ধুতি, এই ছিল তাঁহার পোষাক। সাহেবিয়ানার মধ্যে ছিল দাড়িটি, সূচ্যগ্র ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাঁহার খুব পশার ছিল। দশটা বারোটা গ্রাম জুড়িয়া তিনি প্র্যাকটিস করিতেন। যান ছিল পাল্‌কি এবং ঘোড়া। পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মামা তাঁহারই অধীনে কম্পাউণ্ডরি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বাংলা পুস্তকের সহায়তায় ডাক্তারি বিদ্যাটা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি প্রায় বছর দশেক তিনি তাঁহার অধীনে ছিলেন। এই দশবৎসরে তিনি ডাক্তারি বিদ্যাটা যে ভালোভাবেই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পরবর্তী জীবন। তাঁহার ভারাক্রান্ত নিমজ্জমান সংসার-তরণীটিকে তিনি টানিয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন এই ডাক্তারির প্রভাবেই। শুধু যে টানিয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নয়, কিছুদিনের জন্য তাহাকে ময়ূরপংখীর মর্যাদাও দিয়াছিলেন। দোল, দুর্গোৎসব, শিব-প্রতিষ্ঠা, নিয়মিত ব্রাহ্মণ-অতিথিসেবা, কিছুই তিনি বাদ দেন নাই। ভাগ্যান্বেষণের জন্য

কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাস্‌তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুস্‌করায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুস্‌করায় গেলেন। মাসীমার বাড়িতে রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোনও পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, দুই চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), দুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্‌করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা

লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজকার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশ-মর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশীদিন থাকতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে

কিন্তু তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িতে হইয়াছিল। ডাক্তারি করিয়া অর্থোপার্জন করিতে হইলে গ্রাম না ছাড়িয়া উপায় ছিল না। গ্রামের সকলেই চেনা-শোনা বা আত্মীয়, কাহার নিকট হইতে পয়সা লইবেন? কিন্তু দিদিমা তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। দিদিমার এক মাস্তুতো বোনের বিবাহ হইয়াছিল গুস্করায়। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া মামা গুস্করায় গেলেন। মাসীমার বাড়িতে রহিলেন, তাহার পর ক্রমশ যখন প্র্যাকটিস জমিয়া উঠিল তখন আলাদা বাসা করিলেন। আলাদা বাসা করিয়াও তিনি পরিবার লইয়া যান নাই। সেকালে সহসা বিদেশে পরিবার লইয়া যাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। পরিবার গ্রামেই থাকিত, উপার্জ্জনক্ষম পুরুষ বিদেশ হইতে মাসে মাসে বাড়িতে টাকা পাঠাইতেন, তাহার পর ছুটি পাইলে বা কোনও পর্ব উপলক্ষে, বিশেষ করিয়া পূজার সময়, তুই চারিদিনের জন্য গ্রামে আসিয়া কিছুদিনের জন্য পারিবারিক সুখভোগ করিয়া যাইতেন। ইহাই নিয়ম ছিল। মামাও এ নিয়ম পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য, তখনও তাঁহার বিবাহ হয় নাই। তাঁহার দিদি (অর্থাৎ আমার মা), তুইটি খুড়তুতো ভাই এবং তাঁহার নিজের মা এই লইয়াই তাঁহার সংসার ছিল। এই সংসারের ভরণপোষণের জন্য তিনি মাসে পঁচিশটি করিয়া টাকা পাঠাইতেন শুনিয়াছি। গ্রামে কিছু ধানের জমি ছিল, পুকুরের অংশ ছিল, ঘরে গাই ছিল। সুখে স্বচ্ছন্দেই সংসার চলিয়া যাইত। গুস্করায় থাকিতে থাকিতেই মামার বিবাহ হয়। সেকালে বিবাহের সম্বন্ধ করিতেন ঘটকেরা। তাঁহাদের কাছেই দেশের সম্ভ্রান্ত পরিবারদের সমস্ত সংবাদ সংগৃহীত থাকিত। সেকালের প্রচলিত নিয়ম-অনুসারে মামার বহু পূর্বেই বিবাহ হইয়া যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাল্যে পিতৃহীন হইয়া পড়াতে তাহা আর সম্ভবপর হয় নাই। মামাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন সংসারের অবস্থা সচ্ছল না হয় ততদিন তিনি বিবাহ করিবেন না। গ্রামের পাঠশালায় বাংলা

লেখাপড়া শেষ করিবামাত্রই তাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ আসিয়াছিল। শ্রীনাথ ডাক্তারও মামাকে উপার্জনক্ষম না হইয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব তখন সমাজের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নবমন্ত্রে নব্য বাঙালী তখন সবে দীক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মামাও সে প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। গুসকরায় যখন তাঁহার কিছু কিছু রোজকার হইতে লাগিল, তখন কিন্তু আমার দিদিমা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, পরিচিত শিবু ঘটকের শরণাপন্ন হইলেন। শিবু ঘটক তিনটি পাত্রীর সন্ধান দিয়াছিলেন। দিদিমা যাঁহাকে পছন্দ করিলেন তিনি রূপে অসামান্যা ছিলেন না। তাঁহার বংশ-মর্যাদাও খুব বড় ছিল না। সাধারণ ভদ্রগৃহস্থ ঘরের কন্যা ছিলেন তিনি। দিদিমা তাঁহাকে পছন্দ করিয়াছিলেন সুলক্ষণের জন্য। গ্রামের পুরোহিত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কন্যা দেখিতে গিয়াছিলেন। কন্যার কপাল, চুলের ডগা, পায়ের নখ, পায়ের পাতা, হস্তরেখা, গমনভঙ্গী, দাঁতের গড়ন, অঙ্গসৌষ্ঠব প্রভৃতি দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, মেয়েটি সৌভাগ্যবতী হইবে। শুনিয়াছি বরাভরণ ছাড়া মামাকে নগদ একান্ন টাকা বরপণ দেওয়া হইয়াছিল। ঘর করিতে আসিবার সময় বধূ একটি দুগ্ধবতী কৃষ্ণা গাভী এবং একটা চরকা আনিয়াছিলেন। মামার মাছ ধরার সখ ছিল বলিয়া একটি বিলাতী হুইল-সমন্বিত ভালো ছিপও তাঁহাকে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় উপহার দেন। শোনা যায় এই ছিপ দিয়া মামা নাকি বহু বড় বড় রুইকাৎলাকে গাঁথিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হয় নাই। বিবাহ করিবার কিছুদিন পরেই মামার ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। বিবাহের পর মামা গুসকরায় বেশীদিন থাকতে পারেন নাই। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন সেই শিবু ঘটকই তাঁহাকে

পরামর্শ দিলেন—ডাক্তারি ব্যবসায়ের পক্ষে গুসকরা অপেক্ষা সাহেবগঞ্জ প্রশস্ততর ক্ষেত্র। সেখানে অনেক ধনী মাড়োয়ারী আছে, অনেক বাঙালীর বাস, শহরটিও গঙ্গার তীরে, গঙ্গার, দুই পারে বহু বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ডাক্তার হিসাবে এখানে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে আয়ের বিপুল সম্ভাবনা। মামার গুস্‌করায় প্র্যাকটিস কিছুটা জমিয়া উঠিয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রথমে সহসা তিনি আসিতে রাজী হন নাই। কিছুদিন পরে যোগাযোগটা অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটিল। নামজাদা সিনেমার ছবি এখন যেমন যুবকযুবতীদের লোলুপ করিয়া তোলে, তখন নামজাদা যাত্রার দল তেমনি সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিত। মতি রায়, নীলকণ্ঠ, বউ মাস্টার প্রভৃতি যাত্রার দলের তখন খুব নাম-ডাক ছিল। এই সব দল সাধারণত পূজা-পার্বণ বা বিবাহ উপলক্ষে কোনও বড়লোকের আহ্বানে আসিয়া 'একাদিক্রমে তিনচার রাত্রি পালা-গান গাহিতেন। দশবিশ ক্রোশ দূর হইতে লোকে দল বাঁধিয়া যাত্রা শুনিতে আসিত। আমার মামার যাত্রা শোনার খুব শখ ছিল। তিনি যখন শুনিলেন, সাহেবগঞ্জে মতি রায়ের দল আসিয়াছে তিনি একদিন যাত্রা শুনিবার জন্যই গুসকরা হইতে সাহেবগঞ্জে চলিয়া আসিলেন। হাতে কঠিন রোগী ছিল, একরাত্রির বেশী সেখানে থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু মতি রায়ের যাত্রা তাঁহাকে বড়ই মুগ্ধ করিয়াছিল, গুস্‌করায় ফিরিয়া গিয়া তাই তিনি স্থির করিলেন—গুস্‌করাতেই মতি রায়ের দলকে আনাইতে হইবে। ডাক্তার হিসাবে কয়েকজন ধনী মহাজনের উপর তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, অর্থ সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হইল না। তিনদিন পরেই তিনি যাত্রার বায়না করিবার জন্য পুনরায় সাহেবগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে শিবু ঘটক তাঁহার বিবাহ দিয়াছিলেন তাঁহারই এক দাদা মধু ঘটক তখন সাহেবগঞ্জে গোলাদারি করিতেন। নুনের গোলা ছিল তাঁহার। ইহা ছাড়া ধান, চাল, পাট প্রভৃতিরও কারবার করিতেন।

অনেক ব্যাপারী তাঁহার কাছে আসিত। ব্যাপারী এবং অতিথিদের জন্য তাঁহার আলাদা একটি বাসাই ছিল। যাত্রার বায়না করিতে আসিয়া মামা মধু ঘটকের এই বাসায় আসিয়া উঠিলেন। পরিচয় পাইয়া মধু ঘটকও তাঁহাকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। সেদিন দৈবাৎ আর একটি ঘটনাও ঘটিল। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীদের মধ্যে একজন হঠাৎ পেটের ব্যথায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকিতে হইল। সাহেবগঞ্জে তখন সুরথ বসু নামে এক সাব-অ্যাসিটান্ট সার্জনের বেশ পসার প্রতিপত্তি ছিল। তিনি ঘটক মহাশয়ের গৃহ-চিকিৎসকও ছিলেন। তিনি আসিয়া উক্ত ব্যাপারীটির চিকিৎসার ভার লইলেন। রোগের কিন্তু উপশম হইল না। ব্যথা ক্রমশ বাড়িতে লাগিল। আমার মামা তখন ঘটক মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি এঁকে একটা ওষুধ দিতে পারি, আমার বিশ্বাস সে ওষুধে ওঁর ব্যথা কমে যাবে"। ঘটক মহাশয়ের সম্মতি পাইয়া মামা ঔষধটি দিলেন, অদ্ভুত ফলও ফলিল। ব্যাপারীটি অল্প সময়ের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিলেন। সাহেবগঞ্জ ছোট শহর, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মামার নাম রটিয়া গেল। সকলেই বলিতে লাগিল—সুরথবাবুর মতো ডাক্তার যে রোগকে কায়দা করিতে পারেন নাই এই ছোকরা-ডাক্তার একদাগ ঔষধেই তাহা সারাইয়া দিয়াছে। সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল! একদিনেই মামার অনেক রোগী জুটিয়া গেল। যাত্রার বায়না শেষ করিয়া মামা যখন গুস্‌করায় ফিরিতে উদ্যত হইয়াছেন তখন ঘটক মহাশয় তাঁহাকে বলিলেন, "এ সুযোগ তুমি ছেড় না। গুস্‌করার চেয়ে সাহেবগঞ্জ অনেক বড় জায়গা। এইখানে এসেই তুমি বসে' পড়। আমি তোমাকে থাকবার জায়গা দেব, যতদিন না তোমার ভালো প্র্যাকটিস জমে আমায় বাসাতেই তুমি খাওয়া-দাওয়া করবে। গুস্‌করা থেকে তুমি এখানেই চলে' এস"।

শিবু ঘটকও এই পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহার দাদাও দিলেন।

তাছাড়া মামা স্বচক্ষেই দেখিলেন যে একদিনের মধ্যেই সাহেবগঞ্জে তাঁহার যেরূপ নাম-ডাক হইয়া গেল তাহা অভাবনীয়। তাঁহার মনে হইল বিধাতার কোনও প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত হয়তো ইহার মধ্যে আছে। এখানে প্র্যাকটিস জমিয়া গেলে তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়া যাইবে। সাহেবগঞ্জ ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি আর একটি কাজ করিলেন, ডাক্তার স্থরথ বস্থর সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিলেন, তাঁহার মতো বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি অনুমতি দেন তাহা হইলেই তিনি সাহেবগঞ্জে আসিবেন, নতুবা নয়। তাঁহার মতো কৃতবিদ্য চিকিৎসকের বিরোধিতা করিবার সাহস তাঁহার নাই। ঘটক মহাশয়ের ব্যাপারীটি ঘটনাচক্রে দৈবাৎ সারিয়া গিয়াছে, হয়তো স্থরথবাবুর ঔষধই একটু দেরিতে কাজ করিয়াছে। এ বিষয়ে নিজে তিনি কোনও কৃতিত্ব বা চিকিৎসা-নৈপুণ্য দাবী করেন না। ডাক্তার স্থরথ বস্থ উদারহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। মামার কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। বলিলেন, আপনি এখানেই প্র্যাকটিস আরম্ভ করুন, আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিব। আমি একা সব রোগী সামলাইতে পারি না। মফঃস্বলের অনেক রোগীকে ফিরাইয়া দিতে হয়, আপনি যদি এখানে আসেন ভালই হয়, আমারই অনেক রোগী আপনি পাইবেন—"

কুমার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতেছিল।

দ্বারপ্রান্তে পদশব্দ পাইয়া সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল যে ভৃত্য শান্তা দাঁড়াইয়া আছে। শান্তা চাকরটি ঈষৎ স্থূলকায়, মুখটা থ্যাবড়া গোছের। ভাসা-ভাসা চক্ষু দুইটি ভাবলেশহীন, মনে হয় জীবন্ত নয়, যেন মুখোশের চোখ।

"কি রে—"

খাতা বন্ধ করিয়া কুমার সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিল। শান্তা আর একটু আগাইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিল, "আলুকা খেত'পর সিহাই আইলোছে।" অর্থাৎ আলুর ক্ষেতে শজারু আসিয়াছে।

কুমার খাতা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোণে বন্দুক ছিল, তাহাতে টোটা পুরিয়া সন্তর্পণে সে পশ্চিম দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল। শান্তাও তাহার পিছু পিছু গেল, যাইবার পূর্বে টেবিল হইতে টর্চটি তুলিয়া লইল। একটু পরেই টর্চের প্রয়োজন হইবে তাহা সে জানিত।

মিনিট দশেক পরেই দুম দুম করিয়া বন্দুকের শব্দ হইল। সূর্যসুন্দর আচ্ছন্নের মতো পড়িয়াছিলেন। বন্দুকের শব্দে তাঁহার আচ্ছন্নভাব কাটিল না, তিনি কেবল মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "রায় মশায়, আপনার সিপাহীই বন্দুক চালাচ্ছে না কি"—বলিয়াই চুপ করিয়া গেলেন। গঙ্গা কিছু না বলিয়া একটু মৃদু হাসিল।

উর্মিলা হেঁট হইয়া প্রশ্ন করিল, "বাবা, কিছু বলছেন?" সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কুমারের লক্ষ্য অব্যর্থ। বেশ বড় একটা শজারু ঘায়েল হইয়াছিল। ওজনে প্রায় দশ বারো সের হইবে। শান্তা মনে মনে খুব আনন্দিত হইয়াছিল, সে জানিত ইহার অর্ধেকটা অন্তত তাহারা পাইবে। কিন্তু তাহার চোখে মুখে সে আনন্দ প্রতিফলিত হইতেছিল না। সে বিস্ফারিত নেত্রে কুমারের আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

কুমার বলিল, "এটাকে পরিষ্কার করে' তৈরি করে ফেল্। ঠাকুরকে বল খানিকটা রেঁধে রাখুক। দাদারা যদি এসে পড়ে খেতে পারবে। এখুনি চড়িয়ে দিতে বল। বাইরের উনুনটায় আঁচ দিয়ে দে—"

উত্তেজিত হইয়াছিল ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচ্‌কি, কুমারের দেশী কুকুর দুইটা। কুমারের দুই পাশে দাঁড়াইয়া তাহারা ঘনঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল। মাঝে মাঝে মুখ নীচু এবং কান খাড়া করিয়া ছুঁচকি মৃত রক্তাক্ত শজারুটার দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইতেছিল না, একটু আগাইয়াই আবার পিছাইয়া

আসিতেছিল। ওই কণ্টকিত বীভৎস জানোয়ারটার খুব কাছে যাওয়া নিরাপদ কি না তাহাই সে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। ল্যাংল্যাং আগাইবার চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া লালা ঝরিতেছিল। দুই একবার ভেক্ ভেক্ শব্দ করিয়া সে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল, ছুঁচকি কুঁই কুঁই করিতে লাগিল।

আদেশ পাইয়াও শাস্তা নড়ে নাই। কতটা মাংস রান্না করিবার জন্য আলাদা করিয়া দিবে তাহা সে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজের দায়িত্বে তাহা ঠিক করা সে সমীচীনও মনে করিতেছিল না। কুমার তাহার মুখের দিকে এক নজর চাহিয়াই সমস্যাটা বুঝিতে পারিল।

বলিল, "সের তিনেক রান্না করতে বল। বাকীটা তোরা ভাগ করে' নিয়ে নে"—শাস্তা ইহাই প্রত্যাশা করিয়াছিল। মৃত শজারুটাকে সে টানিতে টানিতে লইয়া গেল। ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকিও অনুসরণ করিল। হঠাৎ একযোগে কতকগুলা শৃগাল ডাকিয়া উঠিল। শৃগালের ডাক থামিতে না থামিতে পাখীদের সম্মিলিত কাকলীও শোনা গেল। কুমার টর্চ ফেলিয়া নিজের হাতঘড়িটা দেখিল, কাঁটায় কাঁটায় বারোটা বাজিয়াছে। হঠাৎ হু হু করিয়া একটা হাওয়া উঠিল, মনে হইল দূর প্রান্তরে কে যেন বিলাপ করিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণশশী বকুল গাছের মাথার উপর দেখা দিল। কুমার স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল কয়েক মুহূর্ত। বাবার এই অসুখই যে শেষ অসুখ তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছিল; ডাক্তারবাবুও সে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। বাবার বয়স বিরাশী পার হইয়া গিয়াছে, কিছুদিন হইতে তিনি অসমর্থও হইয়া পড়িয়াছেন, এখন যদি তাঁহার মৃত্যু হয় নালিশ করিবার কিছু নাই, বরং তাহাই কাম্য। কিন্তু তবু সে কেমন যেন অসহায় বোধ করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল দাদারা আসিয়া পড়িলে সে যেন নিশ্চিত হয়। যদিও

সে জানে দাদারা এখানে আসিয়া বেশী কিছুই করিতে পারিবেন না, বিদেশে নিজ নিজ কর্মস্থলে তাঁহারা সক্ষম ব্যক্তি, এখানে যত ঝঞ্ঝাট কুমারকেই পোহাইতে হইবে, তবু তাহার মনে হইতেছিল দাদারা আসিলে সে নিশ্চিন্ত হইবে, অনেকটা বল পাইবে, দায়িত্বের বোঝা কমিয়া যাইবে। খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

উর্মিলা বাবার বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়াছিল। উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন, কিছু মারলে না কি"

"একটা শজারু—"

"এখন না মারলেই পারতে! বাবার অসুখ—"

"কিন্তু আলুর ক্ষেত যে শেষ করে' দিলে"

"মা—"

সূর্যসুন্দরের ডাকে উর্মিলা তাড়াতাড়ি আবার তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে ফিরিয়া গেল। গিয়া দেখিল সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া যেমন শুইয়াছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন। "বাবা, কিছু বলছেন?"

মাথার শিয়রে বসিয়া খুব আস্তে আস্তে প্রশ্নটি করিল। সূর্যসুন্দর কোনও উত্তর দিলেন না। উর্মিলা তখন গঙ্গার দিকে চাহিল অর্থাৎ এ অবস্থায় কি করা যায়, আবার ডাকিবে কি? গঙ্গা হাত নাড়িয়া কথা কহিতে বারণ করিল। উর্মিলা তখন ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিল, তাহার আর কিছু করিবার ছিল না। শ্বশুরের প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া তাহার নিজের বিবাহের কথাটা সহসা আবার মনে পড়িয়া গেল। তাহার বাবা যখন কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া পাগলের মতো বহুলোকের দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছিলেন তখন কেহই তাঁহাকে তেমন আশ্বাস দেন নাই যেমন ইনি দিয়াছিলেন। কেহ চাহিয়াছিলেন রূপ, কেহ পণ, কেহ ডিগ্রি, কেহ সব। ইনিই কেবল বলিয়াছিলেন "আমার ছেলের যদি মেয়ে পছন্দ

হয় আর কিছুরই জন্ম আটকাবে না"। সত্যই আটকায় নাই, নির্বিঘ্নে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মন আবার কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। বাহিরের অন্ধকারকে বাঙ্ময় করিয়া ঝিল্লী-ধ্বনি চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। ঝোড়ো হাওয়াটার বেগও যেন বাড়িতেছিল ক্রমশ। গঙ্গার মনে হইতেছিল প্রকৃতিও বুঝি হাহাকার করিতেছে। সূর্য-সুন্দরের পদপ্রান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া গঙ্গা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়াছিল। তাহার মনে কত কথাই জাগিতেছিল। এই লোকের কি প্রতাপই না ছিল এককালে। বড় বড় দুর্ধর্ষ জমিদারেরা পর্যন্ত ভয়ে তটস্থ হইয়া থাকিত। জজ ম্যাজিস্ট্রেট সিভিল-সার্জনরা খাতির করিত। এ অঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া কি মহিমাময় জীবনই না উনি যাপন করিয়াছেন। কিন্তু সেই লোকই এখন অসহায় অসমর্থ, দক্ষিণ অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, পায়ের আঙুলটি পর্যন্ত নড়াইবার শক্তি নাই। হঠাৎ গঙ্গার মনে পড়িয়া গেল সূর্যসুন্দরের হাতে সে কত মারই না খাইয়াছে। কথাটা মনে হওয়াতে তাহার ভারী আনন্দ হইল, মনে হইল এটা যেন তাহার জীবনের পরমলাভ। সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আর একটা কথা মনে হওয়াতে সে উঠিয়া পড়িল এবং ঊর্মিলার কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল—"কুমার এত রাত্রে মাংস রাঁধতে বলছে। পেঁয়াজ আছে তো? কাল হাটে পাওয়া যায় নি"

"না পেঁয়াজ নেই"

"দেখি যদি পাই কোথাও"

গঙ্গা নিঃশব্দে উঠিয়া কুমারের ঘরে প্রবেশ করিল।

"তোর বাইকটা নিয়ে আমি বেরুচ্ছি একবার"

"কোথায়"

"পেঁয়াজ নেই, মাংস রান্না হবে কি করে', তুমি তো হুকুম দিয়েই খালাস"

"বিনা পিঁয়াজেই হোক। একটু বেশী করে রসুন আর আদা দিতে বল।"

"দেখি যদি পাই কোথাও"

"এতরাত্রে কোথা পাবি"

"জহিরুদ্দিনের বাড়িতে পাব"

"দেখ তাহলে"

গঙ্গা বারান্দা হইতে বাইকটা লইয়া বাহির হইয়া গেল।

কুমার পুনরায় জীবন-চরিতে মন দিল।

"আমার মামা অবশেষে সাহেবগঞ্জে আসিয়াই বসবাস করিতে লাগিলেন। প্রথমে আসিয়া কয়েকদিনের জন্য তিনি মধু ঘটকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, পরে বাজারের কাছে একটি ঘর ভাড়া করিয়া সেইখানেই উঠিয়া গেলেন। ভাগ্যলক্ষ্মী তখন তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়াছেন, দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্র্যাক্টিস জমিয়া উঠিল। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সাহেবগঞ্জে একটি বাড়িও কিনিতে সমর্থ হইলেন। নিজের গ্রাম হইতে এই সময়ে তাঁহাকে পরিবারবর্গকেও আনিতে হইল, কারণ তাঁহার মা (আমার দিদিমা) ক্রমশ দৃষ্টি-শক্তি হারাইয়া ফেলিতেছিলেন। শুনিয়াছি আমার বাবাই না কি ইহার কারণ! বাবা কিছুতেই সংসার-বন্ধনে ধরা দিতেছিলেন না। বিবাহের পূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন কাজেও তাহা করিতেছিলেন। সংসারের কোন দায়িত্বই গ্রহণ করেন নাই। সেতারটি লইয়া কোথায় যে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তাহা নির্ণয় করা সহজ ছিল না। মাঝে মাঝে দুই একখানা পত্র লিখিতেন—কখনও কাশী, কখনও লক্ষ্ণৌ, কখনও বা দিল্লী হইতে। শহরের নাম ছাড়া আর কোনও ঠিকানা তাহাতে থাকিত না। মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকাও পাঠাইতেন শুনিয়াছি, কিন্তু তাহা কচিৎ। নিজে কখনও আসিতেন না। এ দুঃখ দিদিমার পক্ষে মর্মান্তিক হইয়াছিল। যুবতী কন্যার বিরহ

মুখের দিকে চাহিয়া তিনি দিবারাত্রি অশ্রু বিসর্জন করিতেন। এইজন্যই তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। মামা যখন তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন তখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি খুবই ক্ষীণ। মামার পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মা, তাঁহার দিদি (আমার মা) এবং তাঁহার সদ্য-বিবাহিতা পত্নী। আমার মামীমার বয়স তখন বারো কিম্বা তেরো। মামীমার পিতামাতা কিছুদিন পূর্বে মারা গিয়াছিলেন। তাই মামীমার শিশু ভ্রাতা নকুলও মামার পরিবারভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসবাস করিবার মাস ছয়েক পরেই একদিন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। বাবা হঠাৎ সাহেবগঞ্জে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি স্বেচ্ছায় আসেন নাই, কিন্তু যোগাযোগ এমনই হইল যে তিনি আসিয়া পড়িলেন। মামা যে সাহেবগঞ্জে আছেন এখবরও তিনি জানিতেন না। তিনি মুঙ্গের যাইতেছিলেন একজন ওস্তাদের নিমন্ত্রণ পাইয়া। সাহেবগঞ্জ স্টেশনে আর একজন ওস্তাদ-সেতারী ধূর্জটি বাগচীর সহিত তাঁহার দেখা হইয়া গেল। পূর্ব পরিচয় ছিল, উভয়ে উভয়কে শ্রদ্ধাও করিতেন। বাগচী মহাশয় বাবাকে জোর করিয়া নামাইয়া লইলেন। বাগচী মহাশয়ের বাড়ি মামার বাড়ির কাছেই ছিল, সেখানেই তিনি বাবাকে লইয়া আসিলেন। বাবা যে শক্তিবাবু ডাক্তারের ভগ্নীপতি একথা তিনিও জানিতেন না। কিন্তু জানিতে বিলম্ব হইল না। ধূর্জটিবাবুর অসুস্থ স্ত্রী মামারই চিকিৎসাধীন ছিলেন। একটু পরেই মামা তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন, তখন সব জানাজানি হইয়া গেল।··· বাবা সেবার কিছুদিন সাহেবগঞ্জ থাকিয়া গেলেন। সকলের আগ্রহাতিশয্যে এবং দিদিমার চোখের অবস্থা দেখিয়া থাকিয়া গেলেন ইহাই সকলের বিশ্বাস। কিন্তু আমি বাবার সম্বন্ধে যতটুকু জানি তাহা হইতে আমার মনে হয় বাবার প্রধান আকর্ষণ ছিলেন বাগচী মহাশয়। শুনিয়াছি অধিকাংশ সময় তিনি বাগচী মহাশয়ের

বাড়িতেই কাটাইতেন। বাগচী মহাশয় সাহেবগঞ্জের মিউনিসিপালিটিতে চাকুরি করিতেন। তাঁহার পুত্র কন্যা হয় নাই, হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। সুতরাং যে বেতন তিনি পাইতেন তাহাতেই সেই শস্তা-গণ্ডার যুগে তাঁহার স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইত, আর্থিক উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করিবার তেমন উৎসাহও তাঁহার ছিল না। তাঁহার উৎসাহ ছিল সেতারে। সমস্ত মন পড়িয়া থাকিত সেতারের দিকে। আমার মনে হয় এমন একজন সুর-তপস্বীর সঙ্গলোভেই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে থাকিয়া গিয়াছিলেন। ধূর্জটিবাবুর সেতার-সাধনা একটু অদ্ভুত ধরনের ছিল। তিনি গৎ লইয়া বেশী মাতামাতি করিতেন না। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে সেতারটি কেবল বাঁধিতেন। তাঁহার প্রিয় তবলচী সখীচাঁদ পাশে বসিয়া তবলা টুংটাং করিত, বাগচী মহাশয় সেতারের তারগুলিতে মৃদু মৃদু আঘাত করিতে করিতে প্রয়োজন মতো সেগুলি ঢিলা করিতেন বা কষিয়া দিতেন। আমি স্বচক্ষে তাঁহাকে ইহা করিতে দেখিয়াছি, তিনি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। আমরা যখন স্কুলের ছুটির পর মাঠে খেলিতে যাইতাম তখন দেখিতাম তিনি সেতার লইয়া বসিয়াছেন। সন্ধ্যায় যখন ফিরিতাম তখনও দেখিতাম তিনি বসিয়া আছেন, নিবিষ্টচিত্তে সুর মিলাইতেছেন। রাত্রি নটা পর্যন্ত তিনি তন্ময় হইয়া কেবল সুর মিলাইতেন। সুর মিলিয়া গেলেই তাঁহার মুখভাব প্রসন্ন হইয়া উঠিত, সেতারটি রাখিয়া তিনি পুলকিতচিত্তে খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিতেন, তাহার পর সেটি খোলে পুরিয়া তুলিয়া রাখিতেন, যেন সেদিনের মতো তাঁহার কর্তব্য শেষ হইয়া গেল। আমার বাগচী মহাশয়ের স্মৃতির সহিত একটা পবিত্র শুভ্রতার অনুভূতি বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার গায়ের রং ধপধপে ফরসা ছিল, মাথার চুলও ছিল শাদা, স্কন্ধে শুভ্র উপবীতগুচ্ছ শোভা পাইত। থান পরিতেন, পায়ের চটি জোড়াও ছিল শাদা কট্‌কী চটি। আহার শ্বেতপাথরের থালায় আলো-চালের ভাত, কিছু সিদ্ধ তরকারী এবং

শ্বেতপাথরের বাটিতে একবাটি দুধ। বাগচী গৃহিণী সুরসিকা ছিলেন, বলিতেন "মহাদেব কি না, তাই সব শাদা। বাড়ির সামনে একটা শাদা ষাঁড়ও এসে বসতে আরম্ভ করেছে।" আমার বিশ্বাস এই বাগচী মহাশয়ের জন্যই বাবা কিছুদিন সাহেবগঞ্জে ছিলেন মামার বাড়িতে তিনি কেবল আহার ও শয়ন করিতেন, বাকি সময়টা তাঁহার বাগচী মহাশয়ের বাড়িতেই কাটিত। শুনিয়াছি— দিদিমা যখন মায়ের দুর্ভাগ্যের জন্য বিলাপ করিতেন বাবা চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেন, কোন জবাব দিতেম না। একদিন কেবল মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয় ছিলেন—'আমি তো আগেই বলেছিলাম'। এই সময় বাবার আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সকলের নিকট প্রকাশ হইয়া সকলকে আতঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল। বাবা যে একজন তান্ত্রিক শাক্ত ছিলেন—একথা পূর্বে কেহ জানিত না। প্রকাশ হইয়া পড়িল যে তাঁহার নিকট একটি কালীর পট আছে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর প্রত্যহ তিনি সেটির পূজা করেন, পূজার সময় 'কারণ' পানও করেন। সাহেবগঞ্জে একটি কালিবাড়ি ছিল। অমাবস্যা-রাত্রে কালিবাড়িতে সমস্ত রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতে যখন তিনি বাড়ি ফিরিতেন তখন তাঁহার মূর্তি দেখিয়া সকলে ভীত হইয়া পড়িত। গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, পরিধানে রক্তাম্বর, চোখ দুটি টকটকে লাল। বাবার এই উগ্র শাক্ত-আচরণ কিন্তু বাগচী মহাশয়কে একটুও বিচলিত করে নাই। বরং বাবার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্ধিতই হইতেছিল। তিনি যতক্ষণ সুর মিলাইতেন বাবা তাঁহার কাছে ততক্ষণ নীরবে চোখ বুজিয়া বসিয়া থাকিতেন, মনে হইত বুঝি ধ্যান করিতেছেন। বাগচী মহাশয়ের সুর মেলানো শেষ হইয়া গেলে বাহির হইত বাবার সেতার। বাবা তখন আলাপ শুরু করিতেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিত। তবলচী শশীচাঁদের নয় বৎসরের মেয়েটি তাহার বাবাকে ডাকিবার

জন্য প্রত্যহ একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন লইয়া আসিত এবং লণ্ঠনটি একধারে কমাইয়া রাখিয়া তন্ময়চিত্তে বাবার আলাপ শুনিত। সখীচাঁদ পাঠকের কন্যা মুনিয়াকে আমি পরে দেখিয়াছি, ডাক্তার হইয়া তাহার নাতি-নাতিনীর চিকিৎসাও করিয়াছি। সেই আমাকে বাবার সেতার বাজানোর গল্প করিত। বলিত, বাবা সেতার বাজাইতে আরম্ভ করিলে এমন একটা গম্ভীর অদ্ভুত পরিবেশ গড়িয়া উঠিত যে তাহার জোরে নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলিবার সাহস হইত না। মনে হইত সামান্য শব্দ করিলেই বুঝি সর্বনাশ হইয়া যাইবে, যে সুরের প্রাসাদ গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝি চুরমার হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। তাই যতক্ষণ বাবার আলাপ চলিত সে চুপ করিয়া এককোণে বসিয়া থাকিত। বসিয়া থাকিতে থাকিতে অনেক সময় ঘুমাইয়া পড়িত, ঘুমের মধ্যেও কিন্তু তাহার সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন হইয়া থাকিত সেতারের আলাপে। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিত যেন বিচিত্র বর্ণের অপ্সরীরা চতুর্দিকে নৃত্য করিতেছে, তাহাদের পায়ে নূপুর, গায়ে নীল রঙের ওড়না।

আমার যেদিন জন্ম হয় সেদিন বাবা ছিলেন না। তিনি সাহেবগঞ্জে কিছুদিন থাকিয়া আবার সহসা একদিন নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিলেন। কোথায় যাইতেছেন তাহা কাহাকেও বলিয়া যান নাই, এমন কি আমার মা'কেও না। দোল উপলক্ষে মামা সপরিবারে দেশে গিয়াছিলেন। আমার মা তখন আসন্ন-প্রসবা। সুতরাং মামা পরিবারবর্গকে দেশের বাড়িতে রাখিয়া একাই সাহেবগঞ্জে ফিরিয়া গেলেন। আমার জন্ম মামার দেশের বাড়িতেই হইয়াছিল।

শুনিয়াছি আমার মা দুইদিন প্রসব-বেদনা ভোগ করিয়াছিলেন। মায়ের একমাত্র আদরিণী কন্যা ছিলেন তিনি, পাড়ার সকলেও তাঁহাকে খুব ভালবাসিত। তাঁহার প্রসব বেদনা তাই অনেকের

কষ্টের এবং চিন্তার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ক্ষেত্রনাথ (খেতু-মামা) খুব বেশী অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি পালকি পাঠাইয়া হিজলা গ্রামের শ্রীনাথ ডাক্তারকে আনাইয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আর দেখা যায় না। আপনি যেমন করে হোক ওকে খালাস করে' দিন। অন্তত ওষুদবিষুদ দিয়ে কষ্টটা লাঘব করে' দিন। এর জন্যে যদি কিছু অর্থব্যয় করতে হয় তাতেও আমি প্রস্তুত। হিমু গয়লা আমার বাছুর দুটো নেবার জন্যে ঝুলোঝুলি করছে। পঁচিশ টাকা এখখুনি দিয়ে দেবে—"

প্রবীণ শ্রীনাথ ডাক্তার মৃদু হাসিয়া খেতু মামাকে ধৈর্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন. "টাকা খরচ করলেই যদি সব কষ্টের লাঘব হ'ত তাহলে বড়লোকেরা কেউ কষ্ট পেত না। ভয়ের কোনও কারণ নেই, প্রথম পোয়াতি তাই একটু দেরি হচ্ছে, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে—"

আমি ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত শ্রীনাথ ডাক্তার অপেক্ষা করিয়াছিলেন এবং কাল হরণ করিবার জন্য প্রায় আধসের অম্বুরি তামাক পোড়াইয়াছিলেন শুনিতে পাই। আর একটা আশ্চর্য যোগাযোগ সেদিন ঘটিয়াছিল। যে কয়জন লোক আমার ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন তাঁহারাও সকলে সেদিন উপস্থিত ছিলেন মামার বাড়ির উঠানে। উঠানের একধারে গোয়ালঘর ছিল, সেইখানেই আমার জন্ম হয়, আমার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত কেহই উঠান ত্যাগ করেন নাই। আমার মামী এবং দিদিমা তো ছিলেনই, খেতু মামাও ছিলেন। তাছাড়া ছিলেন মামার এক জাঠতুতো দাদা (বঙ্কু মামা) এবং একজন দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি উমেশ ঘোষাল। আমার মায়ের সই ভবিও (ভবতারিণী দেবী) একধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। আমার জন্মের প্রায় বছর খানেক পূর্বে তাঁহার প্রথম সন্তান সন্তোষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। এই [illegible] সহিত কিছুদিন

আমি গ্রামের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়িয়াও ছিলাম। পরে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতরও হইয়াছিল। সে কথা পরে লিখিব।…"

বাবার গলার স্বর শুনিয়া কুমার খাতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

"হরিবোল, হরিবোল—"

উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কিছু বলছেন ?"

"না"

"ঘাড়ের কাছে লাগছে না তো"

"না। বেশ আছি। বিরু আসে নি এখনও"

"না। ট্রেন বোধহয় লেট আসছে। স্টেশন থেকে গাড়ি ফেরেনি এখনও"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সূর্যসুন্দর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কি বার"

"বুধবার"

"আজ নবাবগঞ্জের হাট, না ?"

"হ্যাঁ"

"হাটে কেউ গিয়েছিল ?"

"গিয়েছিল"

"মাছ পেয়েছে ?"

"পেয়েছে, পাকা রুই মাছ"

"ভালই হয়েছে। মাছ মাংস না হলে বিরুর খাওয়া হয় না"

"মাংসও হচ্ছে। উনি শজারু মেরেছেন একটা"

"মেরেছে ? বেশ করেছে। আলুর ক্ষেতটা একেবারে তছনছ করে' দিচ্ছিল"

কুমার আগাইয়া আসিয়া বলিল, "বেশী কথা বোলো না বাবা, দুর্বল লাগবে"

মৃদু হাসিয়া সূর্যসুন্দর চোখ বুজিলেন।

কুমার চুপি চুপি উর্মিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গঙ্গা কি বাড়ি গেছে ?"

"না। পশ্চিম বারান্দায় কি করছে যেন"

কুমার গিয়া দেখিল গঙ্গা ছেঁড়া বোরা মেরামত করিতেছে।

কুমারকে দেখিয়া বলিল, "চাকরগুলা সব শজারু নিয়ে মেতেছে। মধুকে বলেছিলাম বোরাগুলো মেরামত করে' রাখতে। কাল লাহুরামকে পঁচিশ বোরা মকাই পাঠাতে হবে। সে নগদ দাম দিয়ে দেবে বলেছে। কথাটা এখন হঠাৎ মনে পড়ল আমার। গুণে দেখি মাত্র ষোলটি ভালো বোরা আছে আমাদের। বাকীগুলো সব ছ্যাঁদা। সেগুলো সেরে রাখছি তাই। বাবা উঠেছেন নাকি। গলা শুনলাম মনে হ'ল—"

"দাদার কথা জিগ্যেস করছিলেন"

"ট্রেনটা খুব 'লেট' আজকে। বাইরে কে ডাকছে যেন—"

গঙ্গা উঠিতে যাইতেছিল, কুমার বাধা দিল।

"তুই যা কচ্ছিস কর্, আমি দেখছি"

কুমার বাহিরে গিয়া দেখিল—মুন্দিপুরের রাধানাথ গোপ আসিয়াছেন।

"আমি সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে এসে খবর পেলাম যে ডাক্তার-বাবুর পক্ষাঘাত হয়েছে। তাই আর থাকতে পারলাম না, চলেই এলাম। কি ব্যাপার, কেমন আছেন, কি ব্যবস্থা হয়েছে"

কুমার তাঁহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিল।

"এখন ঘুমুচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ"

"আচ্ছা, আমি কাল আবার আসব"

"এত রাত্রে আবার ফিরে যাবেন ? তার চেয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে এখানেই শুয়ে পড়ুন"

"আজ আমাকে ফিরতেই হবে। কাল ভোরেই আবার চলে' আসব। এ অঞ্চলের অনেকেই আসবে, আর সেটাও একটা সমস্যা হ'য়ে দাঁড়াবে। কাল এসে তার জন্যেও একটা ব্যবস্থা করতে হবে। করেছ কিছু ?"

"না। কি করতে হবে বলুন তো"

"একটু ফালাও করে' বসবার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা করতে হবে আর কি। লোক অনেক জুটবে তো। আমি কাল এসে করব সে সব। এখন চলি"

কুমার আগাইয়া গিয়া তাঁহাকে তাঁহার গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আসিল। তিনি মহিষের গাড়ি করিয়া আসিয়াছিলেন। রাধানাথ গোপ মুন্দিপুরের একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। প্রায় এক হাজার বিঘা জমি আছে। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, নিষ্ঠাবান কংগ্রেসকর্মী এবং সূর্যসুন্দরের একজন প্রগাঢ় ভক্ত। কুমার ফিরিবার সময় দেখিল গ্রামের আরও দুই চারিজন লোক বৈঠকখানার বারান্দায় সূর্যসুন্দরের খবর লইবার জন্য বসিয়া আছে। কুমারকে দেখিয়া তাহারা আগাইয়া আসিল। সকলেই উৎকণ্ঠিত, ডাক্তার-বাবুর খবর জানিবার অন্য সকলেই ব্যগ্র। ইহারাও অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া আসিয়াছে এবং অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া আছে। গরীব মুসলমান চাষী কয়েকজন। কুমার সহসা অনুভব করিল—সূর্যসুন্দর এ অঞ্চলের সকলেরই পিতৃস্থানীয়, সুতরাং যে কোন সময়ে এ বাড়িতে আসিবার অধিকার সকলেরই আছে। এ বাড়ি কেবল তাহাদেরই নয়, সকলের। এ বাড়িতে তাহাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হইলে অন্যায় হইবে !

"তোমরা খেয়ে এসেছ ?"

"না বাবু। বাড়ি গিয়ে খাব"

"এইখানেই খেয়ে নাও। এত রাত্রে বাড়ি ফিরে যাবে? দরকার থাকে যেতে পার, আর তা না থাকলে এইখানেই শুয়ে পড়।"

তাহারা চুপ করিয়া রহিল।

কুমার ভিতরে গিয়া গঙ্গাকে বলিল, "সীতারামপুরের জনকয়েক চাষী বাবার খবর নিতে এসেছে। তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করে' দাও"

গঙ্গা হাতের কাজ বন্ধ করিয়া কয়েক মুহূর্ত কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর বলিল, "এখন কত লোক খবর নিতে আসবে তার ঠিক আছে? কত লোককে খাওয়াব আমরা।"

"এদের ব্যবস্থাটা তো কর এখন। পরের কথা পরে ভাবা যাবে।"

গঙ্গা উঠিয়া গেল। মনে হইল চটিয়াছে। চটিলে গঙ্গা নীরব হইয়া যায়।

২

সূর্যসুন্দরের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিরু, ওরফে বৃহস্পতি মুখোপাধ্যায় কিউল প্ল্যাটফর্মে সস্ত্রীক বসিয়া ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছিলেন। শুধু ট্রেনের নয়, নিজের ছেলেমেয়েদেরও। তাঁহার দুই পুত্র, দুই কন্যা। বড় ছেলে লক্ষ্ণৌ শহরে ডাক্তারি করে, ছোট ছেলে অধ্যাপক, কাশীতে থাকে। বড় মেয়ের বিবাহ হইয়াছে দ্বারভাঙ্গায়, ছোট মেয়ের কলিকাতায়। ছোট জামাই পুলিসে বড় চাকরি করে। ইহাদের মধ্যে যে কেহ কিম্বা সকলেই যে কোনও ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে। বৃহস্পতি এবং বৃহস্পতির স্ত্রী পুরসুন্দরী তাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বসিয়া আছেন। কোনও ট্রেন আসিলেই প্রতি কামরায় উঁকি দিয়া দেখিতেছেন—কেহ আসিল কি না। বৃহস্পতি নিজে আসিয়াছেন দিল্লী হইতে। কিউল হইতে তাঁহাকে লুপ লাইনের ট্রেন ধরিতে হইবে। কিন্তু সে ট্রেনটির এন্‌জিন্ কোন একটা স্টেশনে নাকি খারাপ হইয়া গিয়াছে, ট্রেনটা কখন যে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। ইহার ফলে তাঁহাকে সাহেবগঞ্জে বসিয়া থাকিতে হইবে। কারণ সক্‌রিগলি ঘাটে যাইবার গাড়িটা সম্ভবত পাওয়া যাইবে না। ইহার জন্য বিরু খুব যে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন আপাতদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। তিনি জানেন, যাহা ঘটিবার যথাসময়ে তাহা ঘটিবে। যদি ধীরে ধীরে ঘটে—তাহাকে দ্রুততর করিবার জন্য চেষ্টা মাত্র করা যাইতে পারে, ব্যস্ত হইয়া লাভ নাই। তিনি অ্যানথ্রপলজির ছাত্র, মানব জাতির অতীত ইতিহাসের সন্ধানে অনেক কবর খুঁড়িয়াছেন, অনেক খনিত কবর পরিদর্শন করিয়াছেন। খৃষ্ট পূর্ব বহু সহস্র বৎসরের হিসাব নিকাশ করিতে করিতে তাঁহার জীবন কাটিয়াছে। তাঁহার মনে অন্তত একটা দার্শনিক প্রশান্তি

থাকা উচিত, এ জ্ঞান তাঁহার আছে। ট্রেনের একটু-আধটু 'লেট' হওয়া বা পিতার অসুখের সংবাদ তাই যাহাতে তাঁহাকে খুব বেশী বিচলিত করিয়া না ফেলে সে বিষয়ে তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন। কর্তব্য সম্বন্ধে অবশ্য তিনি উদাসীন হন নাই। ট্রেন লেট দেখিয়া কিউল হইতেই তিনি কয়েকটি টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন। পত্নী পুরসুন্দরীকেও প্রফুল্ল রাখিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। দিল্লী হইতে আসিবার পথে একটু ঘুরিয়া লক্ষ্ণৌয়ে নামিয়া গগনকে (বড় ছেলেকে) সঙ্গে করিয়া আনিবার চ্ছা তাঁহ.র মনে জাগিয়াছিল। কিন্তু এ ইচ্ছা অবশেষে তিনি দমন করিয়াছিলেন। এই অসুখই যে বাবার জীবনের শেষ অসুখ তাহাতে তাঁহার সন্দেহ ছিল না। তাঁহার অন্তিম সময়ে তাঁহাকে বাবার কাছে সশরীরে উপস্থিত থাকিতেই হইবে, পথে কোন কারণেই বিলম্ব করা চলিবে না। তাই তিনি গগনের নামে একটা টেলিগ্রাম করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ছেলে দিগন্তকেও টেলিগ্রাম করিয়াছেন, দুই জামাই রমেশ এবং সোমনাথকেও করিয়াছেন। তিনি জানেন কুমারও নিশ্চয়ই সকলকে খবর দিয়াছে। তবু 'অধিকন্তু ন দোষায়' এই নীতি অনুসরণ করিয়া তিনিও প্রায় সকলকেই একটা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছেন! এমন কি তাঁহার দুই বোন উষা এবং সন্ধ্যাকেও। কিরণের বর্তমান ঠিকানা জানা নাই বলিয়া তাহাকে খবর দিতে পারেন নাই। উষার শ্বশুরবাড়ি কলিকাতায়, সন্ধ্যার দেওঘরে। বিরু আশা করিতেছিলেন সন্ধ্যা উষা নিশ্চয়ই এতক্ষণ পৌঁছিয়া গিয়াছেন। চিত্রাও—বিরুর ছোট মেয়ে হয়তো পিসিদের সহিত আসিয়া গিয়াছে। ছুটি পাইলে ছোট জামাই রমেশও নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু তাহার ছুটি পাওয়াই মুশকিল।

পুরসুন্দরীর সহিত এই সব আলোচনা করিয়া বিরু পুনরায় স্টেশন মাস্টারের নিকট গিয়াছিলেন ট্রেনের খবরটা লইবার জন্য। ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "ট্রেনের এখন অনেক দেরি। কোনও

খবরই নেই। এখন যে ট্রেনটা আসছে—স্বাতী আর সোমনাথ যদি পালেজা ঘাট পেরিয়ে পাটনা হ'য়ে আসে, সেটা ধরতে পারবে। ওরা আসতে পারে এ ট্রেনে। গগন আর দিগন্ত তো পারেই। আসল কথা হচ্ছে ওরা খবরটা পেয়েছে কি না। চারিদিকে যে রকম মিস্‌ম্যানেজমেণ্ট, টেলিগ্রাম পৌঁচেছে কি না কে জানে। দ্বারভাঙ্গায় সোমনাথ আছে কি না তা-ও অনিশ্চিত। তাকে টুরে বেরুতে হয় তো। সে না এলে স্বাতীও আসতে পারবে না—"

স্বাতী বিরুর বড় মেয়ে, সোমনাথ বড় জামাই।

মুকুন্দ নামক যে বালক ভৃত্যটি ময়দা বাহির করিয়া লুচি ভাজিবার উদ্যোগ করিতেছিল একথা শুনিয়া সে থামিয়া গেল এবং সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে পুরসুন্দরীর দিকে চাহিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ট্রেনটা দেখেই তাহলে ময়দা মাখিস। তুমি এখন বিস্কুট দিয়েই চা খাও তাহলে—"

বিরু বলিলেন, "বেশ। ক্ষিধেও পায় নি তেমন—"

"চা খাবে, না, কফি। চা-তো এই একটু আগেই খেলে—"

"বেশ কফিই কর"

বিরুর কিছুতেই আপত্তি নাই। যে সময়টা এখানে অনিবার্য-ভাবে থাকিতেই হইবে সে সময়টা কোনও কিছু করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলেই হইল। মনটা যেন নিযুক্ত থাকে, পিতার অসুখের সংবাদ ফাঁক পাইয়া তাঁহাকে যেন অশোভনভাবে চঞ্চল করিয়া না তোলে। হঠাৎ তিনি একটা বড় তোরঙ্গের উপর বসিয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। পায়ে নূতন জুতা ছিল, কোঁচ-কোঁচ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জিনিসপত্রগুলা আর একবার গণিয়া গণিয়া দেখিতে লাগিলেন। সব ঠিকই আছে। জিনিসপত্র অনেক। দুইটা বড় ট্রাঙ্ক, চারটি হোল্‌ড-অল্, গোটা ছয়েক সুট-কেস, ছোট বিছানা গোটা চারেক, মুখ-বাঁধা ফলের ঝুড়ি গোটা চারেক, মুখ-খোলা একটা, দুইটি

বিরাটকায় টিফিন কেরিয়ার, একটা বড় হট্ কেস, মুখ-বাঁধা সন্দেশের হাঁড়ি গোটা দুই, গোটা দুই 'থারমস্', দুই বড় বড় কেরাসিন কাঠের বাক্সে রন্ধনের সরঞ্জাম, তাছাড়া পেট্রোম্যাক্স লণ্ঠন একটা। বিরু বাজারের খাবার খাইতে পারেন না, তাই যখনই বাহিরে যান সঙ্গে রন্ধনের সব ব্যবস্থা লইয়া যান, এমন কি বঁটি শিল-নোড়া পর্যন্ত। মুকুন্দ রন্ধন ব্যাপারে সুদক্ষ। পুরসুন্দরীর সহকারিণী পার্বতীও ভাল রাঁধিতে পারে। সে-ও সঙ্গে আসিয়াছে। ভোরেই সে স্নান সারিয়া লইয়া দূরে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। মেয়েটা রোগা, কিন্তু একপিঠ চুল। পার্বতী বিরুর বৃদ্ধ চাপরাশি হরদৎ সিংয়ের একমাত্র কন্যা। হরদৎ সিং সপরিবারে বিরুর কাছেই থাকিত। তাহার পত্নী-বিয়োগের পর পুরসুন্দরীই পার্বতীকে লালনপালন করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে হরদৎ সিংও মারা গেল। অনেক খরচ করিয়া বিরু পার্বতীর বিবাহও দিলেন। কিন্তু মেয়েটা দুর্ভাগিনী, বিবাহের ছয়মাস পরেই বিধবা হইয়া গেল। তখন হইতেই সে পুরসুন্দরীর কাছে কাছে। এসব অনেকদিন আগেকার কথা। পার্বতীর বয়স এখন ত্রিশ, কিন্তু এমন রোগা ছিপছিপে চেহারা যে দেখিলে মনে হয় কুড়ি বছরের বেশী নয়। খুব আদুরে। পুরসুন্দরীর দুই কন্যা চিত্রা ও স্বাতীর অপেক্ষাও বেশী প্রতাপ তাহার। হরদৎ সিং ছাপরা জেলার লোক ছিল, কিন্তু পার্বতীকে দেখিয়া সে কথা বুঝিবার উপায় নাই। সে একেবারে বাঙালিনী হইয়া গিয়াছে। পুরসুন্দরী লোকের কাছে তাহাকে চাকরাণী বলিয়া পরিচয়ও দেন না, বলেন ও আমার মেয়ে।

মুকুন্দ কফির সরঞ্জাম বাহির করিয়া কফি প্রস্তুত করিতে লাগিল। বিরু তাহার দিকে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পায়চারি শুরু করিলেন। লম্বা প্ল্যাটফর্ম। দুই হাত পিছনে দিয়া মাথা হেঁট

করিয়া তিনি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে গিয়া হাজির হইলেন। মুকুন্দ যে কফি করিতেছে সে কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন। কোন একটা বইয়ে তিনি ইজিপ্টের এক ফারাওয়ের মমির যে ছবি দেখিয়াছিলেন সেই ছবিটা তাঁহার মানস-পটে সহসা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর মনে হইল বাবাকে তিনি যে খাতাখানা দিয়াছিলেন তাহাতে বাবা কিছু লিখিয়াছেন কি? তিনি ইতিহাসের এবং বিজ্ঞানের ছাত্র, ভাবিতে চেষ্টা করিলেন কি ভাবে লিখিলে জীবন-চরিত ঠিক ভাবে লেখা যায়। হিটাইট্ সিউমেরিয়ান মহেঞ্জোদারো প্রভৃতির ইতিহাস কি কি উপাদানের অভাবে অসম্পূর্ণ···চিন্তাধারা বিঘ্নিত হইল, মুকুন্দের ডাক শোনা গেল।

"বাবু, কফি ভিজিয়েছি—"

বিরু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন পুরসুন্দরী চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতেছেন। দৃশ্যটি দেখিয়া তিনি যেন একটু আরাম পাইলেন। কাঁদা উচিত বই কি। পিতৃতুল্য শ্বশুরের সাংঘাতিক অসুখের সংবাদে বাড়ির বড় বউ যদি না কাঁদে তাহা হইলে···তাহা হইলে ঠিক যে কি হয় তাহা বিরু সহসা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও তাঁহার মনে হইল—শোকে বেসামাল হইয়া পড়াটা কি খুব শোভন? তিনি নিজে তো এখনও একফোঁটা চোখের জল ফেলেন নাই। কফির কাপে এক চুমুক দিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, তাহার পর দৃষ্টিটা অন্যদিকে ফিরাইয়া লইলেন। রোরুদ্যমানা পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া থাকাটাও তাঁহার নিকট বিসদৃশ বলিয়া মনে হইল। তিনি একটা ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া পড়িলেন, কফিতে আর এক চুমুক দিয়া অন্যদিকে চাহিয়া পুনরায় হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। জুতা পুনরায় কোঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করিতে লাগিল। জুতাজোড়ার দিকে একবার চাহিলেন, কিন্তু অস্বস্তিকর শব্দটা পুনরায় তাঁহাকে উঠিতে বাধ্য করিল। পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

মুকুন্দের হাতে কফির কাপটা দিয়া বলিলেন, "চল্ ওই ফলের ঝুড়িগুলোর মুখ খুলে দি। একটু হাওয়া লাগুক, তা না হলে পচে' যাবে হয়তো। ঘণ্টাখানেক পরে আবার শেলাই করে' নিলেই হবে। গুনছুঁচ আছে তো?"

"আছে"

"চল তবে"

পুরসুন্দরীর দিকে আর একবার ফিরিয়া দেখিলেন, তাহার পর ফলের ঝুড়িগুলির দিকে অগ্রসর হইলেন।

...পুরসুন্দরী কাঁদিতেছিলেন। অশ্রু জলে তাঁহার কাপড়ের আঁচল ভিজিয়া গিয়াছিল, ক্রন্দনাবেগে সমস্ত দেহটাই কাঁপিয়া উঠিতেছিল, কিছুতেই তিনি আত্মসম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। বৃদ্ধ শ্বশুরের জন্যই এ ক্রন্দন, ইহাতে কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামি কিছুই ছিল না, কিন্তু একথাও তিনি অনুভব করিতেছিলেন যে নিজের বাবার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া যে শোকে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন,সমস্ত বুকের ভিতরটা যেমন ভাবে মুচড়াইয়া উঠিয়াছিল এখন ঠিক তেমনটা হইতেছে না। দুই চোখ দিয়া অনর্গল অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, সূর্যসুন্দরের প্রশান্ত মুখটাও মনের মধ্যে বারবার ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু তবু তিনি অনুভব করিতেছেন এ ক্রন্দন যেন স্বতোৎসারিত নয়। বিবাহের পর হইতে যে জীবন তিনি যাপন করিয়াছেন তাহা নিজের জীবন নয়, পরের জীবন। যে সংসার-রঙ্গমঞ্চে ভাগ্যবিধাতা একদা তাঁহাকে স্থাপন করিয়াছিলেন সেই রঙ্গমঞ্চের নির্দেশ অনুসারে সারাজীবন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অভিনয় মাত্র। অভিনয় করিতে করিতে ক্রমশ অভিনয়টাকেই সত্য বলিয়া মনে হইয়াছে, অপরের সুখদুঃখ কালক্রমে এমনভাবে নিজের সুখদুঃখে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে যে নিজের সুখদুঃখের কথা আর মনে নাই। বিবাহের আগে কখনও ঠাণ্ডা ভাত খাইতে

পারিতেন না, কিন্তু বিবাহের পর ঠাণ্ডা ভাত খাওয়াটাই দৈনন্দিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বাড়ির পুরুষদের খাওয়া চুকিয়া গেলে তবে মেয়েদের খাওয়া হয়, ডাক্তার শ্বশুর দিনে বেলা একটা দেড়টা এবং রাত্রে এগারোটার পর বাড়ি ফিরিতেন। তাঁহার আবার থিয়েটারের শখ ছিল, কোনও কোনও দিন আরও বেশী রাত হইয়া যাইত। পুরসুন্দরী প্রায়ই না খাইয়া ঘুমাইতেন। কোন কোনদিন তিনি আড়াল হইতে গানও শুনিতেন। বাহিরের ঘরটায় এক একদিন গানের আসর বসিত। পুরসুন্দরী একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। অশ্রুধারা বন্ধ হইয়া গেল। অর্ধ-বিস্মৃত বধূ জীবনের কথাগুলি মনে পড়িতে লাগিল। উঠানের উপরে স্তূপীকৃত গম, বারান্দার একধারে মকাই, বাড়ির বাহিরের জমিটাতে সবজির বাগান, শাক বেগুন কপি লাউ কুমড়া অফুরন্ত! কত লোক যে লইয়া যাইত। জংলি গাইটার কথা মনে পড়িল। শ্বশুরের কত অদ্ভুত খেয়ালই যে ছিল। জংলি গাই পুষিয়াছিলেন। গাইটা না কি ধরা পড়িয়াছিল নেপালের জঙ্গলে। যে জমিদারের লোকজন উহাকে ধরিয়াছিল শ্বশুর মহাশয় ছিলেন তাঁহার বাড়ির ডাক্তার। জমিদার মহাশয় দুর্দান্ত জংলি গাইটির গল্প শ্বশুর মহাশয়ের নিকট করিয়াছিলেন, শ্বশুর মহাশয় একদিন গিয়া গাইটি দেখিয়াও আসিয়াছিলেন। এসব ব্যাপারে খুব উৎসাহ ছিল তাঁহার। কিছুদিন পরে জমিদারবাবু শ্বশুর মহাশয়কে জানাইলেন ওই বন্য-গাভীকে পোষা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নয়, সামর্থ্যে কুলাইতেছে না। দুধ দুহিতে গিয়া দুইটি গোয়ালা গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। মোটা মোটা দড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিতেছে। যে ঘরের খুঁটায় উহাকে বাঁধা হইয়াছে সে ঘরটির চাল ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং গাইটি তিনি জঙ্গলে ছাড়িয়া দিবেন মনস্থ করিয়াছেন। গাইটি ডাক্তারবাবুর পছন্দ হইয়াছিল, তিনি যদি চান তাহা হইলে অবশ্য গাইটি তাঁহার নিকটই পাঠাইয়া

দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। শ্বশুর মহাশয় তাঁহার সানন্দ সম্মতি জানাইয়া পত্র লিখিয়া দিলেন। তাহার দিন কয়েক পরে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা মনে পড়িলে এখনও হাসি পায়। কিন্তু সে রাত্রে পুরসুন্দরীকে সভয়ে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিতে হইয়াছিল। পুরসুন্দরীর তখন সবে বিবাহ হইয়াছে, বয়স খুব কম, বাড়ির চারিদিকে ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল, সন্ধ্যার পরে এমনই গা ছম ছম্ করে। হঠাৎ গভীর রাত্রে 'রে রে রে রে' শব্দে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, মনে হইল বুঝি ডাকাত পড়িয়াছে। পরে জানা গেল ডাকাত নয়, জংলি গাই আসিতেছে। তাহার শিঙে নাকে, এবং গলায় শক্ত দড়ি বাঁধা, তবু জন দশেক বলিষ্ঠ লোককে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়াছে। বাছুরটি বেশ বড়, এদেশের ছোট দেশী গরুর মতো, অথচ বয়স মাত্র ছয়মাস। সে রাত্রে, সে কি কাণ্ড। বাড়িসুদ্ধ লোক উঠিয়া পড়িল, যতগুলি লণ্ঠন ছিল সব জ্বালা হইল! বাড়ির সম্মুখে যে আমগাছটা ছিল তাহাতে ভারী লোহার শিকল দিয়া জংলি গাইকে শক্ত করিয়া বাঁধিবার পর শাশুড়ি বলিলেন, "ওর কপালে সিঁদুর আর খুরে জল দিতে হবে, সেটার ব্যবস্থা কর। তা নাহলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে যে—"। শ্বশুর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন— "জল ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও। কিম্বা পিচ্কিরি করেও দিতে পার। কিন্তু সিঁদুর দিতে হলে ওই আমগাছে ওঠা ছাড়া উপায় নেই। ওই নীচু গাছটায় যদি উঠতে পার তাহলে ওখান থেকে ওর মাথার উপর সিঁদুর লাগানো শক্ত হবে না। পারবে উঠতে? এককালে তো পারতে—" শাশুড়ি ঝাঁজিয়া বলিলেন, "কি যে বল তার ঠিক নেই। ছেলেবেলায় পারতাম বলে' এই বুড়ো বয়সেও পারব না কি। পা হড়কে গেলে আর রক্ষে থাকবে না—"

"তাহলে উদিৎ সিং উঠে দিয়ে দিক"

উদিৎ সিং ছিল বাড়ির রক্ষক, সমস্ত চাকরদের কামতি অর্থাৎ সরদার। উদিৎ সিংয়ের চেহারাটা পুরসুন্দরীর মনে পড়িল। রোগা

পাতলা ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তাহার। গলার স্বর ছিল তীক্ষ্ণ সরু, চটিয়া গেলে ছোট চক্ষু তুইটি হইতে আগুনের ফুলকি বাহির হইত যেন। রগের শিরাগুলা ফুলিয়া উঠিত। নিষ্ঠাবান ক্ষত্রিয় ছিল সে। কাহারও ছোঁয়া-জলে স্নান পর্যন্ত করিত না। একটি ছোট কুঁড়ে ঘরে সে আলাদা থাকিত, স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইত। দিনের বেলা রাঁধিত না। চিঁড়ে দই, ছাতু বা বেলের সময় বেল, আমের সময় আম বা ওই ধরনের কিছু খাইয়া কাটাইয়া দিত। রান্না করিত সন্ধ্যার পর। শাশুড়ি তাহাকে এক ঘটি তুধ রোজ দিতেন। তখন বাড়িতে দশ বার সের তুধ হইত। তুধটাই ছিল উদিং সিংয়ের প্রধান আহার। গোয়ালার পিছনে মোতায়েন হইয়া প্রত্যহ সে তুধ তুহাইত। শ্বশুরমহাশয়কে দেবতার মতো ভক্তি করিত সে। তাঁহার আদেশে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে আপত্তি ছিল না তাহার। বরং বিপদ যত বেশী হইত তাহার উৎসাহ বাড়িত। জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁতুর দিতে হইবে এবং সে গুরু-ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে এই আনন্দে সে সগর্বে আগাইয়া আসিল। শাশুড়ি কিন্তু খুঁত খুঁত করিতে লাগিলেন এ পর্যন্ত বাড়ির সমস্ত গাভীকে, এমন কি মহিষকেও তিনি স্বহস্তে সিন্দুর দিয়া বরণ করিয়াছেন; অন্যরূপ করিলে অমঙ্গল হইবে না তো। উদিং সিংই শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান করিল। সে বলিল, মাইজি বাঁশের সিঁড়ি দিয়া গাছের উপরে উঠিয়া যান, আমরা সিঁড়িটা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতেছি। তাহাই হইল, শাশুড়ি গাছের উপর উঠিয়াই জংলি গাইয়ের মাথায় সিঁতুর দিলেন।

পুরস্কুন্দরীর হঠাৎ তুর্গাদাস এবং জাম্বুবানের কথা মনে পড়িল। তুর্গাদাস কাকাতুয়া এবং জাম্বুবান অ্যালসেশিয়ান কুকুর। তাহাদের সঙ্গেই লইয়া আসিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বিরু রাজি হইলেন না। পুরস্কুন্দরীর আর একবার মনে হইল তাঁহার ইচ্ছার কোনও মূল্য কেহ কখনও দেয় না; এমন কি তাঁহার ছেলেমেয়েরাও না।

সকলেই নিজের খুশী অনুসারে সব কিছু করিতে চায়। এই কিছুদিন আগেই গগন কি কাণ্ডটাই না করিল। তরকারিতে ধনে-পাতা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া তরকারিটা স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। অথচ ধনে পাতা তাঁহার নিজের খুব প্রিয়। বিরুও প্রথমে ধনে'পাতা পছন্দ করিতেন না, এখন একটু একটু খান। স্বামীর মনোরঞ্জনার্থে তাঁহাকেও 'চীজ' খাইতে হয়—কি দুর্গন্ধ জিনিসটা, ঠিক পচা সরের মতো। কিন্তু তবু খাইতে হয়, উপায় নাই। উষাকে ভালো একটা পানের বাটা কিনিয়া পাঠাইয়াছিলেন, উষার পছন্দ হয় নাই, অমন সুন্দর মিনার-কাজ-করা জিনিষটা না কি জড়বৎ! সন্ধ্যার পছন্দও ঠিক দিদির মতো। মায়ের যাহা ভালো লাগে তাহার তাহা লাগে না। পূজার সময় অমন দামী বেনারসী শাড়িটা কিনিয়া দিলেন, মেয়ের নাকি পছন্দ হয় নাই। রং নাকি বেশী ঘোরালো। (অমন চমৎকার মেরুন রঙের বেনারসী দেখা যায় না প্রায়), পাড় নাকি বেশী চওড়া (আজকাল সরু পাড়ই না কি ফ্যাসন), তা ছাড়া কাপড়টা নাকি বড় ভারী। শুনিলে হাসি পায়। আসল জরির কাজ করা বেনারসী শাড়ি, হালকা হয় কখনও। তাই আজকাল আর মেয়েদের কিছু কিনিয়া পাঠান না তিনি, টাকা পাঠাইয়া দেন। ছোট-ছেলে দিগন্ত অবশ্য তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ বড় একটা করে না। যাহা খাইতে দেন তাহাই খায়, যাহা পরিতে বলেন তাহাই পরে। কিন্তু পুরসুন্দরীর মনে হয়—খাওয়া পরার দিকে তাহার তেমন লক্ষ্যই নাই, ওসব বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, যন্ত্রচালিতবৎ করিয়া যায়, করিতে হয় বলিয়া করে। তাহার মন কেবল বইয়ে। যখনই যেখানে থাকে, বই হাতে লইয়া বসিয়া থাকে। কাপড় জামা জুতা কিছুরই শখ নাই, শখ কেবল বই কেনার। ইন্‌শিওরেন্স কোম্পানীর ভালো একটা চাকরি ছাড়িয়া তাই প্রফেসারি করিতেছে। সহসা তাহার জন্য পুরসুন্দরীর মন কেমন করিতে লাগিল। অনেক দিন তাহাকে দেখেন নাই। পূজার ছুটির সময় আসিয়া মাত্র দিন কয়েক

ছিল। এই প্রসঙ্গে ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথাও মনে পড়িল। নন্দার সহিত দিগন্তের বিবাহ দিবার জন্য ললিতবাবু অনেকদিন হইতেই অনুরোধ করিতেছেন। নন্দা মেয়েটিও ভালো, বি-এ পড়িতেছে, সুশ্রী। কিন্তু দিগন্ত এখন কিছুতেই বিবাহ করিতে চাহিতেছে না। বলিতেছে ডক্‌টরেটের জন্য একটা থীসিস লইয়া সে ব্যস্ত আছে, তাহা শেষ না করিয়া আর কোনদিকে সে মন দিবে না। আজকালকার ছেলেদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের।···একটা খাবারের ফেরিওলা খাবারের গাড়িটা ঠেলিতে ঠেলিতে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সদ্য-ভাজা জিলাপিগুলি দেখিয়া তাঁহার স্বাতীর কথা মনে হইল। মেয়েটা গরম গরম জিলাপি খাইতে বড় ভালবাসে। চিত্রাও বাসে। ডালমুট্‌ও চিত্রার খুব প্রিয়। অথচ উনি বাজারের জিনিস কেনা পছন্দ করেন না। তাই তাঁহাকে বাড়িতে ময়রা ডাকাইয়া জিলাপি ও ডালমুট তৈরী শিখিতে হইয়াছে। ওঁরও খাওয়ার শখ কম ছিল না। কিন্তু বাজারের বা হোটেলের কোনও জিনিস কখনও খান নাই, সবই তাঁহাকে বাড়িতে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইয়াছে। ইহার জন্য কত বই পড়িয়াছেন, কত বাবুর্চি (এমন কি গোয়ানিজ বাবুর্চি পর্যন্ত) রাখিয়াছেন, কত লোকের কাছে কত খোশামোদ করিয়া নূতন নূতন রান্না শিখিয়াছেন। অনেকে আবার শিখাইতে চায় না। মিসেস রায়ের কথা মনে পড়িল। সামান্য ফ্রেঞ্চ কাটলেট শিখাইতে কি বেগই না দিয়াছিলেন ভদ্রমহিলা। শেষ পর্যন্ত শিখানই নাই—ফিরপোর এক রাঁধুনী শেষে তাঁহাকে শেখায়। মনে পড়িল ইদানীং শ্বশুর তাঁহার হাতের নিরামিষ রান্না খুব পছন্দ করিতেন। যখনই শ্বশুরের কাছে থাকিয়াছেন তাঁহাকে প্রত্যহ সুক্‌তো ও ঘণ্ট রাঁধিতে হইয়াছে। শ্বশুর ইদানীং মাছ-মাংস প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রথমে যখন বধূ হইয়া আসেন তখন বাড়িতে মাছ-মাংসের খুব ধুম, তাল তাল মশলা বাটা, পেঁয়াজ রসুন গরম মশলার গন্ধে বাড়ি

ভরপুর। শ্বশুর গরগরে মশলা-দেওয়া ঝাল-ঝাল মাংস পছন্দ করিতেন। কোথায় গেল সে সব দিন। পুরসুন্দরীর মনে অতীত-জীবনের নানা ছবি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। স্টেশন ইয়ার্ডের একধারে যে মাল গাড়িটা দাঁড়াইয়াছিল তাহার দিকে একদৃষ্টে তিনি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মালগাড়িটা দেখিতেছিলেন না, ভাবিতেছিলেন গগন কি চম্পাকে লইয়া আসিবে ? সে আসন্নপ্রসবা, বাপের বাড়িতে আছে, এ অবস্থায় তাহাকে না আনাই উচিত, কিন্তু গগন যে রকম গোঁয়ার তাহাকে হয়তো লইয়া আসিবে। ট্রেনে যা ভীড় আজকাল···। কিন্তু এ চিন্তা তিনি বেশীক্ষণ করিতে পাইলেন না। ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পশ্চিম হইতে একটা গাড়ি আসিতেছে।

বিরু ফলের ঝুড়িগুলি খুলিয়া ফলগুলিতে হাওয়া লাগাইতেছিলেন। ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া তিনি ডিস্‌ট্যাণ্ট সিগনালের দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া ফেলিলেন। ফলের ঝুড়িগুলি লইয়া টানাটানি করিবার সময় বোতামগুলি নিজেই তিনি খুলিয়া ছিলেন। মুকুন্দের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুই ফলগুলার কাছে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গাড়িটা দেখি কেউ এল কিনা।" পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া কিছুদূর তিনি আগাইয়া গেলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। পুরসুন্দরীর কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিলেন, "আমি গাড়িটা দেখি গিয়ে। ওরা যদি কেউ আসে ওদের সামনে কান্নাকাটি কোরো না। কাঁদবার কি আছে এতে। তোমাকে কাঁদতে দেখলে সবাই মুষড়ে পড়বে। বাবার কঠিন অসুখ তো আর একবার হয়েছিল, গিয়ে দেখবে হয়তো সেরে গেছে সব।" গলার বোতামটা আবার তিনি খুলিয়া ফেলিলেন। গলার কাছটায় কেমন যেন আঁট আঁট মনে হইতেছিল। আর কিছু

না বলিয়া তিনি হন হন করিয়া ওদিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে চলিয়া গেলেন ।

…গাড়িতে অসম্ভব ভীড়। গগন, দিগন্ত, স্বাতী বা সোমনাথ কাহাকেও তিনি দেখিতে পাইলেন না। কেহই আসে নাই । না আসিবার মানে? গগন বৌমাকে আনিবার জন্য পাটনায় নামিয়া পড়িল না কি। দিগন্তও হয়তো তাহার সঙ্গে আছে, দিগন্তকে গগন হয়তো খবর দিয়াছিল। স্বাতী-সোমনাথ হয়তো কাটিহার দিয়া গিয়াছে। কয়েকটা 'হয়তো'র কবলে পড়িয়া বিরু একটু বিব্রত বোধ করিতেছিলেন । ভীড় বাঁচাইয়া হুইলার কোম্পানীর দোকানের কোণে দাঁড়াইয়া তিনি হাত দুইটি মুঠা করিতেছিলেন এবং খুলিতে-ছিলেন। সারাজীবন তিনি নানা রকম 'হয়তোকে' কেন্দ্র করিয়াই গবেষণা করিয়াছেন। একটা মাথার খুলি বা বাসনের টুকরামাত্র সম্বল করিয়া তিনি প্রাগৈতিহাসিক মানবসমাজের সম্বন্ধে কত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কখনও বিব্রত বোধ করেন নাই। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তিনি বেশ একটু বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ছেলে-মেয়েরা শেষ পর্যন্ত যদি না আসে বড় বিশ্রী ব্যাপার হইবে। আর একবার তাহাদের টেলিগ্রাম করিবেন কিনা একথাও তাঁহার মনে হইল ।

"এই যে দাদা এখানে—"

বিরু ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন তাঁহার বোন কিরণ। অবাক হইয়া গেলেন। কিরণের স্বামী মাত্র একমাস আগে বদলি হইয়া গিয়াছিল। তাহার ঠিকানা বিরু জানিতেন না, তাই তাহাকে টেলিগ্রাম করিতে পারেন নাই। অপ্রত্যাশিতভাবে কিরণ আসিয়া গেল। কিরণের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন তিনি খানিকক্ষণ। কিরণের মাথার সামনের দিকে চুলে কি লাগিয়াছে? চুন? পরমুহূর্তেই বুঝিতে পারিলেন। চুল পাকিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য,

একধারের চুল অমনভাবে পাকিয়া গেল কেন। অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। কিরণ যখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অশ্রুসজল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবার খবর কি দাদা ?" তখন তিনি আত্মস্থ হইলেন।

"কি জানি। আমি তো এখানে ট্রেনের গোলমালে আটকে পড়েছি। তুই খবর পেলি কি করে'। আমি তো তোদের নূতন ঠিকানা জানতাম না তাই খবর দিতে পারি নি।"

"আমি কুমারের টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। কুমার ঠিকানা জানত"।

"কোথায় বদলি হয়েছিস আজকাল"

"দেরাদুনে"

"কার সঙ্গে এলি ? ঘণ্টুর সঙ্গে ?"

"না, ঘণ্টু তো মিলিটারিতে জয়েন করেছে শোন নি ? তাকে একটা খবর দিয়ে আমরা চলে এসেছি, ওঁর সঙ্গেই এসেছি, উনি ছুটি নিয়েছেন।"

"কেষ্টও এসেছে না কি, কই"

"জিনিসপত্তর নামাচ্ছেন বোধ হয়। ওই যে।"

কুলির সারির পিছনে কিরণের স্বামী কৃষ্ণকান্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সার্থকনামা ব্যক্তি। কুচকুচে কালো রং, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা। ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরি করেন। বিরুকে দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন, তাহার পর হেঁট হইয়া প্রণাম করিলেন। সাহেবী পোষাক পরা ছিল, প্রণাম করিতে গিয়া প্যাণ্টের একটা বোতাম ছিঁড়িয়া গেল।

বিরু বলিলেন, "আমরা ওধারের প্ল্যাটফর্মে আছি। তোমরাও চল। এখন কতক্ষণ পরে যে সাহেবগঞ্জের গাড়ি পাওয়া যাবে তার ঠিক নেই। স্টেশন মাস্টারও কিছু বলতে পারছে না।"

৩

বিরু রাত্রের গাড়িতে তো আসেনই নাই, সকালের গাড়িতেও আসিলেন না। আর কেহও আসিল না। মনে মনে একটু চিন্তিত হইলেও কুমার খুব বেশী দমিয়া যায় নাই, কারণ বাবা আজ সকাল হইতে অনেকটা ভাল আছেন। অনেকটা ফলের রস খাইয়াছেন, বেশ ভালো ভাবে কথা বলিয়াছেন, কথার জড়তা-ভাব অনেকটা কমিয়াছে। পায়ের দুই একটা আঙুলও নাড়াইতে পারিয়াছেন। কুমার বাবাকে ফলের রস খাওয়াইয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া চা খাইতেছিল। সম্মুখে উৎসুকদৃষ্টিতে কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল ছুঁচকি ও ল্যাংল্যাং। কুমার মাঝে মাঝে তাহাদের রুটির টুকরা ছুঁড়িয়া দিতেছিল এবং বকিতেছিল।

"এতো লোভী কেন! শজারুর মাংস তো একগাদা খেয়েছ। দাদারা কেউ এল না, দুপুরেও তো অনেক খাবে—"

ছুঁচকি তাহার সূচালো মুখটা আরও সূচালো করিয়া কান দুইটি খাড়া করিয়া কুমারের মুখের দিকে সাগ্রহে তাকাইল।, মনে হইল এখনি যেন কথা কহিবে। ল্যাংল্যাং কিন্তু অন্য ভাব প্রকাশ করিল। তাহার সমস্ত মুখটা যেন হাসিতে ভরিয়া গেল, সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহর্ষে ল্যাজ নাড়িতে লাগিল, তাহার কোমরটা পর্যন্ত দুলিতে লাগিল। ভাবটা কুমার যেন একটা রসিকতা করিয়াছে এবং সে তাহা সানন্দে উপভোগ করিতেছে। পরমুহূর্তেই কিন্তু দুই জনে ঘেউ ঘেউ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। কুমার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল পিওন। লোকটা নূতন আসিয়াছে, ছুঁচকি ল্যাংল্যাং এখনও তাহাকে ভাল করিয়া চেনে না, তাছাড়া লোকটার প্রকাণ্ড গোঁফ থাকাতে চেহারাটাও দুষমনের মতো।

পিওন বলিল, "টেলিগ্রাম—"

কুমার তাড়াতাড়ি উঠিয়া টেলিগ্রামটা খুলিয়া পড়িল। কিউল হইতে বিরু টেলিগ্রাম করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ট্রেনের গোলমালের জন্য এখানে আটকাইয়া পড়িয়াছি, বাবা কেমন আছেন অবিলম্বে জানাও। আরজেণ্ট রিপ্লাই-প্রিপেড. টেলিগ্রাম। কাল সন্ধ্যাবেলাই আসিয়াছিল। এত বিলম্বে দিল কেন ?

"টেলিগ্রাম কাল রাত্রে এসেছে, এতক্ষণে দিচ্ছ ?"

পিওন বলিল, "রাত্রে কোনও পিওন থাকে না। কে নিয়ে আসবে।"

কুমারের মনে পড়িল পোস্টাফিসে পোস্টমাস্টারও নূতন লোক আসিয়াছেন। আগের পোস্টমাস্টার থাকিলে নিজেই আসিয়া টেলিগ্রামটি দিয়া যাইতেন। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সহি করিয়া দিল, কিছু বলিল না। যাহা করিবার সে যথাসময়ে করিবে।

পিওন চলিয়া গেল।

"গঙ্গা, গঙ্গা—"

গঙ্গার সাড়া পাওয়া গেল না।

সামনের ফুলবাগানে মধুর ছোট ছেলে 'এতবারিয়া' গাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল। সে ছুটিয়া আসিল।

"গঙ্গা চৌকি নামাচ্ছে"

"চৌকি ! কোথাকার চৌকি ?"

"রাধাবাবু কোথা থেকে আনিয়েছেন, ঠিক জানি না।"

রাধানাথ গোপ নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে খুব ভোরে আসিয়া কাজে লাগিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা বাড়ির সম্মুখে যে মাঠটা পড়িয়া আছে তাহাতে আট দশটা চালা করিয়া দেওয়া হোক, প্রকাণ্ড একটা সামিয়ানা টাঙাইয়া তাহার নীচে কতকগুলি চৌকিও তিনি পাতিয়া দিতে চান। দূর হইতে বাহিরের লোক যদি আসে, আসিবেই, তাহারা বসিবার শুইবার জায়গা পাইবে।

আত্মীয় স্বজন যাহারা আসিবেন তাহাদের জন্য গোটা দশ বারো তাঁবুর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ সকলে আসিলে বাড়িতে কুলাইবে না। বাড়িতে মাত্র পাঁচখানি ঘর। ডাক্তারবাবুর নিজের ছেলে-মেয়েরা আছে, ভাই আছে, ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা আছে, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনরা আছে। এ খবর পাইলে সকলেই আসিবে, সকলকে স্থান দিতে হইবে তো। দূরদর্শী রাধানাথ ভোরে আসিয়াই কুমারকে একথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিরাট পরিকল্পনা শুনিয়া কুমার একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রাধাবাবু তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন, আমি সব করব। আমারও কর্তব্য এটা—"

সুতরাং কুমারকে বলিতে হইয়াছিল, "বেশ, যা ভাল বোঝেন করুন তাহলে। আমাকে যা বলবেন তাই করব"

"তুমি বাবার কাছে বসে থাক কেবল, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না"

তাহার পর নিম্নকণ্ঠে তিনি একটি প্রয়োজনীয় কথা পাড়িলেন।

"এখানকার নতুন ডাক্তারবাবুটির উপর তোমাদের বিশ্বাস আছে তো? না থাকে তো কোলকাতা থেকে কাউকে আনাও। যা হবার অবশ্য তাই হবে, ওঁর আশীর উপর বয়স হয়েছে—এখন যদি উনি যানও আমাদের ক্ষোভের কিছু থাকবে না। কিন্তু আমাদের কর্তব্যে যেন ত্রুটি না হয়"

"না, নতুন ডাক্তারবাবুটিকে তো ভালই মনে হচ্ছে। বারবার এসে দেখে যাচ্ছেন। ওঁর চিকিৎসায় কিছু ফলও হয়েছে, বাবা আজ অনেকটা ভালো আছেন"

"বাঃ, তাই না কি"

রাধানাথ গোপ বাম করতলটি মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "আমার মনে হয় তবু সিভিল সার্জনকে খবর দাও একবার, তিনি এসে দেখে যান"

"বেশ। দশটার ট্রেনে লোকই পাঠিয়ে দিচ্ছি একটা"

"তাই দাও। আমি গিয়ে ওদিককার কাজে লেগে পড়ি তাহলে"

দ্রুতপদে তিনি চলিয়া গেলেন, কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া আসিলেন আবার।

"তোমাদের বাঁশ আছে ?"

"আছে কিছু"

"কিছু আছে তো ? আমিও দু'গাড়ি বাঁশ আর কিছু খড় পাঠিয়ে দিয়েছি। এখুনি এসে পড়বে। দরকার হয় যদি তোমার কাছ থেকেও কিছু বাঁশ নেব। জনমজুর এসে গেছে, আমি ততক্ষণ জায়গাটা সাফ করিয়ে ফেলি"

রাধানাথ গোপ তখন হইতেই জনমজুর লইয়া ব্যস্ত আছেন। কুমার আর ওদিকে যায় নাই, বাবার মুখ-ধোয়ানো প্রভৃতি লইয়া ব্যস্ত ছিল। গঙ্গা চৌকি নামাইতেছে শুনিয়া কুমার উঠিয়া পড়িল। গঙ্গাকে এখনি পোস্টাফিসে পাঠাইতে হইবে। চাকর দিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলে রাধানাথবাবু যদি কিছু মনে করেন তাই নিজেই সে গেল।

রাধানাথ প্রায় জন কুড়ি মজুর, প্রচুর বাঁশ-খড়, কোদাল-শাবল, কাটারি-দড়ি প্রভৃতি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। কুমার গিয়া দেখিল গোটাচারেক গরুর গাড়িতে চৌকি আসিয়াছে, গঙ্গা চাকরদের সহায়তায় সেগুলি নামাইতেছে।

রাধানাথবাবুর সহিত চোখোচোখি হইতেই কুমার বলিল, "দাদার টেলিগ্রাম এসেছে, ওঁরা কিউলে আটকে পড়েছেন, ট্রেনের কনেক্‌শন পান নি। টেলিগ্রামটা কাল সন্ধ্যেবেলা এসেছে, এতক্ষণে ডেলিভারি দিয়ে গেল। বলছে—পিওন ছিল না, তাই পাঠাতে পারে নি। আগের পোস্টমাস্টারবাবু থাকলে নিজেই এসে দিয়ে যেতেন"

গোপ মহাশয় নির্নিমেষে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "এও যাবে। যে লোক সদরে

সিভিল সার্জনকে ডাকতে যাচ্ছে সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে' যায়। আমি তার হাতে একটা চিঠি দেব"

"আচ্ছা। দাদাকে আগে টেলিগ্রামটা করে' দিই, দাদা কিউল থেকে রিপ্লাই প্রিপেড টেলিগ্রাম করেছেন"

"সেখানে কোন ঠিকানায় টেলিগ্রাম করবে"

"কেয়ার অফ. স্টেশন মাস্টার"

"বিরুবাবুর সবই বিচিত্র কাণ্ড"

রাধানাথ গোপের গম্ভীর মুখে হাসির আভাস জাগিল।

"গঙ্গাকে একটু ছুটি দেবেন? ও গিয়ে টেলিগ্রামটা করে' আসুক"

"হ্যাঁ, ও যাক না। গিরিধারী তুমি চৌকিগুলো নাবাও"

"আমাকে যদি কিছু করতে হয় বলুন"

"বলেইছি তো, তুমি তোমার বাবার কাছে চুপ করে' বসে থাক গিয়ে। আজ বিকেলের মধ্যেই আমি সব ঠিক করে' দিচ্ছি, তুমি দেখ শুধু বসে' বসে'। ভাল কথা, চন্দরবাবুকে খবরটা দিয়েছ তো—"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই"

"কোথা আছেন তিনি আজকাল, অনেকদিন দেখি নি তাঁকে"

"পুরীতে আছেন—"

"যদি আসেন, আসবেন তো নিশ্চয়ই, তাহলে দেখাটা হয়ে যাবে অনেকদিন পরে। আমি ওঁর ছাত্র তা জান তো, এখানে যখন প্রথম মাইনার স্কুল হয়, তখন উনিই হেড মাস্টার হ'য়েছিলেন। ও রকম মাস্টার আমি দেখি নি। দু' ভাইই অদ্ভুত—"

চন্দ্রসুন্দর সূর্যসুন্দরের একমাত্র ছোট ভাই।

গঙ্গা কুমারের সঙ্গে চলিয়া আসিল।

"তুই টেলিগ্রামটা পোস্টাফিসে দিয়ে আয়"

সে বলিল, “রাধানাথবাবু যা কাণ্ড লাগিয়েছেন শেষে তোমাকে বিপদে না ফেলেন”

“কি বিপদ”

“শেষকালে যদি বলেন এসব করতে দু’শ পাঁচশ’ টাকা খরচ পড়েছে—

“না, না—তা কি বলেন কখনও”

“কিছুই আশ্চর্য নয়। খগেনবাবুর মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী দেখাশোনা করবার সব ভার উনি নিয়েছিলেন। এমনি নিজে যেচেই নিয়েছিলেন। বিয়ে শেষ হয়ে যাবার ছ’মাস পরে উনি খগেনবাবুকে জানালেন যে বরযাত্রীদের জন্য তাঁর তিনশ’ টাকা খরচ হয়েছে। খগেনবাবু বেচারাকে দিতে হ’ল টাকাটা। অথচ বরযাত্রী ছিল মাত্র পঁচিশ জন—

“খরচ নিশ্চয় পড়েছিল—”

“তুমি রাধানাথবাবুকে চেন না। উনি সব জায়গায় বাহাদুরি করে’ এগিয়ে যাবেন, তারপর তার থেকে লাভ করবার চেষ্টা করবেন”

“কি যা তা বলছিস ভদ্রলোকের নামে”

“দেখো শেষে—”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গা পুনরায় বলিল—“বাবার অসুখ করেছে তাতে এমন ধুমধাম করে’ ঘরবাড়ি বানাবার কি আছে। কেউ যদি আসে, বাইরের বৈঠকখানায় বসবে—খবর নিয়ে চলে যাবে। এত ঘর বানাবার দরকার কি”

“দরকার আছে। ঘর না থাকলে বেশী লোক এলে মুশকিল হবে। আমাদের বাড়িরই যদি সবাই আসে জায়গা দিবি কোথা। বেশী কয়েকটা ঘর থাকা ভাল—”

“তাহলে এক কাজ কর তুমি। ঘর তৈরি করতে যা খরচ হচ্ছে

তা নগদ হিসেব করে' এখনি দিয়ে দিও। ছ'মাস পরে তোমার কিছুই মনে থাকবে না"

"আচ্ছা, সে যা হয় করা যাবে। তুই এখন টেলিগ্রামটা দিয়ে আয়। ট্রেনের গোলমালে দাদাকে নিশ্চয় অনেকক্ষণ কিউলে থাকতে হবে, তা না হলে টেলিগ্রাম করত না। টেলিগ্রামটা কাল রাত্তির থেকে এসে পড়ে আছে, এতক্ষণে দিয়ে গেল। নতুন পোস্ট-মাস্টারটি লোক সুবিধের নয়"

"তাই না কি !"

গঙ্গা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল। কুমার টেলিগ্রাম লিখিতেছিল কোনও জবাব দিল না। গঙ্গাও আর কিছু বলিল না, টেলিগ্রামটা লইয়া চলিয়া গেল। গঙ্গা চলিয়া যাইবার পর সাইকেলে চড়িয়া সুকুমার হাজির। সুকুমার স্টেশন মাস্টারের ছেলে।

"জ্যাঠামশাই কেমন আছেন আজ"

"কালকের চেয়ে অনেকটা ভাল। কথা অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। খেয়েওছেন"

"তাহলে বালুয়াচকে চলুন না। সেখানে যা হাঁস বসেছে দেখে এলাম, একটা ফায়ার করলে অন্তত পঞ্চাশটা পড়বে। হাজার হাজার বসে' আছে। চলুন না, যাবেন ?"

"এখন কি করে' যাই বল"

"জ্যাঠামশাই তো ভাল আছেন বললেন"

"তবু একজন কাছে থাকা দরকার সর্বদা। দাদারা আসুক, তারপর যাওয়া যাবে একদিন"

"আমাকে সঙ্গে নেবেন কিন্তু"

"বেশ"

"বাবা বললেন—কোন-কিছু যদি দরকার থাকে খবর দিতে"

"এখন তো কোন দরকার নেই, হ'লে নিশ্চয় পাঠাব"

"আচ্ছা"

সুকুমার আবার বাইকে চড়িয়া চলিয়া গেল। যদিও স্টেশন মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ, তবু সুকুমার যখনই আসে বাইকে চড়িয়া আসে। বাইকটি নূতন কিনিয়াছে।

কুমার ভিতরে গেল। উর্মিলা ভিজা ন্যাকড়া দিয়া সূর্যসুন্দরের চোখের কোণ পরিষ্কার করিয়া দিতেছিল। কুমারকে দেখিয়া সূর্যসুন্দর ঘাড় ফিরাইলেন।

"বিরুর কোন খবর আসে নি ?"

"খবর এসেছে। কিউলে ট্রেন মিস্ করে' দাদা টেলিগ্রাম করেছে। আজ রাত্রে কিম্বা কাল সকালে এসে পড়বে নিশ্চয়"

"আর কারু খবর আসে নি ?"

"না"

সূর্যসুন্দর ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন। একটু অন্যমনস্ক হইয়াও পড়িলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল, শেষ সময়ে সকলের সহিত দেখা হইবে তো ? অন্তরের ভিতর হইতে কে যেন তাঁহাকে আশ্বাস দিল, হইবে। পৃথ্বীশও আসিবে। পৃথ্বীশ প্রায় সাত-আট বছর আগে গৃহত্যাগ করিয়াছে। কেন করিয়াছে কেহ জানে না। কোথায় আছে, কি করিতেছে কোনও খবরও সে দেয় না। সূর্যসুন্দরের মনে হইল সে-ও আসিবে। কুমারের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "আজ অনেকটা ভাল আছি"

"রাধাবাবু এসেছেন। তিনি বলছেন, সিভিল সার্জনকে আনিয়ে একবার দেখাতে। আজ এগারোটার ট্রেনে নবীনকে পাঠিয়ে দেব ভাবছি"

"ভালো তো আছি। কি দরকার তাঁকে কষ্ট দিয়ে"

"তবু একবার দেখে যান"

"হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস করে' তিনি যদি মত দেন, তাহলেই সিভিলসার্জনকে খবর দিও। তাঁর কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যাও বরং"

"আচ্ছা—"

কুমার অনুভব করিল—বাবার মনে প্রফেসনাল এটিকেটের কথা যখন জাগিতেছে তখন জ্ঞানের মধ্যে আর কোনও আবিলতা নাই। কাল সন্ধ্যার সময় বাবার জ্ঞান এত পরিষ্কার ছিল না। সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরে চলিয়া গেল। ডাক্তারবাবুর সহিত কথাবার্তা কহিয়া তাঁহার চিঠি লইয়া সিভিলসার্জনের কাছে লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

কুমার চলিয়া গেলে সূর্যসুন্দর উর্মিলাকে বলিলেন, "মা, তুমি উঠে মুখ হাত ধুয়ে এস। সারারাতই তো মাথার শিয়রে বসে আছ"

"না, আমি ঘুমিয়েছি তো"

"কোথায় ঘুমুলে"

"আপনার মাথার শিয়রেই ঘুমিয়েছিলাম। এখানে অনেকটা জায়গা আছে যে"

"চা খেয়েছ?"

"এইবার খাব। বিজলী আসছে, সে এলে তাকে বসিয়ে যাব"

"বিজলী কে"

"রমেশ কাকার নাতনী"

"ও, সে এসেছে নাকি"

"পরশু এসেছে"

সূর্যসুন্দর চক্ষু দুইটি ধীরে ধীরে বুজিলেন, কথা কহিয়া তিনি যেন একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার স্মৃতিপটে বিজলীর ছেলে-বেলার ছবিটা ফুটিয়া উঠিল। ফ্রক-পরা বিনুনি-দোলানো ছোট মেয়ে একটি। বাড়িতে তখন একটি টিয়া পাখী ছিল, টিয়া-পাখীর খাঁচাটির কাছে ঘুরঘুর করিত। চন্দরের বন্ধু রমেশ। সূর্য-সুন্দরই তাহাকে জমিদারি সেরেস্তায় ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। রমেশের ছেলে সুখেন্দু (কোথায় আছে সে এখন?)। রমেশ যখন প্রথম

এখানে আসে সুখেন্দুর বয়স একবৎসর। সেই সুখেন্দুর মেয়ে বিজলী এখন যুবতী। সময় কত দ্রুত চলিয়া যায়···সূর্যসুন্দর আর ভাবিতে পারিলেন না, ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

নবীনকে সিভিলসার্জনের নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া কুমার চাকরদের মাঠে পাঠাইয়া দিল। আখের ক্ষেত, গমের ক্ষেত প্রভৃতিতে যেসব কাজ বাকী ছিল সেগুলি সারিয়া তাহারা যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে ফিরিয়া আসে। বাড়িতে সদা-সর্বদা লোক থাকা দরকার। অক্লান্তকর্মী রাধানাথ একটা চালাঘর প্রায় খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, বাড়ির পিছনের দিকের মাঠে গোটা দুই তাঁবুও খাটানো হইয়া গিয়াছে। কিছু কাজ করিতে পারিলে কুমারের মনটাও অবলম্বন পাইয়া স্থির হইত। মাঠে অনেক কাজ, কিন্তু বাবাকে ফেলিয়া মাঠে যাইবার উপায় নাই। গোপ মহাশয়ও তাঁহাকে ওদিকে ভিড়িতে দিবেন না, সুতরাং সে পূর্বদিকে পেয়ারা গাছতলায়, যেখানে রোদ পড়িয়াছে, সেইখানে ক্যাম্বিসের একটা 'ডেক্' চেয়ার পাতিয়া সূর্যসুন্দরের ডায়েরিটা আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"আমার দেশের বাড়িতেই আমি বড় হইতে লাগিলাম। আমার জন্মের পর মামা কেবল মামীমাকেই সাহেবগঞ্জে লইয়া গেলেন। মা এবং দিদিমাকে লইয়া গেলেন না। মামার ভাইপো দুইটি চাকরি পাইয়া পূর্বেই বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল। তখন ঘরের গাই কালীর অনেক দুধ হইতেছিল, পুকুরে প্রচুর মাছ, জমি হইতে ধানও আসে প্রচুর। মামা বলিলেন, এসব ফেলিয়া বিদেশে যাওয়ার দরকার কি। সবাই বিদেশে চলিয়া গেলে পুকুর-বাগান কিছুই থাকিবে না। মা এবং দিদি এসব লইয়া এখানেই থাকুন, খেতু দেখা-শোনা করিবে, আমি প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিব।

সুতরাং আমার বাল্যকালের প্রথম কয়েক বৎসর মামার দেশের বাড়িতে শঙ্করা গ্রামেই কাটিয়াছিল। সাত-আট বৎসর পর্যন্ত আমি সেখানেই ছিলাম। সে সময়ের স্মৃতি আমার মনে খুব স্পষ্টভাবে আঁকা নাই। আবছা-ভাবে কিছু কিছু মনে আছে। মামা মা এবং দিদিমাকে গ্রামে ফেলিয়া রাখিয়া নিজে
লইয়া শহরে চলিয়া গিয়াছিলেন ইহাতে দিদিমা (আমার মা) খুব সন্তুষ্ট হন নাই। তাঁহার একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে অবশ্য মুখে তিনি কাহারও কাছে বিশেষ কিছু বলিতেন না ; আমার মা তো নীরবতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া কখনও বাহির হইত না। তিনি মুখ বুজিয়া ঘরের সমস্ত কাজগুলি একের পর এক করিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার যে ছবিগুলি আমার মনে আঁকা আছে, তাহাদের একটিতেও তিনি চুপ করিয়া বসিয়া নাই! ঘর-দুয়ার-উঠান-গোয়াল পরিষ্কার করিতেছেন, পুকুর হইতে জল আনিতেছেন, রান্নাঘরে বসিয়া রান্না করিতেছেন, অথবা দিদিমার পায়ে তেল মালিশ করিতেছেন—মায়ের এই সব ছবিই আমার মনে আঁকা আছে। কোথাও বসিয়া পর-নিন্দা বা পর-চর্চা করিতেছেন এরূপ একটি ছবিও আমার স্মৃতিপটে আঁকা নাই। তবে মামা কেবল মামীমাকে লইয়া বিদেশ চলিয়া যাওয়াতে আত্মীয়দের মনে যে ঈষৎ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা খেতুমামার আলাপে বুঝিতাম। খেতুমামা প্রায়ই আসিয়া দিদিমার কাছে আমার প্রসঙ্গ তুলিয়া যাহা বলিতেন, তাহার কিছু কিছু আমার এখনও মনে আছে।

একদিন খেতুমামা মাঠ হইতে ফিরিয়া আমাদের বাড়ি আসিলেন। মাঠের ফেরতই তিনি আমাদের বাড়িতে অধিকাংশ দিন আসিতেন। নিজের জমিতে জনমজুরদের সহিত নিজেই কাজ করিতেন তিনি। সেদিন দুপুরে মাঠ হইতে আমাদের বাড়িতে ফিরিয়া মাথার টোকাটা খুলিয়া ফেলিলেন, হাতের কাটারিটা

উঠানের একধারে রাখিলেন, তাহার পর হাঁকিলেন—"কই বারাহী, এক ঘটি জল দে তো—"

মা রান্নাঘরে ছিলেন, আমি ছিলাম লেবু-তলার ওপাশে। উঠানে দুইটি লেবু গাছ ছিল। লেবু গাছের দক্ষিণ দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গা ছিল। তিনদিকে বাড়ির দেওয়াল, আর একদিকে লেবু গাছ। চমৎকার নির্জন জায়গাটি, অথচ উঠানের মধ্যেই। আমি সেইখানেই খেলা করিতে ভালবাসিতাম। আমার সঙ্গী ছিল সন্তোষ। সন্তোষের মা ভবতারিণী দেবী মায়ের সখী ছিলেন, ইঁহার কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমরা সেদিন ইটের টুকরা ও কাদা দিয়া শিব-মন্দির গড়িতেছিলেন।

মা খেতুমামাকে জল আনিয়া দিতে খেতুমামা পা দুইটি বেশ ভালো করিয়া ধুইয়া ফেলিলেন।

"আর এক ঘটি ঠাণ্ডা জল চাই, খাব। তারপর তামাক সাজ এক ছিলিম। তোর মতন কেউ সাজতে পারে না। কেদারকে তামাক সেজে খাইয়েছিলি একদিনও? খাওয়াস নি? খাওয়ালে তোকে ফেলে যেতে পারত না"

আমি লেবু গাছের আড়ালে বসিয়া সব দেখিতেছিলাম। মা খেতুমামার কথাগুলি শুনিয়া লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিলেন মাত্র, কোন কথা বলিলেন না। ঘরে ঢুকিয়া একটি ছোট রেকাবী ও এক ঘটি জল আনিয়া দিলেন। রেকাবীতে সম্ভবত বাতাসা ছিল। বাতাসাগুলি মুখে ফেলিয়া দিয়া খেতুমামা আলগোছে ঢক্‌ঢক্ করিয়া সমস্ত জলটুকু পান করিলেন, এক ফোঁটা বাহিরে পড়িল না। একটু পরেই দেখিলাম মা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেছেন। খেতুমামার কোমরে পিছন দিকে সর্বদা একটি হুঁকা গোঁজা থাকিত। সেটি তিনি মায়ের হাতে দিলেন। মা কলিকাটি মাটিতে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকায় জল ভরিলেন। খেতুমামা দু'একবার টানিয়া খানিকটা জল ফেলিয়া দিয়া কলিকাটি হুঁকার

মাথায় বসাইয়া দিলেন। তাহার পরই হুঁকার ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল।

দিদিমার দৃষ্টি তখনও একেবারে লোপ পায় নাই। খেতুমামার গলার আওয়াজ পাইয়া তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রোজ দুপুরে তিনি খানিকক্ষণ ঘুমাইতেন।

খেতুমামা বলিলেন, "খুড়িমা, ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন যে। চেঁচামেচি করে' ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম না কি"

"না। ঘুম আমার হ'য়ে গেছে। বারাহী খেয়েচিস ?"

"এইবার খাব"

"কি যে সমস্ত দিন ঘুটঘুট করিস রান্না ঘরে। আমার খাওয়া তো সেই কখন হ'য়ে গেছে"

মা কোনও উত্তর না দিয়া দিদিমার চওড়া কাঠের পিঁড়িখানি বারান্দায় পাতিয়া দিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন। দিদিমা বসিতেই খেতুমামা প্রশ্ন করিলেন, "শক্তির খবর পেয়েছ ? সব ভালো আছে তো"

"দিন কয়েক আগে এসেছিল একটা চিঠি। বৌমার নাকি ছেলেপিলে হবে। এ সময় আমাদের ওখানে থাকলেই ভালো হ'ত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু আজকালকার ভদ্রলোকরা দেখছি বউ নিয়ে একা একা থাকাটাই উচিত মনে করছেন। মা বোন বা আত্মীয়-স্বজনদের ঘেঁসটা পছন্দ করছেন না। কিছু টাকা মনি-অর্ডার করেই মনে করছেন যে কর্তব্য সমাপন হ'ল"

খেতুমামা মাঝে মাঝে খুব শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করিতেন।

দিদিমা বলিলেন, "সন্তোষের বাবা মুঙ্গেরে চাকরি করে, সেখানে ভালো একটা বাসাও পেয়েছে, কিন্তু কই বৌকে তো নিয়ে যায় নি। বৌ তো মায়ের কাছে আছে"

"তোমার ছেলে শক্তি সে জাতের নয় খুড়ি। তোমার মনে দুঃখ দিতে চাই না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়"

খেতুমামা বাক্যটি সম্পূর্ণ না করিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন।

"কি সন্দেহ হয়"

"ও একটু স্ত্রৈণ"

দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিলেন, "না তা ঠিক নয়! নিজের বৌকে কে না ভালবাসে, বাসাই তো উচিত"

"তাতে আর সন্দেহ কি। কিন্তু তা বলে' বউকে নিয়ে মজা করে শহরে একা একা থাকব, আর মা বোন পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকবে এটা কি উচিত"

"কিন্তু এখানকার বিষয় আশয় কে দেখে বল"

"বিষয়-আশয় তো দেখে তোমাদের দুঃখীরাম আর ছিরু, আর সামলাই আমি। তুমি বুড়ো হয়েছ, চোখেও ভাল দেখতে পাওনা আজকাল, আর বারাহী তো ছেলেমানুষ, তোমরা যে বিষয়-আশয় দেখতে পারবে না এ কথা শক্তি ভালো করেই জানে। ওটা ওর একটা ছুতো—"

দিদিমা ইহার প্রত্যুত্তরে আর কিছু বলিলেন না। মনে হইল খেতুমামার কথায় তিনিও যেন সায় দিতেছেন।

...কতদিন আগেকার ঘটনা, কিন্তু এখনও কথাগুলি স্পষ্ট মনে আছে। বড় বয়সের অনেক কথা ভুলিয়া গিয়াছি, কিছুদিন আগেকার কথাও মনে নাই, শৈশবের ওই কথাগুলি কিন্তু মনে আছে।

আর একটি ঘটনাও মনে পড়িতেছে। রাস-উপলক্ষে গ্রামে কোথায় যেন যাত্রা হইতেছিল, আমরা শিশুর দল সন্ধ্যা হইতেই আসরের সামনেই জাঁকাইয়া বসিয়াছিলাম এবং বলা বাহুল্য, কলরব করিতেছিলাম। যাত্রা আরম্ভ হইবার ঠিক পূর্বে একজন লোক আসিয়া বলিল, "তোমরা বড্ড গোলমাল করছ, ওঠ এখান থেকে"

আমি সকলের হইয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, আর আমরা গোলমাল করিব না।

"তবু উঠতে হবে। চৌধুরী বাড়ির ছেলে-মেয়েরা বসবে এখানে"

চৌধুরিরা গ্রামের জমিদার ছিল। যাত্রার আসরে তাহাদেরই স্থান যে সর্বাগ্রে এ জ্ঞান তখন ছিল না, তাই বলিলাম, "বা, আমরা বিকেল থেকে জায়গা দখল করে' বসে' আছি—"

"ওঠ ওঠ উঠে পড়, মেলা গোলমাল কোরো না। ওই পটল কর্তা আসছে—"

এ কথা শুনিবামাত্র আমার সঙ্গীরা একযোগে উঠিয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। আমিই কেবল বসিয়া রহিলাম, কারণ পটলকর্তা কে তাহা আমি জানিতাম না।

সেই লোকটি ব্যস্ত হইয়া বলিল, "তুমি বসে' রইলে কেন খোকা উঠে পড়, উঠে পড়"

"আমি আগে থাকতে এসে বসেছি, আমি উঠব কেন"

পর মূহূর্তেই পটলকর্তা আসিয়া পড়িলেন। আমার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া আমার কান দুইটি ধরিয়া আমাকে একেবারে শূন্যে তুলিয়া ফেলিলেন।

"দূর হ'য়ে যা, বাঁদর কোথাকার, সামনে এসে বসেছেন—"

ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন আমাকে। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ি চলিয়া গেলাম। এ অপমানের কথা কাহাকেও কিছু বলিলাম না। তাহার পরদিন সকালেই পটলকর্তা আমাদের বাড়িতে আসিয়া হাজির, হাতে একটি সোলার তৈরি পাখী।

"ও বারাহী, তোর ছেলে কোথা, কাল আমি চিনতে পারিনি তাই কান মলে চড় মেরেছি ওকে। জরিমানা দিতে এসেছি আজ। ডাক তাকে—"

সোলার সুন্দর পাখীটি পাইয়া আমি সমস্ত অপমান ভুলিয়া গেলাম। মায়ের নির্দেশে তাঁহাকে প্রণামও করিলাম। পটলকর্তা

সত্যই আমাকে চিনিতে পারেন নাই। তিনি গ্রামে থাকিতেন না, পূজা-পার্বণ উপলক্ষে আসিতেন। কলিকাতায় কোন একটা সদাগরি আপিসে চাকরি ছিল তাঁহার।

পটলকর্তার শারীরিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল। খুব বেঁটে-খাটো মানুষ ছিলেন তিনি। ঘাড় বলিয়া কোনও জিনিস তাঁহার ছিল না। মনে হইত বুকের উপরই মুখটি বসানো আছে, মাঝে কিছু নাই। খুব ধপধপে ফরসা রং ছিল। ডান পায়ে ছিল গোদ। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'চায়না' কোট পরিতেন। চোখ দুইটি খুব ছোট ছোট ছিল। নাকটি খাঁদা, চিবুকটি চওড়া, চিবুকের নীচে বেশ থল্‌থলে চর্বি। গোঁফ-দাড়ি ছিল না। বেঁটে মোটা চিনেম্যান গোছের চেহারা ছিল তাঁহার। অত্যন্ত বদরাগী ছিলেন। রাগিয়া মাঝে মাঝে অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিতেন। একবার জগদ্ধাত্রী পূজার সময় এমনি একটি অদ্ভুত কাণ্ড করিয়াছিলেন গল্প শুনিয়াছি। তাঁহার নিজের বাড়িতেই জগদ্ধাত্রী পুজা হইত। গ্রামের কুম্ভকার পঞ্চানন গ্রামের সমস্ত প্রতিমা গড়িত, কিন্তু পটলকর্তা নিজের জগদ্ধাত্রী প্রতিমাটি গড়াইতেন কৃষ্ণনগরের কারিগর আনাইয়া। একবার অসুস্থতার জন্য কৃষ্ণনগরের সেই কারিগরটি আসিতে পারিল না। অগত্যা পটলকর্তা পঞ্চাননকেই প্রতিমা গড়িবার ভার দিলেন। বলিলেন, "মজুরি তোমাকে বেশী দেব, প্রতিমাটি কিন্তু নিখুঁত হওয়া চাই। সোনার বেনেদের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়তে পারবে তো—"

পঞ্চানন বলিল, "পারব"

"বেশ, তাহলে গড়। জগদ্ধাত্রী পূজোর আগের দিন আমি কোলকাতা থেকে আসব। এসে যেন দেখতে পাই প্রতিমাটি তৈরি আছে, নিখুঁত প্রতিমা চাই"

পটলকর্তা কলিকাতা চলিয়া গেলেন। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িতে লাগিল। জগদ্ধাত্রী পূজার আগের দিন সন্ধ্যায় পটলকর্তা যখন

স্টেশনে নামিলেন তখন প্রিয় বন্ধু ও পরিষদ ভোলানাথের সহিত তাঁহার দেখা হইল। ভোলানাথ তাঁহাকে লইবার জন্যই স্টেশনে আসিয়াছিলেন। পূজার জিনিসপত্র সঙ্গে থাকিবে বলিয়া ভোলানাথকে তিনি স্টেশনে থাকিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

নামিয়াই তিনি প্রশ্ন করিলেন, "প্রতিমা কেমন হয়েছে"

"নিজের চোখেই দেখো। আমি আর কি বলব—"

"তাঁর মানে? ভালো হয় নি?"

"আমি কিছু বলব না ভাই। পঞ্চানন ভাববে আমি তার নামে লাগিয়েছি"

"লাগাবার কি আছে এতে। কেমন গড়েছে বল না"

"পঞ্চানন চিরকাল যেমন গড়ে তেমনি গড়েছে"

ইহার বেশী আর কোনও কথা তিনি ভোলানাথের মুখ হইতে বাহির করিতে পারিলেন না। কিন্তু একথা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে প্রতিমা ভোলানাথের মনোমত হয় নাই। আর একবার প্রশ্ন করিলেন।

"প্রতিমা তোর পছন্দ হয় নি তাহলে"

"পূজো করবে তুমি, আমার পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে তোমার দরকার কি"

পটলকর্তার গৃহিণীও (সকলে তাঁহাকে পটল গিন্নি বলিয়া ডাকিত) ট্রেন হইতে নামিয়াছিলেন। তিনি মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া বলিলেন, "তখন বলেছিলাম কেষ্টনগর থেকেই কারিগর আনাও। একজনেরই না হয় অসুখ করেছে, আর কারিগর ছিল না সেখানে? তার ভাইও তো আসতে চেয়েছিল"

পটলকর্তা গর্জন করিয়া উঠিলেন, "পঞ্চা আমাকে বললে কেষ্ট-নগরের প্রতিমার চেয়ে ভালো প্রতিমা গড়ে' দেবে সে। সোনার-বেনেদের প্রতিমা ওই তো গড়ে ফি বছর"

ভোলানাথ বলিলেন "এবার গড়ে নি। সোনারবেনেরা এবার

কেষ্টনগর থেকে লোক আনিয়েছিল। চমৎকার প্রতিমা হয়েছে তাদের''

"তাই না কি''

পটলকর্তার গালে কে যেন একটা চড় কসাইয়া দিল। সোনার-বেনেদের প্রতিমা চমৎকার হইয়াছে ! তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন। গ্রামের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘোর শত্রুতা ছিল। বংশপরম্পরাগত শত্রুতা।

এই সুবর্ণ-বণিকরা মকোর্দমা করিয়া পটলকর্তার পিতামহকে ঋণের দায়ে নাকি সর্বস্বান্ত করিয়াছিল। পটলকর্তা বলেন—উহারা জাল হ্যাণ্ডনোট তৈয়ারি করিয়াছিল। সত্য কি তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কিন্তু পটলকর্তার ধারণা সেই মকোর্দমার ফলেই তাঁহাকে আজ বিদেশে চাকুরি করিতে হইতেছে। পূর্বপুরুষদের বিষয়আশয় থাকিলে তিনি স্বচ্ছন্দে এই গ্রামেই পায়ের উপর পা দিয়া জীবনযাপন করিতে পারিতেন। দৈন্য সত্ত্বেও পটলকর্তা পূর্বপুরুষদের জগদ্ধাত্রী পূজাটা বজায় রাখিয়াছিলেন এবং সেই পূজা উপলক্ষ করিয়া সোনার-বেনেদের উপর টেক্কা দিতে চেষ্টা করিতেন। ঠিক টেক্কা দিতে পারিতেন না, কারণ সোনার-বেনেরা প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিপতি ছিলেন। বাজি পুড়াইয়া, লোক খাওয়াইয়া, যাত্রা থিয়েটার করিয়া তাঁহারা যে বিপুল উৎসব করিতেন তাহা করিবার সামর্থ্য পটলকর্তার ছিল না। তবু তিনি চেষ্টা করিতেন প্রতিমাটা অন্তত যাহাতে সোনার বেনেদের প্রতিমার অপেক্ষা ভালো হয় ; প্রতি বৎসর তাহা হইতও, অন্তত ভোলানাথ-প্রমুখ তাঁহার পারিষদেরা একথা তাঁহাকে বলিত এবং তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। কিন্তু এবার ভোলানাথের মুখে একি কথা !

বাড়িতে ঢুকিয়াই তাঁহার দেখা হইয়া গেল হাবুর সহিত ! হাবু পাড়ারই ছেলে এবং সম্পর্কে তাঁহার নাতি।

"হাবু, প্রতিমা কেমন হয়েছে রে—"

"সিংহ ভালো হয় নি দাদু। কান দুটো ইদুরের কানের মতো হয়েছে—"

পটলকর্তা ক্রোধে অস্ফুট শব্দ করিতে করিতে দালানের দিকে হন হন করিয়া আগাইয়া গেলেন। চটিয়া গেলে পটলকর্তার গলা হইতে একপ্রকার শব্দ বাহির হইত যাহা অবর্ণনীয়। দাঁতও কড়মড় করিত। দালানে পঞ্চানন বসিয়া তখনও প্রতিমার গায়ে রং দিতেছিল। পটলকর্তা দালানের দ্বারে দাঁড়াইয়া প্রতিমাটি নিরীক্ষণ করিলেন। পরমুহূর্তেই তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল—"পঞ্চা! এ কি করেছিস? এই কি সিংহের কান?"

পঞ্চানন একলম্ফে পাশের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। পটলকর্তাকে সে চিনিত। ইহার পর পটলকর্তা যাহা করিলেন তাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। তিনি ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া পঞ্চাননকে না পাইয়া সিংহেরই কানটা মলিয়া দিলেন। মাটির কান মট্ করিয়া ভাঙিয়া গেল।

"ও কি করলে, ও কি করলে, কাল যে পূজো—"

পটল-গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া মুক্তকচ্ছ কম্পিত-কলেবর পটলকর্তাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। পুনরায় পঞ্চাননের কাছে গোপনে লোক পাঠানো হইল। সে লুকাইয়া আসিয়া সমস্ত রাত জাগিয়া সিংহের কান জোড়া লাগাইল।

এ গল্পটি আমি সন্তোষের মায়ের কাছে শুনিয়াছি। তিনি খুব চমৎকার গল্প বলিতে পারিতেন। কতদিন আগে শোনা গল্প এখনও স্পষ্ট মনে আছে। আমার জীবনে পটলকর্তার সহিত দেখা আরও দুই একবার ঘটিয়াছিল। তাহা যথাস্থানে বলিব। পটলকর্তার সহিত আমাদের আত্মীয়তাও ছিল। তিনি আমার মামার দূরসম্পর্কের কাকা হইতেন। আমার মামা আত্মীয়বৎসল ছিলেন। অনেক গরীব আত্মীয়কে তিনি অর্থ সাহায্য করিতেন। পটলকর্তাকেও করিতেন। একথা তখন জানিতাম না, পরে শুনিয়াছিলাম..."

এই পর্যন্ত পড়িয়া কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল একটি দোয়েল পাখী সামনের গাছের ডালে বসিয়া আছে। মাঝে মাঝে পুচ্ছটি উৎক্ষিপ্ত করিতেছে। হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল। ক্ষীণ কর্কশ কণ্ঠ। অথচ এই দোয়েলই গ্রীষ্মকালে কি চমৎকার ডাকে। তাহার মনে পড়িল কোথায় যেন পড়িয়াছিল যে শীতকালে দোয়েলরা ভালো ডাকিতে পারে না। গ্রীষ্মকালে যাহার গলায় অত স্বর, শীতকালে সে বেসুরা। কুমার একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তাহার পর হঠাৎ তাহার মনে হইল, পাখীদের কি পক্ষাঘাত হয়? দোয়েলটা উড়িয়া গেল। কুমারও উঠিয়া পড়িল। খাতাটি বগলে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেল।

পিছনের ঘরে বসিয়া কুমার আবার স্মৃতিকথায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

"আমার সেই সময়কার আরও কিছু কিছু কথা মনে পড়িতেছে। মনে পড়িতেছে সন্তোষের মাকে, আমার সইমাকে। আমার শৈশবজীবনের প্রধান একটা অংশ পূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি। প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাঁহার কাছে আমরা গল্প শুনিতে যাইতাম। সাধারণত দিদিমারাই নাতিদের গল্প বলেন, আমার দিদিমা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া যাইতেন, মনে হইত তিনি বড় অসহায় হইয়া পড়িয়াছেন। মা তাঁহাকে সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিছানায় বসাইয়া দিতেন। তিনি বিছানায় বসিয়া আপন মনে নিজের সহিতই কথা কহিতেন। কি বলিতেন বুঝিতাম না, যাহাদের নাম করিতেন তাহাদেরও চিনিতাম না। অঘোর-ঠাকুরপো, মহেশমামা, মহেন্দ্রদাদা এমনি সব কত নাম। খেতু-মামাকে একদিন বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'সন্ধ্যের সময় বৌদি অতীতে ফিরে যান।' হয়তো তাঁহার যৌবনের দিনগুলি মনে পড়িত। সেই সময় যাহারা তাঁহার প্রিয় ছিল, যাহারা বহুদিন পূর্বে মারা

গিয়াছে, তাহারাই তাঁহাকে সন্ধ্যার সময় পাইয়া বসিত। তাহাদেরই সহিত তিনি গল্প করিতেন। আমরা কাছে গেলে বিরক্ত হইতেন। তাই আমরা সন্ধ্যার সময় সইমার কাছে গিয়া আশ্রয় লইতাম। তিনি আমাকে, সন্তোষকে এবং পাড়ার আরও তুই চারিজন ছেলেমেয়েকে রোজ গল্প বলিতেন। গ্রীষ্মকালে আমাদের আড্ডা বসিত রান্নাঘরের ছোট দাওয়াটিতে, শীতকালে রান্নঘর সংলগ্ন ভঁাড়ার ঘরে। সইমা রঁাধিতে রঁাধিতে আমাদের গল্প বলিতেন। সে যে কত রকমের গল্প। পরীর গল্প, রাজপুত্রের গল্প, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গল্প, সুখুতুখুর গল্প। এসব ছাড়া গ্রামের অনেক পুরাতন সত্য গল্পও আমাদের বলিতেন তিনি। গল্প বলিবার চমৎকার একটি বিশেষত্ব ছিল তাঁহার। এমন ভাবে গল্প বলিতেন যেন সমস্ত ঘটনাটা আমাদের চোখের উপর ফুটিয়া উঠিত। সিনেমা দেখিয়া ছেলেমেয়েরা আজকাল যে আনন্দ পায় আমরা তাহার চেয়েও বেশী আনন্দ পাইতাম, কারণ কল্পনার সিনেমায় আমরা মনে মনে যে ছবি সৃষ্টি করিতাম বাস্তবের সিনেমায় তাহা সম্ভবে না। একই গল্পকে কেন্দ্র করিয়া আমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ছবি দেখিতাম। সইমার গল্পস্রোত কখনও মন্থর গতিতে চলিত, কখনও দ্রুতগতিতে। কখনও জোরে জোরে বলিতেন, কখনও চুপি চুপি। গল্পের প্রতিটি চরিত্রের সহিত সইমা যেন একাত্ম হইয়া যাইতেন। রাক্ষসীর কথা যখন বলিতেন, তখন তিনিই যেন রাক্ষসী, পরীর কথা যখন বলিতেন তখন তিনিই যেন পরী। আমরা রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া শুনিতাম। মাঝে মাঝে আমাদের গল্প-শোনায় বাধা পড়িত। সই-মা মাঝে মাঝে গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেন। সই-মার রান্নার খুব সুখ্যাতি ছিল। তাই আশপাশের গ্রামে ভোজকাজের বাড়িতে সইমার ডাক পড়িত।

গরুর গাড়ি, কখনও কখনও বা পাল্‌কি পাঠাইয়া তাঁহাকে তাহারা লইয়া যাইত। কয়েকটি বিশেষ রান্নায় সইমার খুব নাম

ছিল। লাউঘণ্ট, শাকের ঘণ্ট, সুক্তো, বড়ির ঝাল, বেগুনের টক প্রভৃতি কয়েকটি নিরামিষ রান্নায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আজকাল উৎসবের বাড়িতে লোকে নামকরা গায়ক-গায়িকাকে যেমন সসম্মানে লইয়া যায়, সেকালে সইমাকে ঠিক তেমনি সসম্মানে লোকে ছুই একটা তরকারি রাঁধিবার জন্য লইয়া যাইত। গায়কগায়িকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গান শুনাইবার জন্য দক্ষিণা গ্রহণ করেন, দক্ষিণার লোভেই অনেক সময় তাঁহারা আসেন কিন্তু সইমা যাইতেন স্নেহের আকর্ষণে, হয়তো প্রশংসার লোভ একটু থাকিত। আমি জানি পাঁচ ক্রোশ দূরের একটি গ্রামে একবার একজনের অসুখের পর অরুচি হইয়াছিল, কোন খাবারই তাহার মুখে রুচিত না। সইমার সহিত তাহাদের সামান্য একটু আত্মীয়তা ছিল। রোগীর মা স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, 'সন্তোষের মা, তুমি একবার চল। তোমার হাতের রান্না খেলে হয়তো অতুলের অরুচি ঘুচবে। কোবরেজ মশাই তরকারিতে মশলা দিতে বারণ করেছেন। তরকারিতে মশলা না দিয়ে তরকারির স্বাদ আমরা তো করতে পারি না। তুমি পার। বিনা মশলায় চমৎকার রাঁধ তুমি। তোমাকে যেতে হবে।' সইমা সত্যই তাঁহার সহিত চলিয়া গেলেন এবং তাহাদের বাড়িতে দশ-পনর দিন থাকিয়া অতুলের অরুচি সারাইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্তোষও তাহার মায়ের সহিত গিয়াছিল, আমারও যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আমার মা আমাকে যাইতে দেন নাই। সইমার তখনকার চেহারাটাও আমার স্পষ্ট মনে আছে। তিনি আমার মায়ের সমবয়সী ছিলেন। তাঁহার যেমন স্বাস্থ্য ছিল, তেমনি রং। আমার মা শ্যামবর্ণা ছিলেন। কিন্তু সইমা ছিলেন ধপধপে ফরসা। আগুনের তাত বা রোদের তাত লাগিলে মুখখানা সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিত। ছিপছিপে দোহারা গড়ন ছিল তাঁহার। কপালের ঠিক মাঝখানটিতে ছিল নীল রঙের ছোট্ট একটি উল্কি, মনে হইত টিপ পরিয়া আছেন। তখন সন্তোষ ছাড়া

তাঁহার আর কোন সন্তান হয় নাই। আমরা শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর তাঁহার উপর্যুপরি তিনটি কন্যা হয়—"

কুমারের এই অংশটুকু পড়িতে বড় ভাল লাগিতেছিল। দিদিমা যৌবনে যে এত রূপসী ছিলেন তাহা সে জানিত না। সে যখন দিদিমাকে দেখিয়াছিল তখন তিনি অতি-বৃদ্ধা, সোজা হইয়া হাঁটিতে পর্যন্ত পারিতেন না, কোমর ভাঙিয়া গিয়াছিল।···চিন্তায় বাধা পড়িল। একটা চাকর ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল কয়েকদিন পূর্বে যে মহিষটা নিরুদ্দেশ হইয়া গিয়াছিল সে না কি সমীপবর্তী বাহী নদীর জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কুমার উঠিয়া পড়িল এবং নদীতীরে গিয়া দেখিল সত্যই তাই। এটি মহিষ নয়, মহিষী। কিছুদিন পূর্বে কুমার এটিকে কিনিয়াছিল। এখনও কিন্তু তেমন পোষ মানে নাই, সুযোগ পাইলেই পলায়ন করে।

কুমার নদীতীরে দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিতে লাগিল—'যমুনী, আয়, আয়, আঃ আঃ আঃ।' কুমার প্রত্যাশা করে নাই যে যমুনী আসিবে, কিন্তু আসিল। নদীতে তেমন জল ছিল না, বেশীর ভাগই কাদা। সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া যমুনী কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কুমার তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিল। একটা চাকর দড়ি লইয়া পিছন দিক হইতে তাহাকে বাঁধিবার জন্য গুড়ি মারিয়া আসিতেছিল। কুমার তাহাকে বারণ করিল।

"ওকে এখন বাঁধতে হবে না। এইখানেই চরুক—"

পাশের একটা জমিতে প্রচুর গম আর যব হইয়াছিল। কুমারেরই জমি। যমুনী সেই ক্ষেতে ঢুকিয়া মনের আনন্দে খাইতে আরম্ভ করিল। কুমার বাধা দিল না। মহিষটা এমনভাবে ফসল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া চাকরগুলার বুক করকর করিতেছিল, কিন্তু মালিক যখন কিছু বলিতেছে না, তখন তাহারাও আর কিছু বলিতে সাহস করিল না। কুমার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া খাতায় মন দিল। দেখিল বাবা দিদিমার কথা আর লেখেন নাই, অন্য প্রসঙ্গ পাড়িয়াছেন।

"...সেই সময়ের আর একটি লোকের কথা মনে পড়িতেছে, গোলক পণ্ডিতকে, যিনি আমার এবং সন্তোষের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন। গোলক পণ্ডিত কতদূর লেখাপড়া জানিতেন জানি না, কিন্তু তিনি যে ভাল শিক্ষক ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। লোকও খুব ভাল ছিলেন। সেকালে পণ্ডিতেরা সাধারণত যেরূপ উগ্র ও নিষ্ঠুর হইতেন (সাহেবগঞ্জের দীনু পণ্ডিত যেমন ছিলেন, পরে সাহেবগঞ্জে গিয়া এই লোকটির কবলে আমাকে পড়িতে হইয়াছিল) গোলক পণ্ডিত মোটেই সে রকম ছিলেন না। পাঠশালা বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও তাহার ছিল না, ছাত্রসংখ্যাও যে খুব বেশী তাহা নয়। সন্তোষ, জীবু এবং আমি এই তিনজন মাত্র তাঁহার ছাত্র ছিলাম। তাঁহার ছিল ছোট একটি মুদির দোকান। চাল, ডাল, নুন, মশলা প্রভৃতি তাহাতে থাকিত। দোকানের সংলগ্ন ছোট একটি বারান্দায় আমরা তিনজন বসিয়া তাঁহার নিকট লেখাপড়া শিখিতাম। শিক্ষাপদ্ধতিটা এই প্রকার ছিল। আমাদের প্রথমেই গিয়া গুরুমহাশয়কে প্রণাম করিতে হইত। তাহার পর আমরা চোখ বুজিয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইতাম। তিনি সরস্বতীর সংস্কৃত স্তবটি এক এক লাইন করিয়া বলিয়া যাইতেন, আমাদের তাহা আবৃত্তি করিতে হইত। ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতি শুভ্রকান্তিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সরস্বতীর ধ্যান, প্রণামমন্ত্র, স্তোত্র সমস্তটা বলিবার পর পণ্ডিত মহাশয় উঠিয়া বারান্দার উপর খড়ি দিয়া অ আ বড় বড় করিয়া লিখিয়া দিতেন। আমরা তাহার উপর খড়ি দিয়া দাগ বুলাইতাম। ক্রমশ অক্ষরগুলি স্থূলাকৃতি হইয়া উঠিত, আমাদের হাত মুখ জামা কাপড়ও খড়ির গুঁড়ায় শাদা হইয়া যাইত। তখন পণ্ডিত মহাশয় হুকুম দিতেন—"এইবার ডাল দিয়ে সাজাও—"

"কি ডাল দিয়ে সাজাব পণ্ডিত মশায়"

"মশুর ডাল দিয়ে সাজাও আজ"

আমরা তখন মশুর ডাল অক্ষরগুলির উপর নিপুণভাবে সাজাইতাম। দেখিতে দেখিতে মশুর-ডালে-লেখা 'অ' 'আ' হইয়া যাইত। নিজেদের কৃতিত্বে আমরা নিজেরাই মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম। বৈচিত্র্য করিবার জন্য প্রতিদিন ভিন্ন ভিন্ন ডাল ব্যবহার করা হইত। ডাল আমরা কিনতাম পণ্ডিত মহাশয়ের দোকান হইতেই। পাঁচটি ছোট ছোট মাটির-ভাঁড়ে পাঁচ রকম ডাল থাকিত। ইহার জন্য আমরা পণ্ডিত মহাশয়কে সবসুদ্ধ চার পয়সা দিতাম। মাঝে মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে নূতনত্বের আমদানি করিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাদের আনন্দ ও বিস্ময় বৃদ্ধি করিতেন। ডালের বদলে কোনদিন বা তুলার বিচি আনিয়া দিতেন। এ সবের জন্য আলাদা পয়সা দিতে হইত না। একবার কোথা হইতে তিনি কুঁচফল আনিয়া আমাদের বলিলেন, "আজ এইগুলো দিয়ে সাজাও দিকি—"। সেদিনকার উত্তেজনা আজও যেন অনুভব করিতেছি। কুঁচফলের অ-আ-গুলি আজও যেন চোখের উপর ভাসিতেছে। লেখা হইয়া গেলে পণ্ডিত মহাশয় আমাদের ধারাপাত ঘোষাইতেন। শতকিয়া হইতে শুরু হইত। দোকানের কাজ করিতে করিতেই পণ্ডিত মহাশয় আমাদের পড়াইতেন। খরিদ্দার আসিলেও আমাদের পড়া বন্ধ হইত না। পড়াইবার জন্য পণ্ডিত মহাশয় কোন বেতন লইতেন না, আমাদের বাড়িতে মাঝে মাঝে কেবল তাঁহার খাইবার নিমন্ত্রণ হইত। খাওয়ার খুব একটা বিশেষ ঘটা বা আয়োজন হইত তাহা নয়, সাধারণ ডাল-ভাত-তরকারিই হইত, বিশেষত্বের মধ্যে হইত কেবল পায়েস। আহারের শেষে খুব বড় একটি জামবাটি-পূর্ণ পায়েস পণ্ডিত মহাশয় পরিতৃপ্তিসহকারে আহার করিতেন। সেদিন তিনি পানও খাইতেন। অন্যদিন তাঁহাকে পান খাইতে দেখিতাম না। ঠানদির বাড়িতে আহারাদির পর তাঁহাকে হরিতকির টুকরা মুখে দিতে দেখিয়াছি। এই ঠান্‌দিও একটি চমৎকার চরিত্র। পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ির কাছেই ঠানদির বাড়ি ছিল, ঠানদির বাড়িতে দুইবেলা

তাঁহার আহারাদি সম্পন্ন হইত। ঠানদির সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল জানি না, সম্ভবত রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না। শুনিয়াছি গ্রামের কাহারও সহিত ঠানদির রক্তের সম্পর্ক ছিল না, অথচ তিনি গ্রামের সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গ্রামের একধারে ছোট একটি কুঁড়ে ঘরে একা তিনি বাস করিতেন। তাঁহার সেই কুঁড়ে ঘরের চারিদিকে যে জমিটুকু ছিল তাহা নিজের হাতেই তিনি বেড়া দিয়া ঘিরিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে কত রকম তরিতরকারিই না হইত। কুমড়া ঝিঞ্গা ধুধুল, বেগুন, নানারকম শাক, লঙ্কা, পুদিনা সব ছিল। তাঁহার বাড়ির চটানের একধারে একটা পিয়ারা গাছ, আর একধারে আর একধারে একটা কুলগাছও ছিল। অজস্র ফলিত। কুলগাছে ঢিল মারিলে ঠানদি চটিয়া যাইতেন, লাঠি হাতে বাহির হইয়া আসিতেন—"কে রে মুখপোড়া, গাছে ঢিল মারছিস কে। তোদেরই তো দেব, তোদের গর্ভেই তো সব যাবে, ঢিল মেরে এখন থেকে কাঁচা কুলগুলোকে নষ্ট করছিস কেন। ওই কোষো কুল খেলে কি বাঁচবি, কেসে কেসে মরবি যে"। ঢিল-নিক্ষেপ-কারীকে কোনদিন তিনি ধরিতে পারেন নাই, কিন্তু গাছে ঢিল পড়িলেই লাঠিটি হাতে লইয়া তিনি বাহির হইতেন, উল্লিখিত উক্তিটি সক্রোধে উচ্চারণ করিতেন, এদিক-ওদিক চাহিয়া মিনিটখানেক দাঁড়াইয়া থাকিতেন, তাহার পর মুচকি হাসিয়া আবার ঘরে ঢুকিয়া পড়িতেন। ওই মুচকি হাসিটি হইতে বোঝা যাইত যে তাঁহার রাগটা মেকি। দুষ্ট ছেলেরা যে তাঁহাকে ভয় করে, তাঁহার সাড়া পাইলেই যে ছুটিয়া পালায়, ইহাতেই তিনি খুশী। ইহা লইয়া তিনি গর্বও করিতেন। তাঁহার কাছে কেহ যদি বলিত অমুক ছেলেটা এই বদমায়েসি করিয়াছে, তিনি তৎক্ষণাৎ সগর্বে উত্তর দিতেন, 'কই, আমার সামনে করুক দিকি'। তাঁহার বদান্যতাও ছিল। নিজের এবং পণ্ডিত মহাশয়ের খাওয়ার মতো তরি-তরকারি রাখিয়া বাকিটা তিনি সকলকে বিলাইয়া দিতেন। তাঁহার বাগানের তরি-তরকারি খায়

নাই এমন লোক শঙ্করা গ্রামে খুব কমই ছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত শঙ্করা গ্রামের লোকেরা তাঁহার সহিত সদ্ব্যবহার করে নাই।

পণ্ডিত মহাশয় দুইবেলা তাঁহার বাড়িতে আহার করিতেন। তিনি রান্নাবাড়া সব করিতেন স্বহস্তে। ইহার জন্য পণ্ডিত মহাশয়কে নগদ টাকা কড়ি কিছুই দিতে হইত না। তিনি তাঁহার দোকান হইতে চাল ডাল মশলা প্রভৃতি দিতেন, একটু বেশী বেশী করিয়া দিতেন যাহাতে ঠান্‌দিরও কুলাইয়া যায়। ঠানদির চেহারা অদ্ভুত ছিল। মাথার চুল বেটাছেলের মতো করিয়া ছাঁটা। কাঁচা-পাকা চুল। মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো। গলায় কণ্ঠী, নাকের উপর রসকলি। ঠানদি একটু স্থূলকায়া ছিলেন, হাঁটিবার সময় লাঠিতে ভর দিয়া হাঁটিতেন। গায়ে কিন্তু শক্তি ছিল। বাগানের কাজকর্ম, গাছের গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, গাছে জল দেওয়া প্রভৃতি নিজের হাতেই করিতেন তিনি। উঠানের একধারে ছোট একটি কূপ ছিল, সেই কূপ হইতে নিজের হাতেই তিনি জলও তুলিতেন। কখনও কাহারও পুকুরে জল আনিতে যাইতেন না। মাঝে মাঝে তাহার কূপটি ঝালাইবার জন্য গ্রামান্তর হইতে লোক আসিত। পণ্ডিত মহাশয় মজুরি স্বরূপ তাহাদের চার আনা পয়সা দিতেন, আর ঠানদি তাহাদের ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইতেন। এই লোকগুলি আমাদের নিকট বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তাহারা কুয়ার ভিতর দড়ি, ঝুড়ি বালতি প্রভৃতি নামাইয়া দিত, তাহার পর একজন নামিয়া যাইত, আর একজন উপর হইতে বালতি করিয়া জলকাদা প্রভৃতি তুলিতে থাকিত। একবার মনে আছে প্রকাণ্ড একটা ব্যাংও উঠিয়াছিল। যতক্ষণ সেই লোকগুলি থাকিত আমরা পাড়ার ছেলেরা ভীড় করিয়া তাহাদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতাম। যে কুয়ার ভিতর জুজুবুড়ি আছে, কুয়ার পাড়ে ঝুঁকিয়া কুক্‌ করিয়া শব্দ করিলে যে জুজুবুড়ি তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর দেয় আমরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি, সেই জুজুবুড়িকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকগুলা কুয়ার ভিতর

নামিতেছে, সর্বাঙ্গে কাদা মাখিয়া উঠিতেছে, আবার নামিতেছে। সত্যই আমাদের বিস্ময়ের আর অন্ত থাকিত না।

পূর্বেই বলিয়াছি ঠান্‌দির সহিত গ্রামের কাহারও রক্তের সম্পর্ক ছিল না, পণ্ডিত মহাশয়ের সহিতও না। সন্তোষের মা বলিতেন গ্রামে মধু চাটুজ্যে বলিয়া কে একজন ছিলেন তিনিই ঠানদিকে বহুকাল পূর্বে বৃন্দাবন হইতে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। ঠানদি নাকি তাঁহার ধর্ম-ভগ্নী ছিলেন। বৃন্দাবনের এক বৈষ্ণবাচার্যের নিকট তাঁহারা উভয়েই দীক্ষা লন। বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যে মৃত্যুকালে তাঁহার কয়েক বিঘা ধানের জমি এবং গ্রামের প্রান্তে ওই জায়গাটুকু ঠানদিকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। চাটুজ্যে-পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে তাঁহার পূর্বপুরুষের ভিটা ছিল, তাহা তিনি কাহাকেও দেন নাই। সেই জমির উপরেই পরে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ স্থাপিত হয়। মধু চাটুজ্যের তিনকুলে কেহ ছিল না এটুকুও তিনি ঠানদিকে দিয়া যাইতে পারিতেন। দিয়া যান নাই তাহার কারণ তিনি সম্ভবত বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে পাড়ার ঠিক মধ্যস্থলে ঠানদি শান্তিময় জীবন যাপন করিতে পারিবেন না। পাড়ার লোকেরা এই অজ্ঞাতকুলশীলাকে সুচক্ষে দেখিবে না। বাহিরের একটি স্ত্রীলোক মধু চাটুজ্যের সমস্ত বিষয়টা গ্রাস করিয়া বসিয়াছে ইহা সহ্য করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইবে। আর একটা কথাও তাঁহার বোধ হয় মনে হইয়াছিল। ঠানদি যদি বাস করিতে না পারিয়া ভিটাটুকু অপর কাহাকেও বিক্রয় করিয়া দেন এবং সে লোকটিও যদি পাড়ার অশান্তির কারণ হইয়া পড়ে তাহা হইলে সেটাও ঠিক হইবে না। সম্ভবত এই সব ভাবিয়া পাড়ার পাঁচজনের বিচারবুদ্ধির উপরই তিনি ভিটাটুকুর ভার দিয়া গিয়াছিলেন। গোলক পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত ঠানদির ঘনিষ্ঠতা ঘটিয়াছিল এক অদ্ভুত ঘটনার ফলে। গোলক পণ্ডিতের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কোনও গ্রামে। শিবরাম গাঙ্গুলীর রাধাশ্যাম বিগ্রহের পূজারী হইয়া তিনি প্রথমে শঙ্করা গ্রামে

আসেন। শিবরাম গাঙ্গুলীর বিবাহ হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়, শ্বশুরের অর্থে এবং আগ্রহেই তিনি রাধাশ্যাম বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং তিনিই গোলক পণ্ডিতকে পূজারী নির্বাচন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। শিবরাম এবং তৎপত্নী বিন্ধ্যবাসিনী যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন গোলক পণ্ডিতের পূজারীপদ অটল ছিল। কিন্তু তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণকমলের সহিত গোলক পণ্ডিতের খিটিমিটি বাধিতে লাগিল। কৃষ্ণকমল অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন। অতিশয় নিষ্ঠা সহকারে জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা এবং পঞ্জিকা মানিয়া চলিতেন। গ্রামের দলাদলি এবং ঘোঁটেরও প্রধান পাণ্ডা ছিলেন তিনি। তিনি যখন মালিক হইলেন তখনই ঠানদি মধু চাটুজ্যের বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী হইয়া শঙ্করা গ্রামে বসবার শুরু করেন। শুরু করিবামাত্র অনেকেরই বিষদৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন তিনি, বিশেষ করিয়া কৃষ্ণকমলের অভিসন্ধি ছিল যে নিঃসন্তান মধু চাটুজ্যের বিষয়টি তাঁহার মৃত্যুর পর তিনিই ক্রমশ হস্তগত করিয়া ফেলিবেন। অসম্ভবও হইত না, কারণ ঠিক তাঁহার জমির পাশেই মধু চাটুজ্যের জমি, আল ক্রমশ সরাইয়া লইলে কেহ আপত্তি করিত না। কিন্তু মধু চাটুজ্যের উইল বাহির হইতেই সব গোলমাল হইয়া গেল। ঠানদির উপর তিনি জাত-ক্রোধ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রথমে ধমক দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া ঠানদিকে গ্রাম ছাড়া করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বুঝিলেন ঠানদি অত সহজে হঠিবার পাত্রী নন, বেশ প্রতাপশালিনী। আইনও তাঁহার স্বপক্ষে ছিল। তিনি একেবারে সোজা চলিয়া গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। ম্যাজিস্ট্রেটটি ছিলেন একটি সদ্য-পাস-করা ছোকরা সাহেব। অবলাদের প্রতি সাহেবদের সৌজন্য সুবিদিত। তিনি নিজে আসিয়া সব অনুসন্ধান করিলেন এবং ঠানদিকে অভয় দিয়া গেলেন। কৃষ্ণকমলকে অনুভব করিতে হইল আইনের দিক দিয়া সুবিধা হইবে না। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কোপদৃষ্টিতে

পড়া সমীচীনও নয়। তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। গ্রামের দলাদলির দলপতি ছিলেন তিনি। তাঁহার প্ররোচনায় গ্রামের লোকেরা ঠানদিকে একঘরে করিল। সিদ্ধান্তটা গোপনই ছিল, ঠানদি প্রথমে কিছু বুঝিতে পারেন নাই। বুঝিতে অবশ্য বেশী বিলম্ব হইল না। কিছুদিন পরেই যখন তিনি তাঁহার গুরুদেবের জন্মদিনে স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া গ্রামের লোকজনদের নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন এক গোলক পণ্ডিত ছাড়া আর কেহ খাইতে আসিল না, তখন ঠানদি ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। কৃষ্ণকমল গোলক পণ্ডিতকেও যাইতে বারণ করিয়াছিলেন কিন্তু গোলক পণ্ডিত তাঁহার বারণ শোনেন নাই। স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন তিনি। এইজন্য তাহার চাকুরিটি গেল। কৃষ্ণকমল তাঁহাকে পূজারীপদ হইতে অপসৃত করিয়া অন্য লোক বাহাল করিলেন। গোলক পণ্ডিত 'দেশেই ফিরিয়া যাইতেন, কিন্তু ঠানদি তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি বলিলেন, "আমি আমার বাড়ির পাশে তোমাকে একটুকরো জমি দিচ্ছি, তুমি তার উপর একটা দোকান কর, মাথা গোঁজবার জায়গাও কর একটা। মুখপোড়াদের হুমকিতে পালিয়ে যাবে কেন পুরুষ মানুষ হ'য়ে! এটা কি মগের মুলক না কি। তুমি বিয়ে থা কর নি, সংসারের ঝঞ্ঝাট নেই, তোমার একটা পেট চলে' যাবেই। এইখানেই থাক।" গোলক পণ্ডিত থাকিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা ঠানদির পুকুরও বন্ধ করিয়াছিল। ঠানদি তাহাতেও দমেন নাই। তাঁহার কিছু গহনা ছিল, সেই গহনা বিক্রয় করিয়া তিনি নিজের উঠানে পাকা ইঁদারা করাইয়া লইলেন। যতদিন সে ইঁদারা না হইল ততদিন তিনি তিন-ক্রোশ-দূরবর্তী একটি নদী হইতে জল আনাইতেন, এজন্য তিনি একজন বাঁকী (যাহারা বাঁকে করিয়া জল বহন করে) মাহিনা দিয়া বাহাল করিয়াছিলেন। আমার জন্মের বহুপূর্বে এসব ঘটনা ঘটিয়াছিল। অনেক বড় হইয়া

আমি এসব কাহিনী শুনিয়াছি। আমার শৈশবে যখন আমি ঠানদি এবং গোলক পণ্ডিতকে দেখিয়াছিলাম তখন তাঁহাদের সহিত গ্রামের লোকের যে এত বিরোধিতা আছে তাহা বুঝিতে পারি নাই। বিরোধিতার পরিবর্তে হৃদ্যতাই বরং লক্ষ্য করিয়াছিলাম। আমার জন্মের পূর্বেই কৃষ্ণকমল মারা গিয়াছিলেন। এখন আমার মনে হয় তাঁহার বাগানের তরিতরকারির জোরেই ঠানদি সকলের সঙ্গে পুনরায় ভাব জমাইয়াছিলেন। তাঁহার বাগানের তরিতরকারি যে সকলেই সানন্দে লইত ইহা আমি নিজে দেখিয়াছি। কৃষ্ণকমল বাঁচিয়া থাকিলে এটা সম্ভব হইত কি না জানি না। কিন্তু তিনি ঠানদির সম্বন্ধে যে অপপ্রচার করিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফল বীভৎসভাবে ফলিয়াছিল তাঁহার মৃত্যুর পর। আমি শঙ্করা হইতে চলিয়া আসিবার পর ঠানদি অনেকদিন বাঁচিয়া ছিলেন। গোলক পণ্ডিতও। আমি যখন ঠানদির মৃত্যুসংবাদ পাই তখন আমি কলিকাতায় পড়িতেছি। ভয়াবহ সে সংবাদ। গ্রামের একটি লোকও না কি ঠানদির মড়া তুলিতে আসে নাই। মড়া তিন দিন পড়িয়াছিল। গোলক পণ্ডিত অনেকের পায়ে পর্যন্ত ধরিয়া অনুনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই আসে নাই। চতুর্থ দিনে দেখা গেল ঠানদিন ঘরের চালে শকুনি বসিয়াছে। গোলক পণ্ডিত তখন অগত্যা যাহা করিলেন তাহা খুবই দৃষ্টিকটু সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া অন্য উপায়ও ছিল না। তিনি ঠানদির পায়ে দড়ি বাঁধিয়া একাই তাহাকে টানিতে টানিতে শ্মশানে লইয়া গেলেন। ঠানদির জমির এক ভাগীদার চাষী ছিল, বৃদ্ধ নিয়ামত আলি। সেই কেবল লাঠি উঁচাইয়া শকুনি এবং কুকুর তাড়াইতে তাড়াইতে পণ্ডিত মহাশয়েয় সঙ্গে শ্মশান পর্যন্ত গিয়াছিল। নিয়ামত আলির সহায়তায় গোলক পণ্ডিত ঠানদিকে দাহ করেন। ঠানদি উইল করিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গোলক পণ্ডিতকেই দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ঠানদির মৃত্যুর পর গোলক পণ্ডিত আর শঙ্করা গ্রামে থাকেন নাই। তিনি

ঠানদির সমস্ত সম্পত্তি নিয়ামত আলিকে দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নিয়ামত আলির সন্তান-সন্ততিরা কিছুদিন আসিয়া ঠানদির ভিটাতে বাসও করিয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিতে পারে নাই, ঠানদির প্রেতাত্মার ভয়ে শেষে তাহারা পলাইয়া গেল। রাত্রে তো বটেই, দিনে দুপুরেও তাহারা নাকি ঠানদিকে দেখিতে পাইত, বিশেষ করিয়া তাঁহার সেই কুল-গাছটার আশে-পাশে।"

কুমার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল। বাড়ির দক্ষিণে বামে সম্মুখে পশ্চাতে সমস্তটা তাহাদের। জমিতে অনেক ফসল ফলিয়াছে, চারিদিকে সবুজে সবুজ। যমুনা মনের আনন্দে একটা ক্ষেতের যব গম নিঃশেষ করিতেছে। মাঝে মাঝে তাহার নাক হইতে ফোঁস ফোঁস করিয়া শব্দও বাহির হইতেছে, কিন্তু কুমারের এসব দিকে লক্ষ্য নাই। তাহার মনে হইতেছিল সত্যই কি ভূত আছে? মা কি কোথাও বাঁচিয়া আছেন? মুক্তি মোক্ষ এসব কি ধরনের অবস্থা! আমাদের কথা মায়ের কি আর একটুও মনে নাই? বাবার কথাও না? এ চিন্তা কিন্তু কুমারের মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। রাধানাথ গোপ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"আমি আমার ঘর থেকে মণ দুই চিঁড়ে আনতে বলে' দিয়েছিলাম। সেটা এসে পৌঁছেচে। কোথাও রাখিয়ে দাও। কত লোক আসবে তো, 'রেডিমেড' খাবার কিছু থাকা ভাল। রামধনিয়ার গোলাতে ভাল গুড় আছে, আনিয়ে রেখে দাও কিছু—"

দুইটি বস্তা মাথায় করিয়া দুইজন মজুরনী আসিয়া পড়িল। একজন কুমারকে দেখিয়া মৃদু হাসিল। তাহার চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহ উপচাইয়া পড়িতে লাগিল। বহুদিন পূর্বে তাহার স্বামী এখানে কাজ করিত। সে-ও জমিতে জন খাটিতে আসিত। তখন কুমার ছয় সাত বছরের শিশু, এখন কত বড়টি হইয়াছে। চলিত হিন্দীতে এই কথাগুলি বলিয়া সে উঠানের দিকে চলিয়া গেল। এ

বাড়ির সব তাহার চেনা। দ্বিতীয় মজুরনীটি অনুসরণ করিল তাহার।

"ওগুলো রাখিয়ে দাও, তাহলে। আমি চললুম। দেখো যেন ড্যাম্প না লাগে"

রাধানাথ গোপ আবার ব্যস্তভাবে চলিয়া যাইতেছিলেন।

কুমার ইতস্তত করিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিল অবশেষে। "ওর দামটা কি এখনিই দিয়ে দেব"

"ওর দাম অনেকদিন আগেই পেয়ে গেছি। তোমার বাবা দিয়েছেন। এইখানে জমা আছে"—বলিয়া তিনি বুকে হাত দিয়া দেখাইলেন। তাহার পর ধমকের সুরে বলিলেন, "তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাব তুমি করতে যেও না। সে অঙ্ক তুমি কষতে পারবে না, যদিও তোমার ম্যাথামেটিক্‌সে অনার্স ছিল—"

খানিকক্ষণ কুমারের দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর হনহন করিয়া চলিয়া গেলেন। কুমারও ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটা চাকরকে ডাকিয়া চিঁড়ার বস্তা দুইটি ভঁড়ার ঘরে মাচার উপর রাখিয়া দিতে বলিল।

...মজুরনীটি খিড়কির পাশে কুমারের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়াছিল। কুমার কাছে আসিতেই তাহার মুখে মাথায় চিবুকে হাত বুলাইয়া আদর করিল। তাহার পর ডাক্তারবাবুর অসুখের কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ভাই বোনদের খবর দেওয়া হইয়াছে কি না, কবে তাহারা আসিবে, সমস্ত জানিয়া লইল সে। তাহার পর ম্লান হাসিয়া যাহা বলিল, "তোদের দেখেই আমার আনন্দ। আমি নিজে তো হতভাগী, স্বামী নেই, একমাত্র ছেলে কয়লা সবে জোয়ান হয়ে উঠছিল, গতবার কলেরায় সে-ও গেল। রাধাবাবুর কাছে কিছু ধার আছে, খেটে খেটে সেইটেই উশুল করছি এখন—"

কুমার উর্মিলাকে ডাকিয়া বলিল—"এদের কিছু খেতে দাও"

"আচ্ছা—"

মজুরনী দুইজন বারান্দায় উঠিয়া দরজার একপাশে দাঁড়াইয়া তাহাদের ডাক্তারবাবুকে দেখিতে লাগিল। কয়লার মায়ের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কুমার আবার গিয়া ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়াছিল। ডায়েরিখানা আবার পড়িতে শুরু করিয়াছিল সে।

"...আজ শেষ বয়সে শঙ্করা গ্রামে অতিবাহিত আমার সেই শৈশব জীবনের কথা স্মরণ করিতে গিয়া আর একটি কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়িতেছে, সেটি গ্রামের পূজা পার্বণের কথা, সেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা। বৈশাখের নববর্ষ হইতে শুরু করিয়া অক্ষয় তৃতীয়া, গন্ধেশ্বরী পূজা, সাবিত্রী চতুর্দশী ব্রত, জামাই ষষ্ঠী, দশহরা, স্নানযাত্রা, রথ, নীলষষ্ঠী, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, দুর্গোৎসব, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, দোল, চড়ক প্রভৃতি বড় বড় উৎসব তো ছিলই তাছাড়া সীতানবমী, লুণ্ঠনষষ্ঠী, উমা চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, দুর্বাষ্টমী, তালনবমী, সত্যনারায়ণ পূজা, ললিতা সপ্তমী, পুণ্যিপুকুর প্রভৃতি ছোট ছোট উৎসবেও আমাদের বাল্যজীবন হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। শুধু হিন্দুদের উৎসব নয়, মুসলমানদের উৎসবও, বিশেষ করিয়া মহরম। মহরমের সেই রঙীন পতাকার সারি, রঙীন কাগজ আর রাংতায় তৈরি মন্দিরের মতো একাণ্ড 'তাজিয়া', মনুষ্যবেশী ঘোড়ারা, তাহাদের লাঠি-খেলা, তরোয়াল-খেলা, তাহাদের হাসেন-হোসেন চীৎকারে আমাদের মনে এক অবর্ণনীয় উত্তেজনার সৃষ্টি করিত। মহরমের মেলার ভীড়ে আমি তো একবার হারাইয়াই গিয়াছিলাম। ফরিদ নামে আমাদের এক প্রজা আমাকে রাত আটটার সময় বাড়ি ফিরাইয়া আনে। মনে পড়িতেছে সে সমস্তক্ষণ আমাকে কাঁধে লইয়া লাঠি-খেলা প্রভৃতি

দেখাইয়াছিল। রাত্রে সে যখন আমাকে লইয়া ফিরিল তখন বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে।...

"সমস্ত উৎসবের সেরা উৎসব ছিল অবশ্য দুর্গোৎসব। সমস্ত গ্রাম যেন মাতিয়া উঠিত। আমার মামার বাড়িতেই দুর্গোৎসব হইত। সে কি সমারোহ। পঞ্চানন যেদিন হইতে প্রতিমা গড়িতে শুরু করিত সেইদিন হইতেই উৎসবের আরম্ভ। আমরা, পাড়ার ছেলেরা, সর্বক্ষণ তাহার নিকটই ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতাম এবং তাহার ফরমাস খাটিতাম। বাহিরের প্রতিমা পঞ্চানন গড়িত, মনের প্রতিমা আমরা গড়িতাম। সে যে কি আনন্দ তাহা বলিয়া বুঝানো শক্ত। ষষ্ঠীর দিন হইতে শুরু করিয়া বিজয়া দশমী পর্যন্ত কাহারও বাড়িতে রান্না হইত না। বাড়ির মেয়েরা পূজার আয়োজন করিতেই ব্যস্ত থাকিতেন। কেহ ভোগ রাঁধিতেন, কেহ পূজার জোগাড় দিতেন, কেহ বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের একধারে বসাইয়া তাহাদের আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনের দিকে গোটা দুই ঘর ছিল, তাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের শোয়ার ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকিত। যাহাতে কচি ছেলেমেয়েদের মায়েরা নিশ্চিন্ত মনে আসিয়া পূজার উৎসবে যোগ দিতে পারে। উৎসবের বিবিধ আয়োজন করিতেন কর্মকর্তারা। যাত্রা, ঢপ, কীর্তন, কথকতা, কবির লড়াই সেই সময়েই দেখিয়াছি, আজকাল আর ওসবের আর তত রেওয়াজ নাই। খাদ্যদ্রব্যের কোনও অভাব ছিল না। মায়ের ভোগ দিবার জন্য প্রত্যেক বাড়ি হইতে এত ফল ও মিষ্টান্ন আসিত যে বিতরণ করিয়াও অনেক বাঁচিয়া যাইত। দ্বিপ্রহরে পংক্তি-ভোজনে বসিয়াও আমরা ভূরি-ভোজন করিতাম। খাদ্যদ্রব্যের তালিকায় চপ কাটলেট পুডিং জাতীয় আধুনিক খাদ্য থাকিত না, থাকিত ভালো সুগন্ধ আলো চালের ভাত, মুগের ডাল, পাঁচ ছয় রকম নিরামিষ তরকারি, একটা ভালো চাটনি, দুই তিন রকম মিষ্টান্ন, দই এবং পায়েস। মায়ের সম্মুখে একটি ছাগ-শিশুকে

বলিদান দেওয়া হইত, তাহা রান্নাও হইত, সকলেকে তাহা দেওয়াও হইত কিন্তু তাহার আমিষত্বের প্রমাণ বড় একটা পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। দুই চারি টুকরা আলু, দুই চারিটা ছোলার দানা এবং একটু ঝোলই অধিকাংশের ভাগ্যে জুটিত। একবার বোধহয় একটুকরা মেটে পাইয়াছিলাম। নিরামিষ রান্নাগুলি কিন্তু অপর্যাপ্ত এবং অপূর্ব হইত। ওরূপ সুমিষ্ট নিরামিষ রান্না আজকাল বড় একটা হয় না। সন্তোষের মা নিজের হাতেই দুই তিনটা তরকারি রঁাধিতেন, রন্ধন-গৃহের প্রধান পরিচালিকাও তিনি ছিলেন। রন্ধন ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠিলে কর্তাব্যক্তিরা বলিতেন— আমরা কিছু জানি না, সোনোর মায়ের কাছে যাও। সোনো মানে সন্তোষ। ছেলেবেলায় পূজার সময় চার পাঁচদিন যেরূপ দীয়তাং ভুজ্যতাং দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি আজও মনে অক্ষয় হইয়া আছে। ইহার জন্য খুব যে বেশী একটা খরচ হইত তাহাও নয়। চাটুজ্যে-বাড়ির পাঁচ শরিক ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এবং দশমীর পূজা করিতেন। প্রত্যেক শরিকের উপর এক একদিনের পূজার ভার থাকিত। ভার খুব গুরুভার ছিলনা। পূর্বপুরুষেরা এজন্য প্রচুর জমি দিয়া গিয়াছিলেন। নগদ পয়সা খুব বেশী খরচ হইত না। ভোগের চাল ডাল তরি-তরকারি জমি হইতে আসিত, গোয়ালাদের নামে জমি দেওয়া ছিল তাহারা বিনামূল্যে পূজার সময় যত দুধ দই লাগিত তাহা সরবরাহ করিত। পঞ্চানন প্রতিমা গড়িত, বাজানদার বাজনা বাজাইত বিনামূল্যে, তাহাদেরও জমি দেওয়া ছিল পুরোহিতেরও জমি ছিল। দুলেরা বিনামূল্যে পূজার বলির জন্য ছাগ-শিশু সরবরাহ করিত, পূজার কয়দিন ফাইফরমাস খাটিত, শম্ভু ময়রা ভিয়ান বসাইয়া মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিত। সকলকেই জমি দেওয়া ছিল, কেহই পারিশ্রমিক চাহিত না, চাহিবার উপায় ছিল না, কারণ চার-পাঁচদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহের পরিশ্রমের জন্য কেহ দুই বিঘা, কেহ পাঁচ বিঘা জমির উপস্বত্ব ভোগ করিত।

প্রতি শরিক পূজা-বাবদ দশ-পনর টাকা খরচ করিতে পারিলেই মহা-সমারোহে মায়ের পূজা সম্পন্ন হইয়া যাইত। যে সব শরিকের অবস্থা ভালো তাঁহারা বাহির হইতে যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি আনাইতেন। চাটুজ্যেদের প্রকাণ্ড অতিথিশালা ছিল, যাত্রার দল বা কীর্তনীয়ারা সেখানেই থাকিত। মনে আছে কলিকাতা হইতে একবার একজন যাদুকর আসিয়াছিলেন, খুব একটা মজা হইয়াছিল সেবার। তিনি কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন। নিষ্ঠাবান পুরোহিত মহাশয়ের চাদরের ভিতর হইতে মুরগীর ডিম বাহির করিয়া তিনি তুমুল হাসির তুফান তুলিয়া ফেলিলেন। পুরোহিত রাধু ভট্চাজ কিন্তু ব্যাপারটাকে নিছক প্রমোদ হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, চটিয়া গেলেন। এত চটিয়া গেলেন যে মুক্তকচ্ছ হইয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলেন। যাদুকর অবশেষে তাঁহার পায়ে ধরিয়া অনেক কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করেন!

আমার মনে এই ধরনের বহু স্মৃতি সঞ্চিত হইয়া আছে। সব স্পষ্টভাবে মনে নাই, যতটুকু আছে তাহারও যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করি একটা প্রকাণ্ড গ্রন্থ হইয়া যাইবে। তবে এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিবার পূর্বে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

প্রথম ঘটনাটি খেতুমামাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটিয়াছিল। খেতু-মামা আমার মামার জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। মামার জমি পুকুর বাগান মামা তাঁহারই তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন। খেতু-মামা পরের বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে বড় ভালবাসিতেন। পরের উপর প্রভুত্ব করিবার প্রবৃত্তি সব মানুষেরই অল্প-বিস্তর থাকে, পরের বিষয় তত্ত্বাবধান করিবার সুযোগে খেতুমামা এই প্রবৃত্তিটি চরিতার্থ করিতেন, খুব আন্তরিকতার সহিত হাঁক-ডাক করিয়াই করিতেন। শুধু মামার নয়, বিদেশবাসী আরও অনেকের বিষয় তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিত। বঙ্কু মামা, মামার আর এক জ্ঞাতি-

ভ্রাতা কলিকাতায় ব্যাঙ্কে কাজ করিতেন। তাঁহার বিষয়-আশয়েরও ভার ছিল খেতুমামার উপর। গ্রামের আরও অনেকের বিষয়ের দেখা-শোনাও করিতেন তিনি। তাঁহার নিজের জমিজমা খুব বেশী ছিল না, কিন্তু পরের বিষয়ের খবরদারি করিতেন বলিয়া গ্রামে তাঁহার প্রতাপ খুব ছিল! তিনি এমন-ভাবে কথাবার্তা বলিতেন যেন তিনিই গ্রামের রক্ষক। তাঁহাকে প্রায়ই বলিতে শোনা যাইত—"এই খেতু চাটুজ্যে আছে বলেই পুকুরে মাছ, গাছে ফল-পাকড়, জমিতে ধান দেখতে পাচ্ছ। বাবুরা তো যে যার বউ নিয়ে শহরে গিয়ে মজা ওড়াচ্ছেন, আমি না থাকলে পাঁচ ভূতে লুটে পুটে খেত সব। ঘরের চালে খড় পর্যন্ত থাকত না। ওই যে বিনোদ চৌধুরী, নামেই গ্রামের জমিদার তিনি, কলিকাতা, মাদ্রাজ, মাতুরা, রামেশ্বর, কাশী, কাশ্মীর করে' বেড়াচ্ছেন, তাঁর জমিদারি চালাচ্ছে কে—এই খেতু চাটুজ্যে। ওই বৈকুণ্ঠ নামেই ম্যানেজার, কিন্তু আসলে আস্ত একটি জরদ্গব, ওর উপর নির্ভর করলে কি বিনোদ চৌধুরীর জমিদারি থাকত? থাকত না। জমিদারি আছে তার কারণ হালটি ধরে' বসে' আছে এই খেতু চাটুজ্যে!" খেতু-মামাকে প্রায়ই সদরে যাইতে হইত মকোর্দমার তদ্বির করিবার জন্য। নিজের মকোর্দমা নয়, পরের মকোর্দমা। একদিন কিন্তু একটা চাঞ্চল্যজনক ঘটনা ঘটিল। গ্রামের জমিদার বিনোদ চৌধুরীর সহিত খেতুমামার আন্তরিক সম্পর্ক কতটা ছিল তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু আইনত কোন সম্পর্ক যে ছিল না তাহা আদালতে প্রমাণিত হইয়া গেল।

ঘটনাটা এই। ঘোষাল পাড়ার বখাটে ছেলে বিশ্বেশ্বর খেতুমামার দৃষ্টি এড়াইয়া সকলের বাগান হইতে ফল এবং সকলের পুকুর হইতে মাছ নিয়মিতভাবে চুরি করিত। এ বিষয়ে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিল সে। একদিন কিন্তু ধর্মের কল বাতাসে নড়িয়া উঠিল, খেতুমামা তাহাকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিলেন। দিবা-দ্বিপ্রহরে সে বিনোদ চৌধুরীদের বাগানে ঢুকিয়া ডাব

পাড়িতেছিল। খেতুমামা বাগানের পাশ দিয়া যাইতেছিলেন—বাজার করিতে যাইতেছিলেন—হঠাৎ তাঁহার নজরে পড়িল নারিকেল গাছে কেহ চড়িয়াছে। মাথার পাগড়ি এবং গায়ের ফতুয়া দেখিয়া মনে হয় কমল পাশি। সেই সাধারণত সকলের ডাব পাড়িয়া দেয়। কিন্তু সে তো তাঁহার নিকট অনুমতি লয় নাই। বিনা অনুমতিতে সে ডাব পাড়ে কেন।

খেতুমামা হাঁক দিলেন—"ডাব পাড়ে কে—"

"আমি কমল"

"কার হুকুমে ডাব পাড়ছ"

"কমলবাবুর হুকুমে"

খেতুমামা একথা শুনিয়া একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু হটিবার পাত্র নন তিনি। বাগানে ঢুকিয়া নারিকেল গাছের নীচে উর্ধ্বমুখ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্বেশ্বর ঘোষাল বিপদে পড়িল। সে কমল পাশির পাগড়ি এবং ফতুয়া পরিয়াই ডাব চুরি করিতে আসিয়াছিল, এই কৌশলে সে ইতিপূর্বে বহুবার ডাব পাড়িয়াছে কমল পাশির সহিত তাহার ষড় ছিল। খেতুমামা যে এমনভাবে নারিকেল গাছের নীচে দাঁড়াইয়া থাকিবেন তাহা সে কল্পনা করে নাই। গাছের উপর সে যতটা পারিল দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু খেতুমামা অনড়। অবশেষে নামিতে হইল তাহাকে। খেতুমামা দুর্মুখ ছিলেন। বিশুকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ওরে শালা তুই। কমল পাশি সেজে এসেছিস। তোর বাপও পাশি না কি"

বিশুর মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিতে লাগিল, সে কিন্তু কিছু বলিল না।

খেতুমামা মুখ ভ্যাংচাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "নারকোল গাছে উঠেছিলি কেন—অ্যাঁ—"

"আমার খুশী"

"তোমার খুশী ?"

খেতুমামা তাহার গালে প্রচণ্ড এক চড় বসাইয়া দিলেন।

এইবার বিশুর মুখ ছুটিল।

"আপনি মারবার কে। আপনার বাপের গাছ ?"

এইবার খেতুমামার অদৃশ্য পুচ্ছটিতে পা পড়িল। তিনি ক্ষেপিয়া গেলেন। তাঁহার হাতে একটি বেঁটে লাঠি সর্বদা থাকিত, সেইটি তিনি সজোরে বিশুর মাথায় বসাইয়া দিলেন। মাথা ফাটিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেল।...

খানিকক্ষণ পরে ফুল-মামী (খেতুমামার স্ত্রী) কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের বাড়িতে আসিয়া সংবাদ দিলেন, খেতু মামাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

"উনুন ধরিয়ে বসে আছি, বাজার করে' আনবেন তবে রান্না করব, একি কাণ্ড মা—"

খেতু মামা জামিনে খালাস পাইলেন না। মকোর্দমা হইল। আদালতে চৌধুরীদের ম্যানেজার বৈকুণ্ঠ তরফদার হলপ করিয়া বলিয়া আসিলেন যে তিনি বিশু ঘোষালকে ডাব পাড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন। বিনোদ চৌধুরী স্বয়ং সাক্ষী দিয়া বলিয়া গেলেন যে তিনি খেতুমামাকে তাঁহার বাগানের বা বিষয়ের রক্ষক নিযুক্ত করেন নাই। খেতুমামার দুইমাস জেল হইয়া গেল। বিনোদ চৌধুরী ব্যক্তিগতভাবে ইহাতে খুব দুঃখিত হইয়াছিলেন। পরিষদ মহলে নাকি বলিয়াছিলেন—সম্ভব হইলে তিনি খেতুমামার পক্ষ অবলম্বন করিতেন, কিন্তু তাহা সম্ভব ছিল না। ঘোষাল পরিবারের বিশু ছেলেটা বখাটে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিশুর দাদা একজন রায় বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আজ না হয় খুলনায় আছে কাল যদি এখানে আসে ? কুম্ভীরের সহিত ঝগড়া করিয়া জলে বাস করা যায় না। এই কারণে অতবড় একজন গভর্নমেণ্ট অফিসারের কোপদৃষ্টিতে পড়িতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

খেতুমামার জেল হওয়াতে শুধু ফুলমামী নয়, আমরাও অসহায় হইয়া পড়িলাম। খেতুমামা সত্যই গ্রামের রক্ষক ছিলেন। তাঁহার অবর্তমানে গ্রামে চোর-ছ্যাঁচড়ের উপদ্রব বাড়িতে লাগিল। দিদিমা ফুলমামীকে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় দিলেন। তিনি তিন পুত্র ও দুই কন্যা লইয়া আমাদের বাড়িতেই আহার এবং শয়ন করিতে লাগিলেন। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে ডাকাইয়া অনুরোধ করিলেন—"খেতুর জেল হওয়াতে আমরা সবাই সশঙ্কিত হয়ে পড়েছি। তুমি বাবা রাত্তিরে এখানে এসে শুয়ো। যদি অসুবিধে না হয় এখানেই রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়াও কোরো—"।

গোলক পণ্ডিত যেন কৃতার্থ হইয়া গেলেন। হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিলেন, "শোব, নিশ্চয়ই শোব। খাওয়ার হাঙ্গামা আর করবেন না। আমি খেয়ে-দেয়েই আসব, নিশ্চয় আসব"

দিদিমা বললেন "খাওয়ার আর হাঙ্গামা কি। আমাদের এত লোকের রান্না তো হবেই—"

গোলক পণ্ডিত কুণ্ঠিত মুখে বলিলেন, "না, না, সে থাক। ঠানদি আবার কি মনে করবেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে শোব এসে এখানে"

গোলক পণ্ডিত চলিয়া গেলেন।

ফুলমামী দিদিমার পাশে এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন। পণ্ডিতমহাশয় চলিয়া যাইবার পর অসঙ্কোচে মন্তব্য করিলেন, "মাগী পণ্ডিতকে গুণ করেছে। হরিদাস বলছিল মাগী সন্ধ্যের পর যখন রান্নাবান্না করে তখন পণ্ডিত না কি রান্নাঘরের বারান্দায় বসে ভাগবত শোনায় ওকে। না রে হরিদাস?"

হরিদাস খেতুমামার বড় ছেলে। বয়স বারো তেরো। সে উঠানে বসিয়া ধনুক করিবার জন্য বাঁখারি চাঁছিতেছিল। সে আরও নূতন খবর দিল। বলিল, "পণ্ডিত মশায় ঠানদির উনুন ধরিয়ে দেয়, কুয়া থেকে জল তুলে দেয়। একদিন দেখলাম মশলাও বাটছে"

ফুলমামী নাক কুঁচকাইয়া বলিলেন, "মরণ আর কি! কালে কালে কতই যে দেখব!"

ফুলমামীর রাগের কারণ ছিল। গোলক পণ্ডিত হরিদাসকে নিজের পাঠশালায় পড়াইতে রাজি হন নাই। তিনি তিন চারিটি ছাত্রকে বিনা বেতনে পড়াইতেন এবং সেগুলিকে নিজে নির্বাচন করিয়া লইতেন। . হরিদাসকে তিনি নির্বাচন করেন নাই।

দিদিমা ফুলমামীর সহিত একমত হইলেন না।

বলিলেন, "গোলক যা-ই করুক, লোকটি অতি সজ্জন। তা না হলে ওকে রাত্রে এখানে শুতে ডাকতাম না"

ফুলমামী ইহার উত্তরে নীরব থাকাই সমীচীন মনে করিলেন। গোলক পণ্ডিতের শুইতে আসিবার দৃশ্যটা আমার এখনও মনে আছে। তিনি আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া বহুবার গলা-খাঁকারি দিতেন। রাস্তার মোড় হইতেই তাঁহার গলা-খাঁকারি শোনা যাইত। শুধু গলা-খাঁকারি নয়, মাঝে মাঝে—"এই—এইও" বলিয়া হুঙ্কারও ছাড়িতেন। সম্ভবত তাঁহার মনে হইত কাছে-পিঠে চোর বা ডাকাত নিশ্চয়ই লুকাইয়া আছে, তাঁহার সাড়া পাইলেই তাহারা ভয়ে পলায়ন করিবে। সুতরাং সাড়া দিতে তিনি কার্পণ্য করিতেন না। আর একটা কাজও তিনি সঙ্গে সঙ্গে করিতেন। তাঁহার লিক্‌লিকে সরু একটি বেত ছিল। পাঠশালা করিবার সময় প্রয়োজনীয় আসবাব হিসাবে সম্ভবত তিনি সেটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠশালার কোনও ছাত্রের অঙ্গে তাহা তিনি কোনদিন ব্যবহার করিতে পারেন নাই। সেই বেতটিকে এই ব্যাপারে তিনি কাজে লাগাইয়াছিলেন। পথ চলিতে চলিতে বেতটিকে দক্ষিণ হস্তে দৃঢ়মুষ্টিতে উঁচাইয়া ধরিয়া "এই—এইও" শব্দ করিতে করিতে তিনি বেতটিকে ঘন-ঘন নাড়িতে নাড়িতেই পথ চলিতেন। মনে হইত যেন সেটি কোন অদৃশ্য শত্রুর সম্মুখে আস্ফালন করিতেছে। তাঁহার বাম হস্তে থাকিত ছোট একটি লণ্ঠন। আমাদের

বাড়িতে ভাণ্ডার ঘরের সংলগ্ন ছোট যে কুঠুরিটি ছিল তাহাতেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছিল। তিনি গলা-খাঁকারি দিয়া বেত্র আস্ফালন করিতে করিতেই আমাদের উঠানে প্রবেশ করিতেন। তাঁহার জন্য বারান্দায় এক ঘটি জল আগে হইতেই রাখা থাকিত। তিনি লণ্ঠনটি বারান্দায় রাখিয়া কোটের পকেট হইতে কাগজে-মোড়া একজোড়া খড়ম বাহির করিতেন। মায়ের আদেশে আমি তাঁহার পায়ে জল ঢালিয়া দিতাম। পা দুইটি ভাল করিয়া ধুইয়া মুছিয়া তিনি খড়ম পড়িতেন। তাহার পর মায়ের দিকে চাহিয়া বলিতেন—"মা লক্ষ্মী, এবার তোমরা শুয়ে পড় সব। আমি রইলাম কোন ভয় নেই।" তাহার পর কোটটি খুলিয়া আলনায় রাখিতেন এবং বিছানায় বসিয়া চক্ষু বুজিয়া মৃদুকণ্ঠে দীর্ঘ একটি সংস্কৃত স্তোত্র আবৃত্তি করিতেন। তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রণাম করিতেন। কাহাকে প্রণাম করিতেন জানি না। তাঁহার এই প্রণত অবস্থার ছবিটিই আমার মনে আঁকা আছে। তাঁহাকে শায়িত অবস্থায় কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তিনি যখন প্রণাম করিতেন মা তখনই আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতেন, তাই তাঁহার শোয়াটা দেখিতে পাইতাম না। খুব ভোরে উঠিয়াই তিনি নিজের দোকানে চলিয়া যাইতেন। আমরা যখন তাঁহার নিকট পড়িতে যাইতাম—দেখিতাম তিনি স্নান করিয়াছেন, দোকানে ধূপধুনা জ্বলিতেছে, দুই চারিটি খরিদ্দার আসিয়াছে। আমাদের কার্যক্রমও শুরু হইয়া যাইত।

…খেতুমামার জেল হওয়াতে দিদিমা পুত্রের নিকট যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ছিরুকে প্রায়ই বলিতেন—দেখতো, কেনারাম বাড়িতে এসেছে কিনা, থাকলে ডেকে আনিস। কেনারাম সরকার ছিলেন দিদিমার বাপের বাড়ির লোক, তাঁহার সহিত হয়তো আত্মীয়তাও ছিল, ঠিক জানি না। কেনারামের বোনের শ্বশুরবাড়ি শঙ্করায়। কেনারাম ভগ্নীপতির কাছেই থাকিতেন, চাকুরি করিতেন

পাশের গ্রামের জমিদারি সেরেস্তায়। দিদিমার চিঠি লিখাইবার দরকার হইলে কেনারামের ডাক পড়িত। দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়াতে দিদিমা নিজে চিঠি লিখিতে পারিতেন না। আমার মা-ও নিরক্ষরা ছিলেন না। কিন্তু মাকে দিয়া দিদিমা চিঠি লেখানো পছন্দ করিতেন না। বলিতেন, ও বড্ড তড়বড় করে' লেখে। চিঠি একটু গুছিয়ে লিখতে হয়। তাঁহার ধারণা ছিল, কেনারাম বেশ গুছাইয়া বাগাইয়া চিঠি লিখিতে পারে। তাহার হাতের লেখাটিও ভালো। কেনারামকে কিন্তু প্রায়ই বাড়িতে পাওয়া যাইত না। কারণ তাহাকে প্রায়ই তাহার ভগ্নীপতির ফরমাসে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। আমাদের চাষী ছিরুর অন্তত তাহাই মত। যাই হোক ছিরু একদিন কেনারামকে ধরিয়া আনিল, দিদিমা তাহাকে দিয়া মামাকে চিঠিও লিখাইলেন। চিঠির মর্ম ক্ষেত্রনাথের জেল হওয়াতে তাঁহারা বড়ই বিচলিত এবং ভীত হইয়াছেন, গ্রামে দুষ্টলোকের উপদ্রবও বাড়িয়াছে, সুতরাং তাহারা এখন সাহেবগঞ্জেই যাইতে চান। ধানের বিলি-ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে, এখন এখানে থাকিবার বিশেষ প্রয়োজনও নাই। দুই সপ্তাহ পরে মামার উত্তর আসিল। তিনি মাতৃভক্ত লোক ছিলেন, উত্তরে জানাইলেন যত শীঘ্র সম্ভব তিনি সকলকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। পত্র পাইয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন; কিন্তু হাতে দুই তিনটি শক্ত রোগী থাকায় আসিতে পারিলেন না। আরও মাসখানেক কাটিল, কিন্তু মামা আসিলেন না। তখন দিদিমা স্থির করিলেন গ্রামের কাহাকেও সঙ্গে লইয়া তিনি নিজেই সাহেবগঞ্জে চলিয়া যাইবেন। কিন্তু তাহাও খুব সহজসাধ্য হইল না। দিদিমা গোলক পণ্ডিতকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন—ট্রেনে বেশীক্ষণ থাকিলে তাঁহার মাথা ঘোরে, 'বমনেচ্ছাও' হয়। এই কথাটিই তিনি বলিয়াছিলেন আমার বেশ মনে আছে। বলিলেন এই কারণেই তিনি নিজের দেশেও যাইতে পারেন না, ঈশ্বরেচ্ছায় দেশে যাইবার

তাঁহার প্রয়োজনও হয় না। একথা শুনিবার পর দিদিমা আর কিছু বলিতে পারিলেন না। তিনি তখন পটলকর্তাকে একটি পত্র লিখাইলেন যে তিনি যখন ছুটির সময় বাড়ি আসিবেন তখন ফিরিবার পথে তাঁহাদের যেন সাহেবগঞ্জে রাখিয়া যান। পটলকর্তা সম্মতি জানাইয়া উত্তরও দিলেন, কিন্তু লিখিলেন যে দুই মাসের পুর্বে তাঁহার ছুটি পাইবার সম্ভবনা নাই। ততদিন যদি দিদিমারা শঙ্করায় থাকেন ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহাদের সাহেবগঞ্জে পৌছাইয়া দিবেন। কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন হইল না। একদিন অভাবিত উপায়ে সমাধান হইয়া গেল। অতিশয় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল একটি।

…একদিন সকালে দুইটি কালো বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ পুরুষ আমাদের বাড়ির উঠানে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, আরক্তিম আয়ত নয়ম, তৈলহীন অবিন্যস্ত কুঞ্চিত কেশদাম, গলায় জবাফুলের মালা, কপালের মাঝখানে রক্তচন্দনের তিলক, প্রশান্ত ক্ষৌরীকৃত মুখমণ্ডল, ধুলিধুসরিত নগ্নপদ, একহাতে প্রকাণ্ড একটি সেতার, অন্য হাতে একটি পুঁটুলি। আমি নেবুতলার আড়াল হইতে নির্বাক দৃষ্টিতে দেখিতেছিলাম। বাবাকে সেই আমি প্রথম দেখিলাম। দিদিমা বারান্দায় বসিয়াছিলেন, বাবা তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। দিদিমার দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়াছিল, তিনিও বাবাকে চিনিতে পারেন নাই।

"কে বাবা তুমি—"

"আমি কেদার"

"কেদার! এ সময়ে কোথা থেকে এলে বাবা"

"আমি এখান থেকে দশ ক্রোশ দূরে মৃণালপুর গ্রামে একটা গানের আসরে এসেছিলাম। সেখান থেকেই এখানে এলাম। আপনাদের বাড়িটা দেখে যাবার ইচ্ছে ছিল, আপনারা যে এখানে আছেন তা জানতাম না"

"বেশ করেছ বাবা, বেশ করেছ। আমাদের যে কিভাবে দিন কাটছে" দিদিমার গলা কাঁপিয়া গেল, তিনি চোখে আঁচল দিলেন।

বাবার সঙ্গে যে লোক দুইটি আসিয়াছিল বাবা তাহাদের নিকট গিয়া বলিলেন, "এইবার তোমরা যেতে পার। আমি ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এই নাও—"

বাবা মেরজাইয়ের পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহাদের দিতে গেলেন। তাহারা কিন্তু কিছুতেই টাকা লইতে চাহিল না। উভয়েই হাত-জোড় করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনার কাছ থেকে একটি কানা-কড়ি আমরা নিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমাদের পুলিসে দিয়ে দিন—"। বাবাও দেখিলাম না-ছোড়, তাহাদের কিছু দিবেনই। অনেক বলা-কহার পর তাহারা অবশেষে একটি করিয়া টাকা লইয়া বাবাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দিদিমা চোখে কম দেখিতেন বলিয়াই বোধহয় কানে বেশী শুনিতেন। উঠানের একপ্রান্তে লোক দুইটির সহিত বাবার যে বাদানুবাদ চলিতেছিল তাহা তিনি শুনিতে পাইয়াছিলেন।

"কার সঙ্গে কথা কইছিলে, পুলিসের কথা বলছিল কেন, কে ওরা"

বাবা সংক্ষেপে বলিলেন, "ডাকাত—"

"ডাকাত! বল কি!"

বাবা যাহা বলিলেন তাহা রোমাঞ্চকর।

"কাল বিকেলের দিকে মৃণালপুর থেকে বেরিয়েছিলাম। মঙ্গল গাঁয়ে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। ক্ষিধে পেয়েছিল, একটা ময়রার দোকানে ঢুকে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম করে' তাকে জিগ্যেস করলাম—শঙ্করা যেতে হলে কোন রাস্তা সোজা হবে। সে বললে—মানুষ-লোটন মাঠটা পার হয়ে দবিরগঞ্জ, সেখান থেকে আশনা, আশনা থেকে শঙ্করা দুক্রোশের মধ্যেই। কিন্তু মানুষ-লোটন মাঠে

ঠ্যাঙাড়ের ভয় আছে, রাত্রে ও-মাঠ পেরুনো ঠিক হবে না ঠাকুর। তার চেয়ে রাত্রে এইখানেই শুয়ে থাকুন, ভোর-বেলা বেরিয়ে যাবেন। আমি দেখলাম রাত্রের মধ্যেই যদি আশনা পৌঁছে যেতে পারি তাহলে সকালে এখানে পৌঁছে যাব। আরও ভাবলাম, সন্ধ্যাবেলায় ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় আরামে হাঁটতেও পারব। মায়ের নাম করে' বেরিয়েই পড়লাম। বিপদটি কিন্তু ঘটল। মানুষ-লোটন মাঠের মাঝামাঝি যখন এসেছি গুটি চারেক কালো কালো মূর্তি অন্ধকারের ভিতর থেকে বেরিয়ে ঘিরে দাঁড়াল আমাকে। একজন বললে—এই চল্ আমাদের সঙ্গে। জিগ্যেস করলাম কে তোমরা। বললে, আমরা মায়ের অনুচর, বলির পশু সন্ধান করতে বেরিয়েছি, তোকেই বলি দেব, চল। বললাম, তোমাদের মা কোথায় আছেন। দূরে খানিকটা অন্ধকার জমাট হয়ে ছিল সেই দিকে দেখিয়ে বললে—ওই গাছতলায়। বুঝলাম, আপত্তি করলে এইখানেই মেরে ফেলবে। গেলাম তাদের সঙ্গে। গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড এক বটগাছের তলায় প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হয়ে রয়েছে। গোটা দুই লণ্ঠনও রয়েছে। দেখলাম প্রত্যেকটি লোকের দুষমণের মতো চেহারা, গাঁট্টা গোঁট্টা, কালো মুশ্‌কো, মাথায় বাবরি চুল, প্রত্যেকের হাতে বেঁটে মোটা লাঠি একটি করে'। আর গাছের ডালে সত্যিই দেখি মা কালীর পট টাঙানো রয়েছে একটি। পটটি ঘিরে জবাফুলের মালা দুলছে। আমি বুঝলাম আজ আর নিস্তার নেই—"

দিদিমা রুদ্ধশ্বাসে শুনিতেছিলেন।

"তারপর—?"

"মৃত্যুর জন্যেই তৈরি হলাম। তাদের বললাম, আমার একটি অনুরোধ আছে কেবল, মরবার আগে প্রাণভরে মায়ের নাম গান করতে দাও আমাকে। আমি ছেলেবেলা থেকে মায়ের নামই গান করেছি, শেষ সময়েও তাই করতে চাই। আশা করি আমার এ

অনুরোধটি তোমরা রাখবে। একথা শুনে তারা নিজেদের মধ্যে গুজগুজ ফুসফুস করে' পরামর্শ করলে খানিকক্ষণ। তার পর বললে—বেশ, আমাদের আপত্তি নেই। হোক মায়ের নাম একখানা। আমি ঠিক কালীর পটটির নীচে গিয়ে বসলাম। তারপর সেতারটি বেঁধে ধরলাম একখানা শ্যামাসঙ্গীত দরবারি কানাড়ায়। ডাকাতের দল চুপচাপ বসে' শুনতে লাগল। খানিকক্ষণ পরেই কিন্তু আর এক কাণ্ড হল। প্রকাণ্ড গাছ, অনেক পাখী ছিল তাতে। তারাও সব একযোগে সঙ্গত করতে লাগল আমার সঙ্গে। সেই অন্ধকার মহাশূন্য সুরে সুরে ভরে' উঠল যেন হঠাৎ। অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হ'ল একটা। কিছুক্ষণ পরে আমি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লাম, তারপর ঠিক যে কি ঘটেছিল তা আমি জানি না, আমার গান যখন শেষ হল তখন চোখ খুলে দেখি সেই পঞ্চাশ জন ডাকাত হাত জোড় করে' আমার সামনে বসে' আছে। আর মা কালীর পটে যে জবাফুলের মালাটা ছিল সেটা আমার গলায় রয়েছে। আমি যখন তন্ময় হয়ে গান গাইছিলাম তখন মালাটি আপনি নাকি ওপর থেকে আমার গলায় এসে পড়েছে। কখন পড়েছে, কি করে' পড়েছে তা আমি বুঝতে পারি নি। ডাকাতদের বললাম, আমার গান শেষ হয়েছে, মায়ের কাছে যাবার জন্যে আমি প্রস্তুত হয়েছি, এবার তোমরা তোমাদের কাজ কর। তারা বলতে লাগল, আপনাকে আমরা চিনতে পারি নি ঠাকুর, আমাদের মাপ করুন। আমরা ভক্ত নই, আমরা ডাকাত, ঠ্যাঙাড়ে। পেটের দায়ে এই মহাপাপ করি। কিন্তু আসল ভক্তকে আমরা চিনতে পারি। আপনার গায়ে আমরা হাত দিতে পারব না। স্বয়ং মা যখন আপনাকে অভয় দিয়ে আপনার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন, তখন আমরা কি আর কিছু করতে পারি? আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। কারণ কিছুদূর গিয়ে আমাদের আর একটা ঘাঁটি আছে, তারা হয়তো আপনাকে

আটকাতে পারে। ওরাই আমাকে সঙ্গে করে' পৌঁছে দিয়ে গেল—। সবই মায়ের ইচ্ছে—"

বাবা উঠানে দাঁড়াইয়াই কথা বলিতেছিলেন। যাহা বলিতে-ছিলেন তাহা এতই চমকপ্রদ যে তাঁহাকে দিদিমা বসিতে পর্যন্ত বলেন নাই। এইবার তাঁহার হুঁশ হইল।

মা কালীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া তিনি বলিলেন "—সবই মা মঙ্গলচণ্ডীর দয়া, তিনিই রক্ষে করেছেন। তুমি বাবা উঠে এস, এখানে ব'স। হাত পা মুখ ধোও। ও বারাহী, কোথা গেলি তুই, কেদার এসেছে, জল নিয়ে আয়, পা ধুইয়ে দে, পেন্নাম কর—"

আমি লেবু গাছের আড়াল হইতেই সব শুনিতেছিলাম ও দেখিতেছিলাম। মাকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম। তিনি রান্নাঘর হইতে একগলা ঘোমটা টানিয়া বাহির হইলেন। মাকে এত বড় ঘোমটা দিতে আগে কখনও দেখি নাই, এই প্রথম দেখিলাম। যদিও একটু অবান্তর হইবে তবু এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করিতেছি। মা খুব ভালো অভিনয় করিতে পারিতেন। একবার লুকাইয়া মায়ের অভিনয় আমি দেখিয়াছিলাম। দুপুর-বেলা সইমার বাড়িতে পাড়ার মেয়েদের আড্ডা জমিত। একদিন সন্তোষ ছুটিয়া আসিয়া চুপি চুপি আমাকে বলিল, মায়েরা থিয়েটার করছে, দেখবি তো আয়। গিয়া দেখিলাম সইমার শুইবার ঘরে খিল-লাগানো। কিন্তু কপাটে ছিদ্রে চোখ লাগাইয়া দেখিলাম, মা চমৎকার একখানি শাড়ি পরিয়া গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। সইমা-ও আর একটি চমৎকার শাড়ি পরিয়া মায়ের মুখের সামনে হাত নাড়িয়া নাড়িয়া পদ্যে কি বলিতেছেন। সইমার বলা শেষ হইলে মা শাড়ির আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সইমার মুখের দিকে কাতর-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—তাহার পর তিনিও কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা দেখিব বলিয়া প্রত্যাশা

করি নাই। উত্তেজিত হইয়া আমি মা-কে ডাকিতে যাইতেছিলাম কিন্তু সন্তোষ আমাকে মাথা নাড়িয়া নিষেধ করিল এবং চোখের ইঙ্গিতে বাহিরে যাইতে বলিল। পা টিপিয়া টিপিয়া বাহিরে গেলাম। সন্তোষ বলিল, 'তোর মা সীতা সেজেছে, আমার মা সরমা। কাইকে বলিস না যেন। জানাজানি হয়ে গেলে মা ভয়ানক রাগ করবে'। মায়ের একগলা ঘোমটা দেখিয়া সেদিনকার কথা মনে পড়িল। মনে হইল মা সেদিন যেমন সীতা সাজিয়াছিলেন আজ বোধ হয় তেমনি কনে' বউ সাজিয়াছেন। বাবা বারান্দায় তাঁহার ধুলিধূসরিত পা তুইটি ঝুলাইয়া বসিয়া রহিলেন। মা প্রথমে গিয়া প্রণাম করিলেন, তাহার পর ঘটি ঘটি জল ঢালিয়া তাঁহার পা তুইটি ধুইয়া দিলেন, তাহার পর একটি টুকটুকে লাল গামছা দিয়া পা তুইটি মুছাইয়া দিলেন। বাবা নির্বিকারভাবে বসিয়া রহিলেন, যেন কোন মহারাজা তাঁহার প্রাপ্য সেবা গ্রহণ করিতেছেন।

আমি আশ্চর্য হইয়া ভাবিতেছিলাম এই আগন্তুক কে! তখনও তাঁহাকে আমি বাবা বলিয়া চিনিতে পারি নাই। চেনা সম্ভব ছিল না। আমার জন্মের পূর্বেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, এত দিন পরে ফিরিলেন।

দিদিমার তখন আমার কথা মনে পড়িল।

বলিলেন, "সূয্যি গেল কোথা। ডাক তাকে। বাবাকে পেন্নাম করুক এসে" মায়ের পা-ধোয়ানো শেষ হইয়াছিল, তিনি নীরবে আবার ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। সেই সময় ছিরু কি একটা কাজে বাড়ির ভিতর আসিল। দিদিমা তাহাকেই বলিলেন, "ছিরু দেখ তো সূয্যি কোথা গেল। ডেকে নিয়ে আয় তাকে। তার বাবা এসেছে"

"ও, এই আমাদের জামাইবাবু না কি"

ছিরু বাবাকে প্রণাম করিল। তাহার পর বলিল, "সূয্যি ওই যে নেবুতলার পিছন থেকে উঁকি মারছে। এদিকে আয়—"

আমার কিন্তু অত্যন্ত লজ্জা করতে লাগিল। আমি একছুটে বাইরে চলিয়া গেলাম।

"দেখছ, ছেলের কাণ্ড"

ছিরু আমার পিছু পিছু আসিয়া আমাকে বাহির হইতে ধরিয়া আনিল। বাবাকে আমি সেই প্রথম প্রণাম করিলাম। বাবা কোন কথা বলিলেন না, কেবল আমার মাথার উপর খানিকক্ষণ হাত রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর মেরজাইয়ের ভিতর হইতে একটি থলি বাহির করিয়া দিদিমার হাতে দিলেন। নীরবেই দিলেন। কোনও কথা বলিলেন না। শুনিয়াছি তাহাতে না কি একশত টাকা ছিল। মায়ের জন্য তিনি একখানি লাল পাড় শাড়ি, দিদিমার জন্য একজোড়া থান এবং আমার জন্য একটি ছিলেট দোলাইও আনিয়াছিলেন। সমস্ত বাড়িটা সহসা যেন ভরিয়া উঠিল।

বাড়ির বাহিরের দিকে একটা বৈঠকখানা ছিল। বাবা সেই-খানেই আস্তানা গাড়িলেন। ছিরু চৌকির উপর শতরঞ্জি পাতিয়া বিছানা করিয়া দিল। আমি বাবার পুঁটুলি বহন করিয়া লইয়া গেলাম।

বাবা পুঁটুলি খুলিয়া নিজের কাপড় গামছা বাহির করিলেন এবং বাকি কাপড়গুলি গুছাইতে লাগিলেন। আমি কাজেই ঘুর ঘুর করিতেছিলাম। বাবা আমাকে লক্ষ্য করিয়াও যেন লক্ষ্য করিতেছিলেন না। ইহাতে মনে মনে আমার অভিমান হইতেছিল কিন্তু ইহাও বুঝিতেছিলাম যে যদিও বাবা কোন কথা বলিতেছেন না—কিন্তু তিনি আমার সম্বন্ধে উদাসীন নন, আমাদের উভয়ের মধ্যে যেন একটা নিঃশব্দ আলাপ চলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাবা বলিলেন, "কোথায় চান করিস তোরা"

"আমাদের পুকুরে। বাড়ির পিছনেই—"

"আমি এবার চান করব। তেল নিয়ে আয়"

ছুটিয়া গিয়া বাড়ির ভিতর হইতে সরিষার তৈল লইয়া আসিলাম। বাবা অনেকক্ষণ ধরিয়া সর্বাঙ্গে তৈল মর্দন করিলেন। কানের গর্তে দিলেন, নস্যের মতো নাকেও খানিকটা টানিয়া লইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়িল। সে জল মুছিয়া তিনি দুই চোখেও এক ফোঁটা করিয়া তৈল দিলেন। প্রচুর অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি ইতিপূর্বে এমন করিয়া তেল মাখিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। অবাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। সেই সময়ই লক্ষ্য করছিলাম বাবার গায়ের রং কত ফরসা, বুকের মাঝখানটায় কে যেন সিঁদুর লেপিয়া দিয়াছে! বাবাকে সঙ্গে করিয়া পুকুরে লইয়া গেলাম এবং তিনি যতক্ষণ স্নান করিলেন ততক্ষণ তাঁহার কাপড়টি লইয়া পাড়ে বসিয়া রহিলাম। বাবা খানিকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন, স্নান করিতে করিতে নানারকম স্তোত্র-আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাহার পর সূর্য প্রণাম করিলেন। এ সবের পরও স্নানান্তে অনেকক্ষণ ধরিয়া পূজা করিলেন তিনি। তাহার পর আহারান্তে ঘুমাইলেন খানিকক্ষণ। বাবার সেদিনককার কার্যকলাপ আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘুমাইয়া উঠিয়া তিনি দিদিমাকে যাহা বলিলেন তাহা কেহ প্রত্যাশা করে নাই।

বলিলেন, "আগামী অমাবস্যায় আমি কালীপূজা করব। গ্রামে কি কেউ প্রতিমা গড়ে' দিতে পারবে?"

"হ্যাঁ, আমাদের পঞ্চানন আছে, তাকে খবর দিলেই আসবে। অমাবস্যা কবে?"

"এখনও দিন দশেক দেরি আছে"

"তার মধ্যে প্রতিমা হয়ে যাবে। সূয্যি, যা পঞ্চাননকে নিয়ে আয়"

সোৎসাহে ছুটিয়া চলিয়া গেলাম। পঞ্চানন বাড়িতেই ছিল তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিলাম, সে প্রতিমা গড়ার ভার হইল। সেই পঞ্চানন যে পটলকর্তার জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গড়িয়াছিল।

সেইদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আর একটি জিনিসও লক্ষ্য করিয়াছিলাম, মনে পড়িতেছে। সইমা আসিয়া সেদিন মায়ের চুল বাঁধতে বসিলেন এবং মায়ের আপত্তি-সত্ত্বেও তাঁহার খোঁপায় একটি বেলফুলের মালা জড়াইয়া দিলেন। দুই ভ্রূর মাঝখানে পরাইয়া দিলেন ছোট্ট একটি কাঁচ-পোকার টিপ। মায়ের কোনও আপত্তি তিনি শুনিতে চাহিলেন না। তাঁহার জেদে মাকে একখানি খড়কে-ডুরে শাড়িও পরিতে হইল। নিজ হস্তে মায়ের পা ঝামা দিয়া ঘসিয়া তিনি আলতা পরাইয়া দিলেন। মায়ের মধ্যে যে এত রূপ লুকানো ছিল তাহা জানিতাম না, তাঁহাকে এরকম সাজসজ্জা করিতেও ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। মা অধিকাংশ দিনই চুল বাঁধিতেন না, একটা আড়ময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন। দিনরাত সংসারের নানাকাজে ব্যস্ত থাকিতেন—বাসন মাজিতেন, ঘুটে দিতেন, ঘর নিকাইতেন, এমন কি দুধ পর্যন্ত দুহিতেন—তাই তাঁহার হাত বা পায়ের যে একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে তাহা কখনও নজরে পড়িত না। সেদিন সহসা যেন আবিষ্কার করিলাম মা আমার কত সুন্দর। সইমা সন্ধ্যার সময় আনিয়া পালঙ্কের উপর ফরসা চাদর বিছাইয়া ভাল করিয়া বিছানাও করিয়া দিয়া গেলেন। আমাকে বলিলেন, "তুই আজ আমার কাছে গিয়ে শুবি সন্তোষের সঙ্গে। ভাল গল্প বলব আজ।" আমি একটু বিস্মিত হইলাম। সইমার কাছে সন্ধ্যার পর গিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু রাত্রে শুইয়াছি আসিয়া মায়ের কাছে। সেদিন তাই প্রস্তাবটা একটু নূতন ধরনের ঠেকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়ের কাছে কে শোবে তাহলে।" সইমা হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "তোর বাবা এসেছেন যে। তিনি এখানে শোবেন। এই ছোট খাটে তিনজনের কুলায় কখনও। আমাদের খাটটা খুব বড় তো, তুই আমি সন্তোষ তিনজনে বেশ কুলিয়ে যাবে।"

বাবার কিন্তু বৈঠকখানা হইতে নড়িবার কোন লক্ষণ দেখা

গেল না। তিনি সন্ধ্যার পর সেতার লইয়া বসিলেন এবং আলাপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা তাঁহাকে ঘিরিয়া রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল। আমিও তাহাদের মধ্যে ছিলাম। সময় যে কোথা দিয়া বহিয়া যাইতেছিল জানি না, রাত যে কত হইয়াছে সে খেয়ালও ছিল না, ঘুমও পাইতেছিল না, তন্ময় হইয়া বসিয়া-ছিলাম। বোধহয় বাহ্যজ্ঞানও ছিল না। সহসা সইমার কণ্ঠস্বরে যেন জাগিয়া উঠিলাম। দেখিলাম সইমা দ্বার-প্রান্তে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার চোখ মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে।

"ওগো, ওস্তাদ সাহেব, রান্না-বান্না যে সব হয়ে গেছে জুড়িয়ে যাচ্ছে, হুকুম করেন তো খাওয়ার ব্যবস্থা করি। খেয়ে দেয়ে আর এক পালা গাইতে হবে তো"

বাবা সেতারটি নামাইয়া রাখিলেন! তাহার পর হাসিমুখে উত্তর দিলেন "আমি পালাবার পালাটাই শিখেছি কেবল, অন্য পালা জানি না"

সইমা কথায় হটিবার পাত্রী নন। মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "শিখতে দোষ কি। সব শিখিয়ে দেব। এখন অনুমতি দিন, ভাত বাড়ব ?"

"বাড়ুন"

পালা-ঘটিত কথা-বার্তা তখন বুঝি নাই, কথটা কিন্তু মনে আছে।

আহারাদির ব্যবস্থা সইমাই করিয়াছিলেন। পুকুরে জাল ফেলিয়া মাছ ধরানো হইয়াছিল। সেই মাছের ভাজা, ঝোল, অম্বল সইমা স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে বাবা রান্নার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সইমাও বাবার খাওয়ার বহর দেখিয়া খুব খুশী হইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "এতদিনে একটা জামাইয়ের মতো জামাই এসেছে পাড়ায়। রান্না করা সার্থক হ'ল!"

আহারাদির পর বাবা দিদিমার সঙ্গে গল্প করতে লাগিলেন। আমি সইমার বাড়িতে চলিয়া গেলাম। সইমা গল্প শুরু করিলেন। সেদিনই প্রথম নলদময়ন্তীর গল্প শুনিলাম। মানুষের নাম যে নল হইতে পারে ইহা শুনিয়া বড় মজা লাগিয়াছিল। দময়ন্তী নামটাও কম অদ্ভুত লাগে নাই। গল্প শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা প্রকাণ্ড রাজহংস আসিয়া আমাকে বলিতেছে 'তোমাদের বাইরের ঘরে নল এসেছেন, তোমাকে ডাকছেন'। ঘুম ভাঙিয়া গেল। উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বসিলাম। পাশে দেখিলাম সন্তোষ নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে। সইমা নাই। আমি বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলাম, তাহার পর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। উঠানে নামিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল প্রকাণ্ড একটা নক্ষত্র নারিকেল গাছটার মাথার উপর জ্বলিতেছে। অন্ধকার রাত্রি চতুর্দিক নিস্তব্ধ। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম, তাহার পর সদর দরজার দিকে ধীরে ধীরে আগাইয়া গেলাম। স্বপ্ন সত্য হইবে এ বিশ্বাস অবশ্য ছিল না, কিন্তু মনে হইতেছিল যে কিছু একটা নিশ্চয় দেখিতে পাইব। বাহিরের বৈঠকখানার ঘরটা আমাকে অদ্ভুতভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন আম গাছের তলা দিয়া, ধানের মরাই এবং খড়ের গাদার পাশ দিয়া সদর দরজায় উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম দরজা খোলা। সইমার বাড়ি হইতে আমাদের বাড়ি খুব বেশী দূর নয়, তবু খানিকটা যাইতে হয়। অন্য সময় হয়তো অত রাত্রে ওইটুকু পথও একা যাইতে পারিতাম না, কিন্তু সেদিন সোজা চলিয়া গেলাম। গিয়া দেখিলাম বৈঠকখানার দরজা খোলা। লণ্ঠন জ্বলিতেছে, দেওয়ালে একটি ছোট কালীর পট ঠেসানো রহিয়াছে, বাবা সেই দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার পাশে একটি বোতল রহিয়াছে। আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবা যে সেদিন কি করিতেছিলেন তাহা বুঝিবার মতো

বয়স আমার নয়, কিন্তু এটা বুঝিয়াছিলাম তিনি যাহা করিতেছেন তাহা অসাধারণ কাজ। সাধারণ লোকে এসব কাজ করে না। আমি প্রস্তরমূর্তিবৎ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলাম। অদ্ভুত একটা শ্রদ্ধায় সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে আবার ফিরিয়া আসিলাম। আমার এ নৈশ অভিযানের কথা কেহ জানে না, কাহাকেও বলি নাই। বৈঠকখানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি সইমার বাড়িতে গেলাম না, নিজের বাড়িতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম সইমা আর মা বারান্দায় বসিয়া আছেন। মনে হইল মা যেন কাঁদিতেছেন, আর সইমা তাঁহাকে প্রবোধ দিতেছেন। আমি উঠানের একধারে অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিলাম, আমাকে তাঁহারা দেখিতে পান নাই। আমি নিজেই সোজা তাঁহাদের কাছে চলিয়া গেলাম।

সইমা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলের কাণ্ড দেখ। উঠে এলি কেন রে—"

"ঘুম ভেঙে গেল"

"খিদে পায় নি তো, সন্ধ্যেবেলা খেলি না তো ভাল করে'। পায়েস খাবি একটু ?"

"না"

"তাহলে শুবি চল"

সইমার সহিত আবার চলিয়া গেলাম। মা একা নতমুখে বারান্দায় বসিয়া রহিলেন। মায়ের এই ছবিটি আজও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা আছে, বরাবর থাকিবে। শয়ন ঘরের দ্বার খোলা, প্রদীপের মৃদু আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই আলো-আঁধারিতে মা নতমুখে বসিয়া আছেন। খোঁপায় বেলফুলের মালা জড়ানো, পরনে খড়কে-ডুরে শাড়ি। রাত্রি গভীর হইয়াছে, বাবা আসেন নাই। তিনি বাহিরের ঘরে আর এক দেবতার পূজায় তন্ময় হইয়া আছেন। ইহার করুণ গম্ভীর মাধুর্য তখন ভালো

করিয়া বুঝি নাই, কিন্তু এটুকু বুঝিয়াছিলাম মা দুঃখ পাইয়াছেন। দুঃখটা কেন এবং কিসের তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু আমার সমস্ত হৃদয়টা সেদিন বিষাদে ভরিয়া গিয়াছিল। সই-মার সহিত যাইতে যাইতে প্রশ্ন করিলাম, "বাবা এখনও শুতে আসে নি কেন সইমা"

"পূজো করছেন"

"এত রাত্রে কিসের পূজো"

"কালীপূজা"

উঠান পার হইয়া শুনিতে পাইলাম বাবা গান ধরিয়াছেন, "বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা—"। সইমা আর আমি জাম-তলার অন্ধকারে দাঁড়াইয়া পড়িলাম। বাবা কিন্তু দুই এক কলি গাহিয়াই থামিয়া গেলেন। তাহার পর দেখিলাম তিনি লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া আসিতেছেন। বৈঠকখানার বারান্দা হইতে নামিয়া পূর্বাকাশের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাহার পর বাড়ির ভিতরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমরা দুইজন জামতলার অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিলাম, আমাদের তিনি দেখিতে পাইলেন না।

পরদিন প্রভাত হইতেই বাবার আসর বেশ জমকাইয়া উঠিল।

গ্রামে যাঁহারা সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন বাবার খবর পইয়া তাঁহারা আসিলেন। খোল, করতাল, ডুগি-তবলা, মৃদঙ্গ, তানপুরা, এস্রাজ প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র আসিয়া জুটিল। কণ্ঠ-সঙ্গীতে আমাদের পাড়া প্লাবিত হইতে লাগিল। স্নানাহারের সময় ছাড়া আমরা পাড়ার ছেলেরা বৈঠকখানার উঠানে ও বারান্দায় ভীড় করিতে লাগিলাম। অন্য পাড়ার ছেলে মেয়েরাও দল বাঁধিয়া আসিতে লাগিল। দুই চারিদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামেও সংবাদ ছড়াইয়া

পড়িল, তথাকার সঙ্গীতজ্ঞগুণীরাও ক্রমশ আসিয়া আমাদের বৈঠকখানায় সমবেত হইতে লাগিলেন। বাবার আগমনে গ্রামান্তরেও বেশ একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সঙ্গীতশাস্ত্রে বাবার পাণ্ডিত্য দেখিয়া, তাঁহার গাহিবার বাজাইবার অসাধারণ পরিচয় পাইয়া কত লোক যে তাঁহাকে শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি সঙ্গীতের কিছুই বুঝিতাম না, কিন্তু আমার বুক যেন দশ হাত ফুলিয়া গেল, মস্তক আকাশ স্পর্শ করিল। মায়ের মুখেও দেখিলাম হাসি ফুটিয়াছে, দিদিমার চোখে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছে। সইমা বাবাকে খাওয়াইবার জন্য নিত্য নূতন রান্নার উপকরণ সংগ্রহে লাগিয়া গেলেন। অন্যান্য বাড়ির রন্ধন-পারদর্শিনীরাও এ বিষয়ে সচেতন হইলেন। অনেক বাড়ি হইতে তরকারি মিষ্টান্ন আসিতে লাগিল। বাবার আগমনে সমস্ত গ্রামে একটা উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। পঞ্চাননও নিজের প্রতিশ্রুতি অনুসারে নির্দিষ্ট দিবসে চমৎকার একটি কালী প্রতিমা আনিয়া হাজির করিল। বাবা নিজ ব্যয়ে উঠানে একটি ছোট আটচালা প্রস্তুত করাইলেন, তাহার মধ্যে একটি মাটির বেদী নির্মিত হইল, সেই বেদীর উপর প্রতিমাটি রাখা হইল। গ্রামে বাবার বহু ভক্ত জুটিয়া গিয়াছিল, তাহারাই স্বেচ্ছায় সোৎসাহে পূজার সর্ববিধ আয়োজনে মাতিয়া উঠিল। এমন কি, লক্ষণ-যুক্ত কালো পাঁঠা এবং হাড়কাঠও সংগৃহীত হইয়া গেল। বাবা বলিলেন, তিনি নিজেই পূজা করিবেন। সন্ধ্যা হইতে কালীপ্রতিমার সম্মুখে বসিয়া বাবা একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। তাঁহার মুদ্রিত চক্ষু ছাপাইয়া অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরিতে লাগিল। আমরা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। অনুষ্ঠানিক পূজা হইয়াছিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে, আমি তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। পরদিন প্রভাতে বাবা স্বহস্তে মহাপ্রসাদ রাঁধিলেন। জীবনে সেই বোধহয় প্রথম আমি ভাল করিয়া মাংস আহার করিলাম। বাবা

চমৎকার মাংস রাঁধিতেন, পরে অনেকবার তাঁহার হাতের রান্নাই খাইয়াছি কিন্তু সেদিনকার সেই মহা-প্রসাদের স্বাদ আমার মুখে এখনও যেন লাগিয়া আছে।

কালীপূজার দিন দুই পরে বাবা দিদিমাকে বলিলেন,

"এখানে অনেকদিন কেটে গেল, এবার যদি অনুমতি দেন যাই"

"কোথা যাবে, দেশে?"

"না। নলহাটিতে যেতে হবে একবার। সেখানে আমার এক বন্ধু আছে, তার কাছে যাব"

"তাহলে তুমি এক কাজ কর না বাবা। সাহেবগঞ্জে শক্তির কাছে আমাদের পৌঁছে দিয়ে যাও। সেখানে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করছে অনেকদিন থেকে, কিন্তু সঙ্গীর অভাবে যেতে পারছি না—"

বাবা সম্মত হইলেন। একটা শুভদিন দেখিয়া আমরা সকলে সাহেবগঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। আমার বাল্যজীবনের আর একটা অধ্যায় শুরু হইল।

"একবার শোন—"

কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিয়া দেখিল উর্মিলা তাহাকে ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেল।

"কি—"

"পেচ্ছাপ করে' বাবা বিছানাটা ভিজিয়ে ফেলেছেন। তুমি কোমরটা তুলে ধর, আমি চাদরটা বদলে দি"

চাদর বদলাইয়া কুমার বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। শুনিতে পাইল বাবা আর্তকণ্ঠে বলিতেছেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"। তাহার মনে হইল নিজের অসহায় অবস্থায় বাবা কিছুতেই নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারিতেছেন না। যিনি

প্রকাণ্ড দুর্দান্ত ঘোড়ার পিঠে অনায়াসে চড়িয়া বেড়াইতেন, যাঁহার ভয়ে প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণও প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করিতে সাহস করিতেন না, তিনি আজ নিতান্ত অসহায়। কোমর হইতে কাপড় সরিয়া গেলে সেটা ঠিক করিয়া লইতে পারেন না।

"কুমারবাবু আছেন ?"

বাহিরের দরজায় ডাক শুনিয়া কুমার বাহির হইয়া গেল। দেখিল নবাগত পোস্টমাস্টার বাবুটি দাঁড়াইয়া আছেন।

"নমস্কার। আসুন, কি খবর"

"ডাক্তারবাবু কেমন আছেন এখন"

"একটু ভাল বলেই বোধ হচ্ছে"

ইহার পরই পোস্টমাস্টারবাবু যাহা বলিলেন তাহাতে কুমার বুঝিল—বাবার খবর লইবার জন্য তিনি আসেন নাই।

"আমি একটু মুশকিলে পড়ে' গেছি কুমারবাবু। গঙ্গার বাড়ি থেকে আমার ছোট ছেলের জন্য দুধ নিতাম রোজ! গঙ্গা খবর পাঠিয়েছে সে আর দুধ দিতে পারবে না। কারু গোয়ালা, কর্পূরা গোয়ালা কেউ দিতে পারল না। অথচ দুধ না পেলে আমার ছোট ছেলেটা—"

"কতটা দুধ চাই আপানার"

"আধসেরটাক হ'লেই হ'য়ে যাবে"

"বেশ আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি"

একটা চাকর বাড়ির ভিতর হইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল কুমার তাহাকে ডাকিয়া বলিয়া দিল, "পোস্টমাস্টারবাবুর জন্যে এক ঘটি দুধ পাঠিয়ে দে।"

চাকরটা ভিতরে চলিয়া গেল।

"আমি একটা পাত্র নিয়ে আসব কি"

"আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি যান। যে টেলিগ্রামটা পাঠিয়েছি দেখবেন সেটা যেন একটু তাড়াতাড়ি যায়"

"সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি আমি"

পোস্টমাস্টারবাবু মিথ্যাভাষণ করিলেন। তখনও সে টেলিগ্রামটি পোস্টাফিসে পড়িয়াছিল এ খবর গঙ্গা একটু পরেই লইয়া আসিল।

গঙ্গা আসিতেই কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "তুই পোস্টমাস্টারবাবুর দুধ পাঠাস নি কেন আজ"

গঙ্গা একটু ঝাঁজের সহিত উত্তর দিল, "ওকে আমি আর দুধ দেব না। গোয়ালাটোলার কোন গোয়ালাও দেবে না, আমি মানা করে' এসেছি সকলকে। একের নম্বর পাজি লোকটা। প্রায় দু'ঘণ্টা আগে টেলিগ্রামটা দিয়ে এসেছি, এখনও পাঠায় নি"

"জানিস না, বাজে কথা বলিস কেন। পোস্টামাস্টারবাবু এখনি এসেছিলেন, বললেন টেলিগ্রাম চলে' গেছে"

"মিথ্যুক লোকটা। ঝক্সু বললে টেলিগ্রাম যায় নি"

ঝক্সু পোস্টাফিসের পিওন। সকাল হইতেই পোস্টাফিসে থাকে, কারণ পোস্টমাস্টারবাবুর বাড়ির কাজও তাহাকে করিতে হয়। সুতরাং সে যখন খবরটা দিয়াছে তখন তাহা বাজে খবর নয়। কুমার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া গঙ্গার মুখের দিকে চাহিল। সংবাদটা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। এরকম করিবার মানে কি? কিন্তু সহসা আত্মসংবরণ করিয়া ফেলিল সে।

বলিল, "ও ছোটলোক বলে' কি আমাদেরও ছোটলোক হ'তে হবে?"

গঙ্গা কোনও উত্তর না দিয়া গজগজ করিতে করিতে ভিতরে চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই আবার ফিরিয়া আসিয়া এক তাড়া নোট কুমারের হাতে দিয়া বলিল, "আড়াই শ' টাকা লাছুরামের কাছ থেকে নিয়ে এলাম। টাকাটা ভাল করে' রেখে দাও। একটু পরেই সে মাল নিতে আসবে। চাকরগুলো কোথা—"

"মাঠে গেছে। আসবে এখুনি"

"টাকাগুলো টেবিলের উপর রাখছ কেন। দাও, আমাকে দাও বৌমাকে দিয়ে আসি"

নোটের তাড়াটা তুলিয়া লইয়া আবার সে ভিতরে চলিয়া গেল।

কুমারও তাহার পিছু পিছু যাইতেছিল কিন্তু ঘাড় ফিরাইতেই চোখে পড়িয়া গেল স্থানীয় স্কুলের হেডমাস্টার রামচরিত্র তেওয়ারি মহাশয় আসিতেছেন। চোখোচোখি হইতেই নমস্কার করিয়া তিনি তাঁহার গতি-বেগ বাড়াইয়া দিলেন এবং কাছে আসিয়া বলিলেন, "পিতাজি আজ কৈসে হ্যঁায়"

"পহলে সে কুছ আচ্ছা"

"খুশী কি বাত হ্যয়"

মাস্টার মহাশয় বারান্দার চৌকিটিতে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং সবিনয়ে জানাইলেন যে স্কুলের 'বালকসমিতি'কে তিনি বলিয়া দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন করিয়া এখানে আসিয়া 'ডিউটি' দিবে। সমিতির যে বাইসিকেলটি আছে সেটিও এখানে সর্বদা থাকিবে, কারণ 'বখত্‌পর' কখন যে কি দরকার হয় বলা তো যায় না, সর্বদা প্রস্তুত থাকাই ভাল। কুমার তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেই তিনি বলিলেন, ধন্যবাদ তিনি লইবেন না। কর্তব্য করার জন্য আবার ধন্যবাদ কেন। কুমার বলিতে পারিত যে 'বালক-সমিতি'র সাহায্যের এখন প্রয়োজন নাই, বাড়িতে লোক যথেষ্ট আছে, কিন্তু তাহা বলিল না। বলিলে তেওয়ারিজি অসন্তুষ্ট হইবেন, মনে করিবেন কুমারবাবু তাঁহাকে পর মনে করিতেছেন। সুতরাং সে চুপ করিয়া রহিল। তেওয়ারিজি বেশীক্ষণ বসিলেন না, একটু পরেই তাঁহার স্কুল। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেই তিনি আবার আসিবেন। হঠাৎ পিছন দিক হইতে ল্যাংল্যাং ও ছুঁচকি ঘাড় কামড়া-কামড়ি করিতে করিতে হাজির হইল। পরস্পর খেলা করিতেছে, সাধুভাষায় যাহাকে বলে বপ্রক্রীড়া

কুমার ধমক দিল—"এই ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কি হচ্ছে"

ল্যাংল্যাংয়ের চক্ষু তুইটি যেন হাসিতে লাগিল। সে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে কুমারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, মুখে হ্যা হ্যা শব্দ, জিভ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছুঁচকির বয়স কম, ধমক খাইয়া সে একটু ভয় পাইল এবং মুখ তুলিয়া কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল, ভাবটা—সত্যিই রাগ করলে নাকি। ল্যাংল্যাং অত ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে না গিয়া একেবারে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল, ছুঁচকিও সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিল তাহার। কুমার ছুঁচকির পেটের উপর একটা পা তুলিয়া দিয়া মৃত্যু মৃত্যু চাপ দিতে দিতে বলিল, "শজারুর মাংস খেয়ে খুব ফূর্তি হয়েছে দেখছি—"

ছুঁচকি ঘাড় বাঁকাইয়া কুমারের পায়ে আস্তে আস্তে কামড় দিতে দিতে ঘন ঘন ল্যাজ নাড়িতেছিল, এমন সময় রাধানাথ গোপ দর্শন দিলেন।

"সিভিল সার্জনের কাছে কে যাচ্ছে"

"নবীন যাবে। সে খেতে গেছে। ট্রেন তো দেড়টায়"

"হ্যাঁ। তাকে এই চিঠিখানা দিও। ম্যাজিস্ট্রেটের আপিসে কিম্বা বাড়িতে যেন পৌঁছে দেয়"

"আজকাল ম্যাজিস্ট্রেট কে"

"আমাদের জামাই। যুগলের আপন ভগ্নীপতি"

যুগলকিশোর রাধানাথের খুড়তুতো ভাই।

কুমার চিঠিখানি লইয়া বলিল, "আচ্ছা, দিয়ে দেব। আপনি এবার স্নান-টান করুন। রান্না হ'য়ে এল—"

রাধানাথ গোপ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।

"আমার জন্যে রান্না করিয়েছ নাকি। আমি কিছু চিঁড়ে বেঁধে এনেছিলাম। ভাবছিলাম রামদহিনের দোকান থেকে দই আনিয়ে—"

"না, না, সে হবে না। আমি আপনার জন্যে অন্য ঘরে আলাদা করে' রামভুজকে দিয়ে রান্না করাচ্ছি। মাছ মাংসের সঙ্গে কোন ছোঁয়াছুঁই থাকবে না—"

রাধানাথ গোপ এ সংবাদে মনে মনে খুশী হইলেন। কিন্তু মুখে ভর্ৎসনার সুরে বলিলেন—"এ কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ তুমি অসুখের বাড়িতে—"

কুমার চুপ করিয়া রহিল।

বিরুবাবু সাহেবগঞ্জে আসিয়া পৌঁছিলেন সন্ধ্যার পর। তিনি যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাহাই ঘটিয়াছিল, সকরিগলিঘাটের ট্রেনটি ধরিতে পারেন নাই। সুতরাং স্টেশনের ওয়েটিং রুমেই সমবেত হইয়াছিলেন তাঁহারা।

কৃষ্ণকান্ত স্টেশন-প্ল্যাটফর্মটি বার দুই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন, তাঁহার পর আসিয়া ওয়েটিং রুমে ইজিচেয়ারটাতে অঙ্গ বিস্তারিত করিয়া দিলেন। বিরু আশা করিতেছিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কৃষ্ণকান্ত হয়তো কোনও মন্তব্য করিবে। কৃষ্ণকান্ত কিন্তু কিছুই করিলেন না, ইজিচেয়ারের হাতলের উপর পদদ্বয় তুলিয়া দিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া রহিলেন।

"এখন কি করা যায় বল তো কেষ্ট"

কৃষ্ণকান্তের চক্ষু দুইটি সঙ্গে সঙ্গে খুলিয়া গেল।

"গরম গরম জিলিপি ভাজছে বাইরে দেখে এলাম। বলেন তো তাই কিছু কিনে আনি"

পুরসুন্দরী ঘোমটার আড়ালে একটু হাসিলেন। কিরণের চোখের দৃষ্টিও হাস্যোজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বিরু বলিলেন, "জিলিপি খেতে চাও খাও। লুচি ডিম খেয়ে পেট ভরে নি বুঝি"

"পেট ভরেছে। কিন্তু খাওয়া কি সব সময়ে পেট ভরাবার জন্যেই? গরম গরম জিলিপি খাওয়ার একটা আনন্দ আছে"

"বেশ, কিনে আন কিছু। আমি কিন্তু খাব না, বাজারের খাবার সহ্যই হয় না আমার। কিন্তু আমি খাওয়ার কথা ভাবছি না, অন্য কথা ভাবছি। বাবার কাছে পৌঁছবার জন্যে মনটা ছটফট করছে"

এক খিলি পান ও দোক্তা মুখে দিয়ে কিরণ বলিল, "আমারও। কাল সকালে কখন গাড়ি"

"শুনছি ছ'টার সময়। বাড়ি পৌঁছতে বারোটা একটা বেজে যাবে। ভাবছি—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া বিরু থামিয়া গেলেন। যাহা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল তাহা ব্যক্ত করিবেন কিনা সহসা ঠিক করিতে পারিলেন না। উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কিরণ আর একটু দোক্তা মুখ-বিবরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "দাদা আর থির থাকতে পাচ্ছে না। হাজার হোক বড় ছেলে তো, আর কত আদরের যে ছেলে—"

কিরণের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল। দাদা ছেলেবেলায় বাবা-মার কত আদরের যে ছিল তাহারই নানা প্রসঙ্গ তাহার মনে জাগিতে লাগিল। কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া হঠাৎ খাপছাড়া ভাবে সে বলিল, "আমাদের ছেলেবেলায় বন্দেমাতরম্ টুপি বলে' একরকম টুপি উঠেছিল ছোট ছেলেদের। পাগড়ির মতো দেখতে, রঙীন সিল্কের। দাদা স্টেশনমাস্টারের ছেলের মাথায় সেই টুপি দেখে এসে ঝোঁক ধরলে পূজোর সময় আমারও ওই টুপি চাই। কাটিহারে পূর্ণিয়ায় কোথাও পাওয়া গেল না। বাবা শেষে কোলকাতা থেকে আনিয়ে দিলেন টুপি ওকে"

পার্বতী ঘরের একধারে বসিয়া তরকারী কুটিতেছিল।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আপু-পটল তো কুটলাম। শাকগুলা শুকিয়ে গেছে। চারটি মটর ডাল ভিজিয়ে দেব? গরম গরম বড়া ভেজে নিলেই হবে"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "অত হাঙ্গামা করবার দরকার কি মা এখন"

পার্বতী ঝাঁজিয়া জবাব দিল—"এখানে কাজই বা কি আছে এখন। সমস্ত রাত তো বসে' থাকতে হবে শুনছি। তুমি চাবি দাও আমি বড়া করব"

পার্বতীর কণ্ঠস্বরে একটা জেদের সুর ফুটিয়া উঠিল।

পুরসুন্দরী উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটটিতে চাপ দিলেন একটু। কোন কথা বলিলেন না।

"দাও চাবিটা"

কি যে জ্বালায় মেয়েটা। পুরসুন্দরী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া দিলেন।

পার্বতী কেরোসিন কাঠের বড় বাক্সটি খুলিয়া প্রথমে শিল নোড়া বাহির করিল, তাহার পর খানিকটা মটর ডাল বাহির করিয়া সেগুলি একটা বাটিতে ভিজাইতে দিল। মুকুন্দ বাহিরে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বড়া-ভাজার সরঞ্জাম দেখিয়া বলিল, "ফাস্টক্লাস ওয়েটিং রুমে উনুন জ্বালতে দেবে না। বেকার এসব বার করছ"

"তোকে ফপর দালালি করতে হবে না, চুপ কর। এখানে না দেয়, আমি মুসাফিরখানায় যাব, যেখানে পকৌড়ি ভাজছে"

পুরসুন্দরী পার্বতীর দিকে চাহিয়া পুনরায় উপরের ঠোঁট দিয়া নীচের ঠোঁটে চাপ দিলেন, কিছু বলিলেন না। পার্বতী ওয়েটিং রুম হইতে বাহির হইয়া মুসাফিরখানার দিকে গেল।

কিরণ বৌদির মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"পার্বতীটা তোমায় খুব জ্বালায় দেখছি"

"জ্বালায়, কিন্তু ও না থাকলে আমার সংসারও অচল। নিজে তো আর তেমন খাটতে পারি না। সংসারের ভার ওরই ওপর"

কিরণ ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলল—"ভারী তো সংসার, তুমি আর দাদা। ছেলে মেয়েরা তো সব বাইরে। সংসার ছিল বটে আগে। এক হাতে তুমিই সব সামলাতে। ওরই ফাঁকে বাঘবকরিও খেলে যেতে আমাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে। মনে আছে তোমার? তোমার বউ কেমন হয়েছে? তোমার মতো কাজের হয়েছে তো"

পুরসুন্দরী হাসিয়া বলিলেন—"এখনকার মেয়েরা অতটা পারবে না। চম্পা মেয়ে ভালো। শৌখীন কাজকর্ম অনেক জানে। লেখা পড়াতেও ভালো। কিন্তু ঘরের কাজ করতে চায় না। খুব বড়লোকের মেয়ে তো; বাপের বাড়িতে আদরে মানুষ হয়েছে। একটু বেশী খাটাখাটি করলেই বুক ধড়ফড় করে। কি করে' ও মেয়ে যে পেট থেকে ছেলে ফেলবে, সেই ভাবনাতেই অস্থির হয়ে আছি আমি। দিন রাত খালি বই নিয়ে বসে' থাকে"

কিরণ গগনের বিবাহের সময় আসিতে পারে নাই। তাই গগনের বউ চম্পার সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে নাই। পুরসুন্দরীর মুখে তাহার কথা শুনিয়া সে আরও কৌতূহলী হইল।

"ও, তাই বুঝি। কিন্তু পোয়াতি মেয়েদের অমন দিন রাত বসে' থাকা তো ভালো নয়। ডাক্তারেরা মানা করে। ঘণ্টু যখন আমার পেটে ছিল ডাক্তার ঘোষ আমাকে দিয়ে রোজ ঘর পোঁছাতেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য অপারেশন করতে হ'ল, আমার রাস্তাই ছোট ছিল তো। কিন্তু শরীর খুব ভালো ছিল আমার। চম্পার স্বাস্থ্য কেমন"

"বাইরে থেকে ভালোই তো মনে হয়। খুব মোটাও নয়! দোহারা চেহারা। কলেজে যখন পড়ত তখন না কি টেনিসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। কিন্তু সংসারের ধকল সহ্য করতে পারে না মোটে। দুই প্রাণীর জন্য গগনকে একটা ঠাকুর, দুটো চাকর, একটা ঝি রাখতে হয়েছে। এছাড়া মোটরের ড্রাইভার, আর ডিস্‌পেনসারির কম্পাউণ্ডার তো আছেই"

"গগন তোমাদের কিছু সাহায্য টাহায্য করে?"

"করবে কোত্থেকে। যত্র আয় তত্র ব্যয়। কত রোজকার করে তা-ও জানি না। তবে বাঁচে না কিছু। উনি বলেন, ওকে যে আমার টাকা দিতে হচ্ছে না এইটেই আমার লাভ"

"আর দিগন্ত?"

"সে প্রফেসারি করে। মাঝে মাঝে পাঠায় আমাকে কিছু। দাদাকেও নাকি কিছু কিছু দেয়। দাদা- অন্ত প্রাণ তো"

হঠাৎ 'ফু ফু ফু' করিয়া একটা শব্দ হইতে লাগিল। দেখা গেল নিদ্রিত কৃষ্ণকান্তের ঠোঁট তুইটি বায়ু সহযোগে উক্ত শব্দ করিতেছে।

কিরণ সে দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"অদ্ভুত মানুষ, যেমন অসুরের মতো খাটতে পারে, তেমনি আবার কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোতে পারে। বিছানার দরকার নেই। কাল ট্রেনে অসম্ভব ভীড় ছিল। আমি বসে' জেগে কাটালুম। উনি বসে বসেই খাসা ঘুমিয়ে নিলেন। আশ্চর্য ক্ষমতা"

কৃষ্ণকান্তের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল। তিনি যখন ঘুমাইতেছেন তখন তাঁহার সম্বন্ধে কোনও আলোচনা মৃদুতম কণ্ঠে হইলেও তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। তিনি কখনও ঘড়িতে এলার্ম দিয়া শোন না, যখন উঠিবেন মনে করেন তখনই উঠিতে পারেন।

তিনি একজন ফরেস্ট-অফিসার। সারাজীবনই প্রায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। অনেক শিকার করিয়াছেন, কিন্তু কখনও রাত্রি জাগরণ করেন নাই। বাঘ শিকার করিতে গিয়াও মাচায় শুইয়া ঘুমাইয়াছেন, বাঘ কাছাকাছি আসিবামাত্র তাঁহার ঘুম ভাঙিয়াছে, বাঘ রেন্‌জের মধ্যে আসিলে বাঘকে গুলি করিয়া আবার তিনি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ঘুম সম্বন্ধে যেমন, আহার সম্বন্ধেও তেমনি। প্রচুর খাইতে পারেন, খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই, যখন যাহা পান পেট ভরিয়া খাইয়া লন এবং অবলীলাক্রমে হজম করিয়া ফেলেন! আহার এবং নিদ্রার অসুবিধার জন্য সাধারণত লোকে যে সব কষ্ট ভোগ করে কৃষ্ণকান্তকে তাহা ভোগ করিতে হয় না। তিনি সুখী পুরুষ। কিরণের সহিত তাঁহার সম্পর্কটাও একটু অদ্ভুত গোছের। বড় ছোট একঘর ছেলেমেয়েরাই সাধারণত সংসারে

জটিলতা সৃষ্টি করে। সে জটিলতা দাম্পত্যজীবনকে কখনও বিষময়, কখনও মধুময় করিয়া তাহাকে বৈচিত্র্য দান করে। ইহাদের জীবনে এসব ঘটে নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই ঘণ্টু ওরফে ঘনশ্যাম জন্মগ্রহণ করে। স্বাভাবিক প্রসব হয় নাই। সিজারিয়ান করিয়া ঘণ্টুকে বাহির করিতে হইয়াছিল, সেই সময় ডাক্তারেরা কিরণের টিউব দুইটিও কাটিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে ভবিষ্যতে আর সন্তান না হয়। ঘণ্টুর বয়স যখন আট কি নয় বৎসর তখনই কৃষ্ণকান্ত তাহাকে একটি সাহেবি স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়াছিলেন। সে ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ি আসিত বটে কিন্তু বৎসরের অধিকাংশ সময়ই থাকিত বোর্ডিংয়ে। সুতরাং কৃষ্ণকান্ত-কিরণের সংসারে সন্তানের ঝামেলা ছিল না। কিরণ প্রথমে কিছুদিন বাংলা নভেল-নাটক লইয়া কাটাইল, বহুরকম বাংলা সাময়িক পত্রিকার গ্রাহিকা হইল। বাড়িতে ঠাকুর-চাকর ছিল সংসারের কাজ করিতে হইত না। দিনকতক পরেই কিন্তু তাহার রুচির পরিবর্তন দেখা গেল। বই পড়ার নেশা ছুটিতে আরম্ভ করিল। কেবল বই পড়িয়া আর মন ভরে না। তখন মন দিল নানা রকম রান্নায়। ইংরেজি বাংলা পাক-প্রণালী কিনিয়া বহু রকম জ্যাম জেলি আচার চাটনি, বিদেশী নানা রকম অদ্ভুত রান্না করিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে এবং তাহার বন্ধুদের খাওয়াইতে লাগিল। ঘণ্টুর কাছেও মাঝে মাঝে খাবারের পার্শ্বেল যাইত। কৃষ্ণকান্ত আপিসের কাজ করিতেন, বন্দুক লইয়া জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিরণের কোন কাজে বাধা তো দিতেনই না, বরং এমন উৎসাহিত করিতেন যে কিরণের ধারণা হইত সে একটা অসাধারণ কিছু করিতেছে। তাহার হাতের প্রস্তুত যে কোনও ব্যঞ্জন যেমনই হউক এমন তারিফ করিয়া আহার করিতেন যে কিরণের মাঝে মাঝে এ সন্দেহও হইত যে কৃষ্ণকান্ত হয়তো অতিশয়োক্তি করিতেছেন। একদিন তাহাকে তিনি কলির দ্রৌপদীই বলিয়া বসিলেন। রান্না লইয়াও কিন্তু কিরণ বেশী দিন নিজেকে

ভুলাইয়া রাখিতে পারিল না। উল বোনায় মন দিল, মেমসাহেব রাখিয়া সেলাই শিখিল। তারপর ওস্তাদ রাখিয়া সেতারও শিখিল। কিন্তু ওই কিছুদিন মাত্র। অন্তরনিহিত এতটা ক্ষুধার তৃপ্তি যেন কিছুতেই হয় না। অবশেষে সে ক্ষুধা নিবারণের কিছু উপকরণ সে পাইল কৃষ্ণকান্তকেই অবলম্বন করিয়া। নিজের ছেলেকে মা যেমন শাসন করে কৃষ্ণকান্তকেও তেমনি শাসন করিতে আরম্ভ করিল সে। এটা কোরো না, এমন ঠাণ্ডায় বেরিয়ো না, অত খাওয়া ভাল নয়— এইরূপ নানা আদেশ সে কৃষ্ণকান্তের উপর জারি করিতে লাগিল। কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত হইলেন, মনে মনে একটু হাসিলেনও, কিন্তু আদেশ পালন করিতে দ্বিধা করিলেন না। ইহাতে কিরণের বড় সুখ হইল। ক্রমশ কৃষ্ণকান্তের সমস্ত জীবনটাই নিয়ন্ত্রিত করিতে আরম্ভ করিল সে, এমন কি আপিসের ব্যাপারও কি করা উচিত কি অনুচিত তাহাও সে ঠিক করিয়া দিতে চাহিল। কৃষ্ণকান্ত তখন তাহার নাম দিলেন বাড়ির বড়-সাহেব এবং তাহার সহিত বড় সাহেবের মতোই ব্যবহার করিতে লাগিলেন অর্থাৎ আপিসের বড়-সাহেবকে যেমন সুবিধা পাইলে ফাঁকি দিতে কসুর করিতেন না (এ বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা ছিল) তেমনি বাড়ির বড়-সাহেবকেও ফাঁকি দিতেন। মাঝে মাঝে ধরাও পড়িয়া যাইতেন, ধরা পড়িয়া আনত-নয়নে মুচকি মুচকি হাসিতেন। এইভাবে দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত একটা রস জমিয়া উঠিয়াছিল। আপাতত, এই সুরে তাহাদের দাম্পত্য-জীবন-বীণা বাঁধা।

নিজের সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্যটি কৃষ্ণকান্ত চোখ বুজিয়া শুনিলেন। কোন প্রতিবাদ করিলেন না। হয়তো চোখের পাতা দু'টি ঈষৎ কাঁপিয়াছিল, কিম্বা মুখভাবে হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিরণ ধরিয়া ফেলিল যে তিনি জাগিয়াছেন।

"মটকা মেরে পড়ে থাকবার দরকার কি। দেখ না, দাদা কোথা গেল। বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে দাদা, একটু গল্প সল্প ক'রে,

অন্যমনস্ক ক'রে রাখ তাকে। ট্রেন তো সেই সকালে, ওগো শুনছ—"

"অঁ্যা, আমাকে বলছ—"

কৃষ্ণ উঠিয়া বসিলেন এবং স্মিতমুখে কিরণের দিকে চাহিলেন।

"কি বলছ বল"

কিরণের হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে ছদ্ম কোপ চকচক করিয়া উঠিল।

"ঘুমের ভান করে' পড়ে থাকবার দরকার কি। গল্প-সল্প করে' দাদাকে একটু ভুলিয়ে রাখ না। তোমার ভাঁড়ারে তো অনেক বাঘ ভালুকের গল্প আছে"

"এখনকার বাঘ ভালুকের গল্প দু'চারটে আছে অবশ্য, কিন্তু দাদার সে সব ভালো লাগবে কি। সিউমেরিয়ান বা ব্যাবিলনের বাঘের গল্প তো আমার জানা নেই। দেখি, কোথা গেলেন—"

কৃষ্ণকান্ত উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ওয়েটিং রুমের মেঝেতে মুকুন্দ পূর্বেই বিছানাপত্র পাতিয়া ফেলিয়াছিল। পুরসুন্দরী শুইয়া পড়িলেন। কিরণকেও বলিলেন —"তুইও একটু গড়িয়ে নে। রাত্রের গাড়িতে যদি গগন আর দিগন্ত এসে পড়ে, তাহলে আর ঘুম হবে না কারও "

"এত সকাল সকাল ঘুমই আসবে না আমার। তুমি শোও" তাহার পর একটু থামিয়া বলিল, "গগন আর দিগন্তকে যে কতদিন দেখি নি"

পুরসুন্দরী কোন জবাব দিলেন না।

কিরণ নিজের স্যুটকেস হইতে একটি সচিত্র সিনেমা সাপ্তাহিক বাহির করিয়া তাহাতেই মন দিল। তাহার মুখ দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—সে যেন প্রত্যেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সহিত নীরবে আলাপ করিতেছে। কখনও ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইতে লাগিল, কখনও মুখে মৃদু হাসি ফুটিল, কমনও বা উল্টানো নীচের ঠোঁটটি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

পার্বতী ফিরিল একটু পরেই। পুরসুন্দরীর দিকে একবার চাহিয়া দেখিল, তাহার পর পা টিপিয়া রাঁধিবার কিছু সরঞ্জাম লইয়া আবার বাহিরে চলিয়া গেল। পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া পড়িয়াছিলেন, সব টেরও পাইতেছিলেন, কিন্তু পার্বতীকে বাধা দিলেন না, যা খুশী করুক। কিরণ ঘাড় ফিরাইয়া একবার দেখিল কিন্তু সে-ও কিছু বলিল না। উদীয়মানা অভিনেত্রী মন্দারমালা একটা বিশেষ সাবান মাখিয়া কি ভাবে গায়ের দুর্গন্ধ দূর করেন তাহারই বর্ণনা পড়িয়া মনে মনে সে নাসাকুঞ্চিত করিয়া বসিয়াছিল।

পুরসুন্দরী চোখ বুজিয়া একেবারে অন্য কথা ভাবিতেছিলেন। পার্বতী কেন যে এতরাত্রে এত অসুবিধার মধ্যেও মটর ডালের বড়া ভাজিতে চাহিতেছে, তাহার রহস্য আর কেহ না বুঝুক তিনি বুঝিয়াছিলেন। দিগন্ত মটর ডালের বড়া খাইতে খুব ভালবাসে। সে হয়তো রাত্রের ট্রেনে আসিয়া পড়িতে পারে, তাই পার্বতী এত কাণ্ড করিতেছে।

দিগন্তকে মেয়েটা দেবতার মতো ভক্তি করে। কি যে উহার মনে আছে ভগবানই জানেন। দুর্ভাগিনী মেয়েটা। দিগন্ত উহার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয় তাহাও মনে হয় না। না দিলেই ভালো। পুনরায় তাঁহার ললিতবাবুর মেয়ে নন্দার কথা মনে পড়িল। বেশ মেয়েটি। দিগন্তের সহিত বেশ মানাইবে। দিগন্ত আসিলে এবার ভালো করিয়া কথাটা পাড়িতে হইবে তাহার কাছে। কিন্তু বাবার যদি কিছু একটা হইয়া যায় তাহা হইলে তো আবার বাধা পড়িবে, এক বৎসর কালাশৌচ। মানুষের কিছুই হাত নাই। চক্ষু বুজিয়া পুরসুন্দরী নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন। চোখ দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল, কেন যে পড়িল তাহা তিনি নিজেও বুঝিলেন না। আজকাল কারণে অকারণে তাঁহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

"বউদি ঘুমিয়ে পড়লে না কি—"

পুরসুন্দরী শুনিলেন, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। কথা কহিতে তাঁহার ভাল লাগিতেছে না, তিনি নিজের মধ্যেই তলাইয়া থাকিতে চান।

"দেখে আসি, ওরা কোথা গেল—"

সিনেমা-পত্রিকাটি পুনরায় বাক্সে পুরিয়া কিরণ বাহির হইয়া গেল। প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া কিরণ কাহাকেও দেখিতে পাইল না। লম্বা প্ল্যাটফর্ম একেবারে খালি। একধারে কিছু মাল স্তূপ-করা, তাহার কাছেই কুলিরা পাশাপাশি শুইয়া আছে। প্ল্যাটফর্মের বড় ঘড়িটায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। হুইলারের দোকানটাও বন্ধ। কিরণ একটু আগাইয়া দেখিল, বাঁ দিকে বাহিরে যাইবার গেট। গেটের পাশে সাহেবি-পোষাক-পরা একটি ছোকরা বসিয়া আছে, সম্ভবত টিকিট কালেকটার। কিরণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—মুসাফিরখানাটা কোন দিকে। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাহেবি-পোষাক-পরা ছোকরাটি উঠিয়া দাঁড়াইল।

"বৌদি, আপনিও এসেছেন !"

হাজারিবাগের যতীশকে দেখিয়া কিরণ অবাক হইয়া গেল।

"কেষ্টদাকে খুঁজছেন ? তিনি খাবারের দোকানের দিকে গেলেন। ডেকে দেব ?"

"না, আমিই যাচ্ছি। কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা ! তুমি রেলে ঢুকেছ বুঝি"

"হ্যাঁ"

"তোমাদের বাড়ির খবর সব ভালো তো"

"মা মারা গেছেন গেল বছর"

"ও—"

কিরণের মনে পবিত্র একটি স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। ধপধপে ফরসা থান-পরা, ধপধপে সাদা মাথার চুল, টকটকে গায়ের রং, রোগা, খর্বাকৃতি যতীশের মায়ের চেহারাটা কিরণের চোখের সম্মুখে

যেন ভাসিয়া উঠিল। তিনি কিরণকে ঠিক নিজের পুত্রবধূর মতোই ভালবাসিতেন। তখনও মণ্টুর জন্ম হয় নাই।

"সাবিত্রী কেমন আছে"

যতীশের দাদা সতীশের স্ত্রী সাবিত্রী। কিরণের সমবয়সী ও সখী ছিল।

"বৌদির থাইসিস হয়েছে"

"ও! কোথা আছে সে? হাজারিবাগে?"

"না। হাজারিবাগের বাড়ি আমরা বিক্রি করে' দিয়েছি। বৌদি ধরমপুর স্যানাটোরিয়ামে আছেন। ডাক্তারেরা বলছেন সারাজীবনই নাকি থাকতে হবে"

"সাবিত্রীর ছেলেপিলে হয় নি?"

"একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলে হবার পরই বৌদির অসুখ হয়, ছেলেটি বাঁচে নি"

যাহাদের সহিত একদিন কত অন্তরঙ্গতা ছিল তাহাদের সংসারের এই সব নিদারুণ বার্তা কিরণ নির্বিকারভাবেই দাঁড়াইয়া শুনিল। বুঝিতে পারিল না যে একই জন্মে তাহার জন্মান্তর ঘটিয়াছে। এ জন্মের সহিত পূর্বজন্মের সম্পর্ক স্মৃতির অতি-ক্ষীণ-সূত্র অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া আছে মাত্র, তাহা আর জীবন্ত নয়, মৃত। ইহারা একদিন অতি-আপনার জন ছিল, আজ কেহ নয়।

কিরণ মৌখিক সমবেদনা প্রকাশ করিয়া বলিল, "আহা, শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার দাদা কোথা"

"দাদা সম্বলপুরে আছেন। আবার বিয়ে করেছেন তিনি। ছেলেও হয়েছে দুটি"

"আবার বিয়ে করেছেন? বিয়ে না করলেই পারতেন"

যতীশ কুণ্ঠিতমুখে চুপ করিয়া রহিল। বলিতে পারিল না যে বিবাহ না করিলে বংশলোপ হইবে যে।

বলিল, "বৌদিকে একথা জানাই নি আমরা—"

"তুমি বিয়ে করেছ ?"

"না। বৌদির স্যানাটোরিয়ামের খরচ চালাতে হয় আমাকে। দাদা তো মোটে পঞ্চাশ টাকা করে দেন"

যদিও ইহাদের সংসারের সুখ-দুঃখ-ভালো-মন্দের সহিত কিরণের সর্বপ্রকার যোগ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তবু সে মুরুব্বির মতো উপদেশ দিতে ছাড়িল না।

"তোমার দাদারই উচিত ছিল নিজে বিয়ে না করে' সাবিত্রীর চিকিৎসারখরচ চালানো, আর তোমার বিয়ে দেওয়া"

"দাদা তাই চেয়েছিলেন। আমিই রাজি হই নি"

"কেন"

যতীশ কুণ্ঠিত মুখে চুপ করিয়া রহিল, কোন উত্তর দিল না।

কিরণের মুখেও আর কোন কথা জোগাইল না। বহুকাল পূর্বে দশবারো বছরের রোগা-রোগা যে ছেলেটি বউদি বউদি করিয়া তাহার নিকট বারবার আসিত সে যে এত মহৎ, তখন তো কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

"কতক্ষণ তোমার ডিউটি—"

"এই ট্রেনটা আসবে, তারপর ছুটি! ওয়েটিংরুমে আপনাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো"

"না। আচ্ছা, আমি যাই। দেখি তোমার দাদা বাইরে কি করছেন"

কিরণ বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গিয়া সে কৃষ্ণকান্তকে দেখিতে পাইল না। খাবারের দোকানে কেহ নাই। মুসাফিরখানার বিস্তৃত চত্বরে বহুযাত্রী। একটা পান সিগারেটের বড় দোকানও রহিয়াছে। কিরণ সেই দিকে গেল। গিয়া দেখিল পার্বতী পকৌড়ী-ওলার সহিত বেশ ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে। পকৌড়ী-ওলা চিরন্‌জিপ্রসাদও ছাপরা জেলার

লোক। পার্বতীর চাল চলন, ফরসা শাড়ি এবং শাড়ি পরিবার কায়দা দেখিয়া সে প্রথমে তাহাকে বাঙালিনী বলিয়া অনুমান করিয়াছিল। কিন্তু পার্বতী যখন তাহার সহিত ছাপরাই ভাষায় আলাপ করিল সে অবাক হইয়া গেল এবং আত্মহারা হইয়া পড়িল যখন শুনিল যে খাস ছাপরা জেলাতেই তাহার বাড়িও। ইহার পর আর কিছু আটকাইল না। গরম গরম মটর ডালের বড়া ভাজিয়া দিবার সমস্ত ভার চিরন্‌জি স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে গ্রহণ করিল। কিরণ গিয়া দেখিল পার্বতী একটি মোড়ার উপর জাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মুকুন্দ বসিয়া আছে তাহার পায়ের তলায়। মুকুন্দের হাতে একঠোঙা পকৌড়ী। সানন্দে সে পকৌড়ী ভক্ষণ করিতেছে। চিরন্‌জি তাহার তোলা-উনুনে পুনরায় কয়লা দিয়া প্রাণপণে হাওয়া করিতেছে যাহাতে উনুনটা তাড়াতাড়ি ধরিয়া ওঠে। কিরণকে দেখিয়া পার্বতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তোর জামাইবাবুকে দেখেছিস—"

"ওই যে—"

মুচকি হাসিয়া পার্বতী মুখটা ফিরাইয়া লইল।

কিরণ সবিস্ময়ে দেখিল কৃষ্ণকান্ত একদল সাঁওতালদের মধ্যে বসিয়া আছেন। কয়েকটি সাঁওতাল যুবতী ও কিশোরী হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছে। বাকী সকলেও বেশ পুলকিত। কৃষ্ণকান্ত সাঁওতালী ভাষায় অনর্গল কথা বলিয়া চলিয়াছেন। কিরণ আন্দাজ করিল, কোনও রসের গল্প ফাঁদিয়াছে নিশ্চয়। সে বিষয়ে ওস্তাদ তো! সে দলটার দিকে আগাইয়া গেল। কিরণকে দেখিয়া কৃষ্ণকান্ত অপ্রতিভমুখে উঠিয়া পড়িলেন, যেন কোনও অপরাধ করিয়া ধরা পড়িয়া গিয়াছেন।

"এরা কে—"

"এরা? এরা সাঁওতাল, আমার আলাপী লোক। মুংলিকে তুমিও তো দেখেছ? সেই যে ডালটানগঞ্জে আমাদের বাংলো-মাঠে

পাতা কুড়োতে আসত ছোট মেয়েটা। কত বড় হয়েছে দেখ, ওর আবার ছেলে হয়েছে—"

পিঠে-ছেলে-বাঁধা মুংলি সলজ্জভাবে দন্তবিকশিত করিয়া হাসিল। তাহার উদ্দাম যৌবন খাটো শাড়ির বাঁধ মানিতেছিল না, কিরণ একবার মাত্র তাহার দিকে চাহিয়া ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাকে বললাম দাদাকে খুঁজতে, আর তুমি ওদের সঙ্গে এসে আড্ডায় বসে' গেছ"

"পুরোনো বন্ধু যে সব। ওই বুধু মাঝির সঙ্গে কত হুঁড়ার শিকার করেছি এককালে। দেখা হয়ে গেল হঠাৎ"

এমন সময় প্রকাণ্ড একা ঝুড়িতে প্রচুর জিলাপী লইয়া খাবারের দোকানী হাজির হইল।

"চার সের হ্যয় হুজুর—"

কৃষ্ণকান্ত মুংলির দিকে ফিরিয়া সাঁওতালী ভাষায় যাহা বলিল তাহার অর্থ—"নে, খা তোরা। ভাগ করে' দে সবাইকে—"

মুংলি আর একবার হাসিয়া গলিয়া পড়িল। দলে একজন বৃদ্ধ সাঁওতাল ছিল, মুংলি তাহার দিকে চাহিতে সে সম্ভবত লইবার অনুমতি দিল। মুংলি আগাইয়া আসিয়া কিরণের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সেলাম মাইজি—" তাহার পর ঝুড়িটা লইয়া সকলকে ভাগ করিয়া দিতে লাগিল। একটা আনন্দের হুল্লোড় পড়িয়া গেল যেন।

"চল, এবার দাদাকে খুঁজি। কাছে-পিঠে তিনি কোথাও নেই, খুঁজে দেখেছি।"

কিছুদূর আগাইয়া আসিয়া কিরণ মন্তব্য করিল—"কম বয়সী ছুঁড়ি দেখলে আর দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান থাকে না"

"ঠিক বলেছ। অনর্থক কয়েকটা টাকা খরচ হয়ে গেল"

মুচকি মুচকি হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকান্ত কিরণের দিকে আড়-চোখে একবার চাহিলেন। দেখিলেন কিরণও হাসিতেছে।

"গুণের আর শেষ নেই। কি বলে' অতগুলো জিলিপি ওদের সব দিয়ে দিলে। নিজেদের জন্যও কিছু রাখতে হয়—"

"খাবে? গরম গরম ভাজিয়ে নি চল না। চল, দোকানে বসেই খাওয়া যাক। ওখানে একটা বেঞ্চি আছে। দাদা বৌদি তো খাবে না। পার্বতী আর ওই ছোঁড়া চাকরটা তো এখানেই আছে। ওদেরও ডেকে নি, কি বল—"

"নাও—"

পার্বতী খাইতে চাহিল না। পকৌড়ি খাইয়া মুকুন্দেরও পেট ভরিয়া গিয়াছিল।

"আমরা দুজনেই খাই চল তাহলে—"

"আমার লজ্জা করবে ভারি"

"এতে লজ্জা কি। জিলিপি খাওয়া অন্যায় নয়"

একটু পরেই দেখা গেল, কিরণ আর কৃষ্ণকান্ত দোকানের সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া দুইটি শিশুর মতো জিলিপি ভক্ষণ করিতেছে। শুধু জিলিপি নয়, গরম গরম কচুরীও। তাহার পর ভাঁড়ে করিয়া চা।

"তোমার জেদেই কতকগুলো অখাদ্য গিল্‌তে হল"

"কুচ্ পরোয়া নাই। হজমি ওষুধ আছে আমার সঙ্গে"—

"আগে চল দাদার খোঁজটা করি। কোথায় গায়েব হ'লেন ভদ্রলোক—"

বিরুবাবুকে কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

কিরণ শেষে অনুমান করিল, "দাদাতো এখানেই পড়ত, কোন পুরোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয় তো।"

"তাই আশা করা যাক। এখন কি ওয়েটিং রুমে ফিরবে? তার চেয়ে চল ওই ওভার ব্রিজটায় ওঠা যাক—যাবে?"

কৃষ্ণকান্ত প্রশ্নটি করিয়া কিরণের দিকে চাহিয়া হাসিলেন একটু।

"এই গরমে—?"

"গরম বলেই যেতে চাইছি। ওখানে হাওয়া পাওয়া যাবে"

"কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ওখানে, ওই টংএর ওপর।"

"দাঁড়াব কেন, পায়চারি করব"

"বুড়ো বয়সে শখও কম নয়"

ইহার কোন উত্তর না দিয়া কৃষ্ণকান্ত পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া নিপুণভাবে সেটি ধরাইলেন। তাহার পর ব্রিজের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাগ-রাগ মুখ করিয়া কিরণ অনুসরণ করিল। তাহার মুখের ভাবটা, কি সব ছেলেমানুষী এই রাত দুপুরে।

...বিরুবাবু ফিরিলেন প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে। তাঁহার সঙ্গে একটি পাগড়ি-বাঁধা লোক দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। পরে জানা গেল সে নৌকার মাঝি। বিরুবাবু ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া সোজা গঙ্গার ঘাটে চলিয়া গিয়াছিলেন। সেইখানে এই ঝক্সু মাঝির সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে। সে তাঁহাকে বলিয়াছে যে এখনই নৌকা খুলিয়া দিলে ভোর পাঁচটা নাগাদ সে বিরুকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিবে। বাতাস অনুকূল আছে, হয়তো পাঁচটার আগেই পৌঁছিয়া যাইবেন। বিরুবাবু মনস্থ করিয়াছেন, ট্রেনের অপেক্ষা না করিয়া তিনি নৌকাযোগেই যাত্রা করিবেন। ঝক্সু মাঝি মালপত্র লইয়া যাইবে বলিয়া সঙ্গে আসিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রস্তাবটি শুনিলেন।

বলিলেন, "নৌকোয় যাওয়ার 'রিস্ক'ও তো আছে। যদি ঝড়-বৃষ্টি হয়, যদি চড়ায় কোথাও আটকে যায়—"

ঝক্সু মাঝি এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই। একথা শুনিয়া কিন্তু সে প্রতিবাদ করিল, মনে হইল একটা বাঘ বুঝি গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটি খুব যে বলিষ্ঠ তাহা নয়, যুবকও নয়। দোহারা চেহারা,

কুচকুচে কালো রং, কানের কাছের কেশগুচ্ছে পাক ধরিয়াছে, গোঁফও কাঁচাপাকা। সে গাঁউ গাঁউ করিয়া হিন্দিতে যাহা বলিল তাহার সার মর্ম এই যে, কোনও আশঙ্কার কারণ থাকিলে বাবুকে সে আশ্বাস দিত না। সে রেল-কম্পানীর মতো বেইমান নয় যে অগ্রিম ভাড়া লইয়া সে যাত্রীদের পথে বসাইয়া দিবে। আজ রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির কোন আশঙ্কা নাই, থাকিলে সে বাবুকে লইয়া যাইতে চাহিত না। যদি ঝড়বৃষ্টি হয় বা নৌকা আটকাইয়া যায় তাহা হইলে সে একটি পয়সা ভাড়া তো লইবেই না, উপরন্তু কান কাটিয়া (জরিমানা) দিবে।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তোমার কান নিয়ে আমরা কি করব বল" বিরুবাবু কিন্তু মনস্থির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বলিলেন, "কেষ্ট তুমি এখানে থাক, সকালের ট্রেনে এদের নিয়ে যেও। আমি চলে যাই। আমার যাওয়াটা আগে দরকার, একটা মিনিটেরও এখন অনেক দাম। বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে যেমন ক'রে হোক আমি সেখানে পৌঁছতে চাই"

কৃষ্ণকান্তের হঠাৎ মনে পড়িল একবার একটা ছুটিতে তিনি বিরুবাবুর কাছে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার এক সহকর্মীর সহিত একটা বাসনের টুকরার বয়স লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছিল। কৃষ্ণকান্ত তখন বিরুকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, "আরে পাঁচশো বছর নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন। ও কতটুকু সময়!—" সেই একই ব্যক্তির নিকট এক মিনিটই এখন অত্যন্ত মূল্যবান মনে হইতেছে। এ অবস্থায় আপত্তি করা বৃথা।

বলিলেন, "বেশ যান তাহলে, আমি এদের নিয়ে যাব—"

পুরসুন্দরী এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই এক কোণে বসিয়া নীরবে সব শুনিতেছিলেন। এইবার তিনি কথা কহিলেন।

"তোমার জলে ফাঁড়া আছে শুনেছি। তোমাকে এই রাত্রে একা আমি নৌকোয় যেতে দেব না"

"পাগল না কি! বিপদের সময় ও সব কুসংস্কার মানলে চলে? আমাকে যেতেই হবে"

"তাহলে চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাই"

"তুমি গেলে লাভটা কি হবে শুনি—"

পুরসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন ও কাপড় গোছাইতে লাগিলেন।

একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগে কিছু কাপড় গামছা সেমিজ ব্লাউস পুরিয়া বলিলেন, "আমি একা বসে' বসে' দুশ্চিন্তা করতে পারব না। তার চেয়ে চল সঙ্গেই যাই"

"চল—"

কৃষ্ণকান্ত আর একটি প্রস্তাব করিলেন।

"নৌকোটা কত বড়, সকলের কুলুবে না? সবাই গেলে কেমন হয়"

"না সকলের কুলুবে না। মাল যে অনেক। তুমি থাক। গগন দিগন্তও হয়তো এসে পড়বে পরের ট্রেনে। কাউকে না দেখলে ওরা আবার ঘাবড়ে যাবে। তোমরা থাক—"

কিরণ বলিল, "পার্বতী?"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "ও থাক। ও মুসাফিরখানায় রান্না নিয়ে আছে। আমরা যে চলে যাচ্ছি, সে কথা ওকে জানাবারও দরকার নেই। যদি জেদ ধরে' বসে যে যাব—তাহলে ওকে থামানো মুশকিল হবে। আমরা চুপি চুপি চলে যাই—"

"যা করবে তাড়াতাড়ি করে' ফেল। এখানে আর বেশী সময় নষ্ট করতে চাই না। গঙ্গার ঘাটে পৌঁছতেই প্রায় ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে"

"চল, আমি তো প্রস্তুত"

পুরসুন্দরী হাত ব্যাগটি ঝুলাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

কিরণ বলিল, "আমার দাদার সঙ্গে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু নৌকা যে ছোট। বড় নৌকো পাওয়া যাবে না—"

বিরু অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"তোরা পরে যাস—"

তিনি ঝক্সুর মাথায় নিজের জিনিসপত্র তুলিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পুরসুন্দরীও পিছু পিছু গেলেন। স্টেশন হইতে গঙ্গার ঘাট প্রায় দুই মাইল দূরে। রাস্তাও ভালো নয়; মিউনিসিপালিটির রাস্তা অত্যন্ত বেমেরামত। মিউনিসিপালিটির বাহিরের রাস্তাও সুগম নয়, ধূলিতে পরিপূর্ণ, অসমতল, মাঝে মাঝে খানাখন্দও আছে। বিরুবাবুর হাঁটা অভ্যাস আছে, তাঁহার তত কষ্ট হইতেছিল না, তাছাড়া তিনি খালি হাতে হাঁটিতে ছিলেন। পুরসুন্দরীর হাতে ব্যাগ ছিল, সে ব্যাগে ছিল তাঁহার নিজের কাপড়, কুসংস্কারবশত তাহা তিনি কোন কুলিকে ছুঁইতে দেননা, বারবার নিজেই বহন করেন। পুরসুন্দরীর হাঁটিতে কষ্ট হইতেছিল, খুবই কষ্ট হইতেছিল, কিন্তু তিনি নীরবেই হাঁটিতে লাগিলেন।

বিরুবাবু চলিয়া যাইবার ঘণ্টা দুই পরে যে ট্রেনটা আসিল তাহাতেই গগন, দিগন্ত, গগনের বউ চম্পা এবং মিস বোস আসিয়া হাজির হইল। তাহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কৃষ্ণকান্ত স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। কিরণ ছিল না। যতীশ তাহাকে জোর করিয়া নিজের বাসায় লইয়া গিয়াছিল, সেখানে ভালো করিয়া বিছানা করিয়া নেটের মশারি খাটাইয়া দিয়া একটি টেব্‌ল্ ফ্যান পর্যন্ত লাগাইয়া দিয়াছিল—যাহাতে বাকি রাতটুকু তাহারা আরামে ঘুমাইতে পারে। কিরণের পাশে কৃষ্ণকান্তও শুইয়াছিলেন, না শুইলে কিরণও শুইতে চাহিত না। কিরণ ঘুমাইয়া পড়িতেই তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে বাহির হইয়া আসিয়াছেন। ওয়েটিংরুমে জিনিসপত্র পাহারা দিতেছিল পার্বতী আর মুকুন্দ। পকৌড়ি-ওলা চিরন্‌জিও ওয়েটিংরুমের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, পার্বতী হুকুম দিলেই বড়া ভাজিতে আরম্ভ করিবে। পার্বতী মুখ-ভার করিয়া গম্ভীর হইয়া

বসিয়াছিল। কোন কথা বলিতেছিল না। পুরসুন্দরী যে তাহাকে লুকাইয়া চলিয়া গিয়াছেন এ রাগ তাহার কিছুতেই যাইতেছিল না। প্রতিশোধ-স্বরূপ সে কি যে করিবে তাহাও তাহার মাথায় আসিতেছিল না। যাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবে তিনিই তো নাগালের বাহিরে। তবু সে ঠিক করিয়াছিল পুরসুন্দরীর সহিত দেখা না হওয়া পর্যন্ত অনাহারে থাকিবে।

···ট্রেনটা যখন চলিয়া গেল তখন কৃষ্ণকান্ত প্রথম-শ্রেণী হইতে অবতীর্ণ যাত্রী চতুষ্টয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। ঠিক চিনিতে পারিলেন না। গগন দিগন্তকে বহুদিন তিনি দেখেন নাই, চম্পাকে তো দেখেনই নাই। সঙ্গে মিস বোস থাকাতে তাঁহার একটু সন্দেহ হইতেছিল, কারণ দ্বিতীয় কোনও নারী আসিবার কথা তিনি শোনেন নাই। কাছাকাছি আসিয়া তিনি একটু দাঁড়াইয়া পড়িলেন। মিস বোসকে দেখিয়া তাঁহার পুনরায় খটকা লাগিল। ইরানীদের মতো মাথায় লাল রুমাল বাঁধা, খাটো গাউন পরা এ মেয়েটির সহিত গগন বা দিগন্তর যে কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে তাহা ভাবা শক্ত। অথচ মেয়েটির সপ্রতিভ চালচলন কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় যে ইহাদের সহিত বেশ ঘনিষ্ঠতাই আছে। সেই জিনিসপত্র নামাইয়া কুলিদের সহিত বচসা করিতেছে।

"এই যে দিগন্ত এসে গেছ তোমরা। বাঁচলুম—"

কৃষ্ণকান্ত পিছন ফিরিয়া দেখিলেন পার্বতী দ্রুতপদে আসিতেছে। কথাগুলি সে-ই বলিল। কৃষ্ণকান্ত তখন ভরসা করিয়া আগাইয়া গেলেন।

"চিনতে পারছ আমাকে? পারছ না নিশ্চয়ই"

দিগন্তর হাই-পাওয়ার চশমার উপর মাথার অবিন্যস্ত চুলগুলো পড়িয়াছিল। তাহা সরাইয়া সে কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গগনও তাঁহাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, সে-ও পারিল না। পার্বতীই পরিচয় করাইয়া দিল।

"বড় পিসেমশাই। বড় পিসিমাও এসেছেন"

তখন সকলে প্রণাম করিল। মিস বোসও।

পার্বতীও মিস বোসকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। ভাবিতেছিল, এ আবার কে!

গগনকে চোখের ইসারায় মাথা নাড়িয়া প্রশ্ন করিল সে।

গগন বলিল, "উনি একজন মিড্-ওয়াইফ। শ্বশুর মশাই সঙ্গে দিয়েছেন"

মিস বোস কুলিদের মাথায় জিনিসপত্র চড়াইয়াছিলেন, পার্বতীর দিকে একটা চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া কুলিদের হুকুম দিলেন, "ফার্স্ট-ক্লাস ওয়েটিং রুমমে চলো—"

কুলিদের লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

পার্বতী তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বিদেশী পোষাক পরিয়া আছে বটে, কিন্তু রূপসী। ফরসা রং, অদ্ভুত কালো চোখ, দেহ সৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, কোমরটি তো মুঠোর মধ্যে ধরা যায়। ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া পার্বতী প্রশ্ন করিল—"খৃষ্টান না কি—"

"না। খাঁটি হিন্দু"—গগন উত্তর দিল।

"ওরকম পোষাক কেন তবে"

"আমিই পরিয়ে এনেছি। ট্রেনে সাহেবী পোষাক থাকলে ঢের সুবিধে হয়। চম্পা কিছুতেই পরতে চাইলে না—"

গগন নিজে খাকি মিলিটারি পোষাক পরিয়া আসিয়াছিল। কোমরের বেল্ট হইতে একটা রিভলবার ঝুলিতেছিল। দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, চমৎকার মানাইয়াছিল তাহাকে। দিগন্ত বেশ পরিবর্তন করে নাই। সে বরাবর যাহা পরে তাহাই পরিয়াছিল। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী, পায় একজোড়া স্যাণ্ডাল। বগলে ছিল একটা বই। মাথার কোঁকড়ানো বড় চুলগুলো অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চুল বারবার চশমার উপর আসিয়া পড়িতেছে, আর বারবার সেটা বাঁ হাত দিয়া সরাইয়া দিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত সানন্দে ইহাদের দেখিতেছিলেন। চম্পাকে দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন, ঠিক যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। চম্পা তো চম্পাই। কনক-চাঁপার মতো গায়ের রং। ফিকে নীল শাড়িটি কি চমৎকারই না মানাইয়াছে। মাথায় ঈষৎ ঘোমটা টানিয়া স্মিতমুখে আনত-নয়নে দাঁড়াইয়া আছে! কৃষ্ণকান্তের মনে হইল যেন দেবী-দর্শন করিতেছেন। আসন্ন-প্রসবা? কই দেখিয়া তো মনে হয় না।

গগন কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "চলুন, যাওয়া যাক। আপনারা বসেছেন কোথা—"

"ওয়েটিং রুমেই"

"বাবা মাকে দেখছি না, ঘুমুচ্ছেন নাকি"

"তাঁরা কিছুক্ষণ আগে একটা নৌকা করে' চলে' গেছেন"

"কেন! দাত্বর অবস্থা খুব খারাপ না কি"

"না, সে রকম কোনও খবর আসে নি। তবে উনি কিউল থেকে একটা তার করেছিলেন, আশা করেছিলেন উত্তর পাবেন একটা, কিন্তু উত্তর আসেনি। তাই ব্যস্ত হ'য়ে চলে গেলেন"

পার্বতী কুটুস্ করিয়া বলিল, "যান, কিন্তু আমাকে না বলে' যাওয়ার কোনও মানে হয় না। আমি মুসাফিরখানায় গিয়ে তোমাদের জন্যে রান্নার ব্যবস্থা করছি আর, ওঁরা আমাকে কিছু না বলে' চুপি চুপি এদিক দিয়ে চলে গেছেন—!"

গগন গম্ভীরভাবে বলিল, "খুব অন্যায় করেছেন। তোমার অনুমতিটা নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল"

পার্বতী ঝাঁঝিয়া উত্তর দিল, "নিশ্চয় অন্যায় করেছেন। দাঁড়াও না আমি গিয়ে মজা দেখাচ্ছি—"

"নতুন মজা আর কি দেখাবে। একটি মজাই তো জানা আছে তোমার—উপোষ—"

গগনের চক্ষু দুইটি হাসিতে লাগিল।

"ভালো হবে না বলছি—"

পার্বতী কিল তুলিয়া শাসাইল।

দুইজনে সমবয়সী, এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে।

"কি রান্না করে' রেখেছ"

"কিছু করি নি—"

"চল, ওয়েটিং রুমে বসেই ঝগড়া করা যাক"

গগন পার্বতী আর চম্পা আগাইয়া গেল।

দিগন্তকে লইয়া কৃষ্ণকান্ত একটু পিছনে পড়িলেন।

কৃষ্ণকান্ত চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "একেবারে মিড্-ওয়াইফ্ নিয়ে এসেছ, ব্যাপার কি"

"দাদার শাশুড়ি বউদিকে আসতেই দিচ্ছিলেন না, কিন্তু দাদাও একেবারে না-ছোড়"

এই পর্যন্ত বলিয়া দিগন্ত অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিল, হাসির দ্বারা সম্ভবত ইহাই বুঝাইতে চাহিল যে বুনো-ওলের সহিত বাঘা-তেঁতুলের বেশ একটা বোঝা-পড়া হইয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত ভ্রূযুগল ঈষৎ উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "ও, তাই না কি। ঝগড়া-ঝাঁটি করে এসেছ ?"

"না, তা হয় নি"

দিগন্ত স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

"কি হ'ল তাহলে—"

"যা বরাবর হয়, দাদা ঝড়াৎ করে' আমাকে একটা টেলিগ্রাম করে বসল—কাম শার্প। গেলাম। দাদা বললে—চম্পাকে আমি নিয়ে যাবই, তুমি ব্যাপারটা ম্যানেজ কর। আমি তখন দাদার শ্বশুর শাশুড়ীকে গিয়ে বোঝালাম যে দাদা নিজেই ডাক্তার, সে যখন সঙ্গে করে' নিয়ে যেতে চাইছে তখন আপনাদের ভাবনা কি। দাদুরও খুব কষ্ট হবে বৌদি না গেলে। দাদার শাশুড়ি বললেন, ভরা পোয়াতি রাস্তায় যদি কিছু হয়ে যায় তখন গগন কি একা সামলাতে পারবে ? আমি বললাম, বেশ তাহলে একজন নার্স কিম্বা মিড্-ওয়াইফ সঙ্গে

চলুক। আপনাদের যার উপর বিশ্বাস বলুন—তাকেই নিয়ে যাই। যাঁর উপর তাঁদের বিশ্বাস তিনি আসতে পারলেন না, তিনিই এই মিস্ বোসকে রেকমেণ্ড করলেন। মেয়েটি নাকি বিলেত থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে সম্প্রতি। তাই ওকে নিয়ে এসেছি। এখুনি দাদার শ্বশুর বাড়িতে টেলিগ্রাম করতে হবে একটা। দাদার শ্বশুর-শাশুড়িও হয়তো দাত্তকে দেখতে আসতে পারেন—"

"জমজমাট ব্যাপার তাহলে বল—"

"দাদা আরও জমজমাট ব্যাপার করে' এসেছে কিউলে। খারাপ চা দিয়েছিল বলে এক চা-ওলার মাথায় চায়ের টি পট্ সুদ্ধ উল্‌টে, চেন টেনে ট্রেন থামিয়ে, স্টেশন মাস্টারকে ডেকে—সে এক হৈ হৈ কাণ্ড"

"তাই না কি! কি হ'ল শেষ পর্যন্ত—"

"কি আর হবে। ওরা অমনি খারাপ চা তো বরাবর দিচ্ছে, তা না হলে লাভ হয় না, কেলনার তো উঠে গেছে—"

"না, তা বলছি না। পুলিস কেস টেস হয় নি তো—"

"না। আমি চা-ওলাটাকে গোপনে গোটা ছুই টাকা দিয়ে দিয়েছি"

দিগন্ত কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া কৃষ্ণকান্তের দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিল। এমন সময় কিরণ আসিয়া উপস্থিত। মনে হইল বেশ চটিয়াছে।

"ও, এরা সব এসে গেছে বুঝি। বাঃ, তুমি বেশ লোক তো, একলা উঠে চলে' এলে, আমাকে ডাকলে না"

কৃষ্ণকান্ত একটু অপ্রতিভ হইবার ভান করিয়া পরিষ্কার মিথ্যা কথাটি বলিলেন।

"ছু'তিনবার ডাকলাম, কই উঠলে না তো। ভাবলাম কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে হয় তো মাথা টাথা ধরবে, তাই আর বেশী ডাকলাম না"

"মিথ্যুক কোথাকার। একবারও ডাকনি আমাকে"

কৃষ্ণকান্ত অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলেন।

টিকিট-কলেক্‌টার যতীশ আসিয়া হাজির হওয়াতে হাওয়াটা অন্য দিকে ঘুরিয়া গেল।

"আপনাদের জন্য চা করতে বলেছি। ক' কাপ আনতে বলব"

কৃষ্ণকান্ত কিরণকে চোখের ইঙ্গিতে ডাকিয়া একটু আড়ালে লইয়া গিয়া বলিল, "তুমি নিজে গিয়ে চা-টা করাও তাহলে। চা খারাপ দিয়েছিল ব'লে গগন শুনছি কিউলে একটা চা-ওলাকে জখম করে' এসেছে—"

"কে বললে"

"দিগন্ত"

কিরণকে প্রণাম করিয়া দিগন্ত হাসিমুখে বলিল, "দাদা এখানে কিছু বলবে না। চা-টা সত্যিই খুব খারাপ ছিল। আলকাতরার মতো রং—"

"না, না, আমি নিজে দাঁড়িয়ে ভাল চা করাচ্ছি, যতীশ কোথায় তোমার স্টল, চল—"

যতীশ বলিল, "আপনি যাবেন কেন। আমিই সব ঠিক করে' দিচ্ছি। আপনি ওঁদের সঙ্গে যান না"

কিরণ সে কথায় কানই দিল না।

"আমাদের সঙ্গে ভাল দার্জিলিং চা আছে। আমাদের কাপ ডিসও সঙ্গে রয়েছে। সেগুলো বার করুক পার্বতী। কোথা গেল, পার্বতী—"

মুকুন্দ ওয়েটিংরুমের ভিতর হইতে বাহির হইয়া বলিল, "সে চিরন্‌জীকে নিয়ে বড়া ভাজতে গেছে—"

"তুই চায়ের জিনিসপত্তরগুলো বার কর তাহলে—"

যতীশ বলিল, "আমি তাহলে গরম জল নিয়ে আসি। দুধও চাই বোধহয়"

"হ্যাঁ, তা চাই—"

যতীশ চলিয়া গেল।

কিরণের সাড়া পাইয়া গগন এবং চম্পা ওয়েটিংরুম হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কিরণকে প্রণাম করিল। কিরণ উভয়ের থুতনিতে হাত দিয়া নিজের অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া চম্পার দিকে চাহিয়া বলিল, "ওমা, এ যে রাজলক্ষ্মী দেখছি। ট্রেনে ঘুম হয় নি নিশ্চয়, ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি দেখি যতীশ চা-য়ের জলের কি করলে। ভালো ফুটন্ত জল না হলে চা ভালো হবে না। মুকুন্দ, তুই ততক্ষণ চায়ের জিনিসগুলো বার কর। আমি দেখি—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া একটি ইজিচেয়ারে অঙ্গ প্রসারিত করিয়া স্মিতমুখে কিরণকেই লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি যে কৌশলে কিরণের মনোযোগ চায়ের ব্যাপারে লাগাইতে পারিয়াছেন, এই আনন্দে তাঁহার মুখে একটু মৃদু হাসিও ফুটিয়াছিল। কিরণ শশব্যস্ত হইয়া মুসাফির-খানার দিকে চলিয়া গেল। চায়ের স্টল কোথায় সে একটু আগেই দেখিয়াছে। গগন এবং দিগন্ত প্রবেশ করাতে মিস্ বোস উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরে বেশী চেয়ার ছিল না। গগন দিগন্তকে বলিল, "দেখতো, আরও চেয়ার জোগাড় করতে পারিস কি না। লেডিজ্ ওয়েটিংরুম থেকে যে ক'টা পাস টেনে বার কর। প্লাটফর্মেই বার কর। বাইরেই বসা যাক—।"

দিগন্ত তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিতে ছুটিল। কে বলিবে সে একজন গণ্যমান্য প্রফেসার।

গগনরা চলিয়া যাইবার দুইঘণ্টা পরে কলিকাতার দিক হইতে যে ট্রেনটি সাহেবগঞ্জে আসিল সেই ট্রেন হইতে সূর্যসুন্দরের একমাত্র ভ্রাতা চন্দ্রসুন্দর অবতরণ করিলেন। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্থানীয় স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রজগোপালবাবু স্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ভীড়ের

মধ্যে ব্রজগোপালবাবুকে চিনিতে কষ্ট হয় না। তিনি যেমন শীর্ণ, তেমনি লম্বা, তেমনি কালো ; মাথার চুলগুলিও কাশফুলের মতো ধপ্‌ধপে শাদা। বৃদ্ধ নন, অকালে চুল পাকিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর ট্রেন হইতে নামিয়াই তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং খুশী হইলেন। ব্রজগোপাল আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিতেই বলিলেন, "আমার চিঠি পেয়েছিলি, তাহলে। তোর চুল যে বিলকুল শাদা হ'য়ে গেল রে, অ্যাঁ, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। আমার চুল এখনও পাকে নি যে রে সব। আমার জিনিসপত্তরগুলো নাবা। এই নে লিস্ট—"। সুদৃশ্য কাপড়ের-তৈরি মণি-ব্যাগ হইতে একটি কাগজের টুকরা বাহির করিয়া সেটি ব্রজগোপালের হাতে দিলেন। তাহার পর ব্যাগটি তুলিয়া হাস্যোদ্ভাসিত মুখে বলিলেন, "এটি আমার এক নাতনী, মানে ছাত্রের মেয়ে—আমাকে করে' দিয়েছে। আর একটু 'সোবার' হ'লে ভাল হ'ত, না ?" ব্রজগোপাল গম্ভীর লোক, একটু মৃদু হাসিলেন মাত্র, কোনও মন্তব্য করিলেন না। তিনি ট্রেনে উঠিয়া গেলেন এবং লিস্ট মিলাইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।

চন্দ্রসুন্দর শিক্ষক, সারাজীবন নানাস্থানে নানাস্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছেন। সমস্ত ভারতবর্ষময় তাঁহার ছাত্রছাত্রীরা নানাপদে অধিষ্ঠিত আছে। অনেক শিক্ষকেরই আছে, কিন্তু চন্দ্রসুন্দরের বিশেষত্ব এই যে তিনি তাঁহার অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের পারিবারিক খবর তো রাখেনই, চেষ্টা-চরিত্র করিয়া অনেকের চাকুরিও করিয়া দিয়াছেন, কারণ তাঁহার কৃতী এবং পদস্থ ছাত্রেরও অভাব নাই, তাহাদের উপর প্রভাবও তাঁহার যথেষ্ট। আর একটি ক্ষেত্রেও চন্দ্রসুন্দর প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি সনাতন-পন্থী গোঁড়া হিন্দু, সনাতন-পন্থীরা তাঁহাকে খুব খাতির করেন। ব্রাহ্ম-ধর্মের সহিত সংঘর্ষের ফলে রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন যে হিন্দুসম্প্রদায়ের একদা

উদ্ভব হইয়াছিল, একদা যাঁহারা হিন্দুদের প্রতিটি আচরণ, এমন কি কুসংস্কারও, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় সমর্থন করিবার প্রয়াস করিতেন, চন্দ্রসুন্দরও সেই দলের লোক। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ব্রাহ্মণের টিকি ইলেকট্রিসিটির কণ্ডাকটার, সূর্যগ্রহণের সময় হাঁড়ির ভিতর রোগের বীজাণু বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের অকল্যাণ করিতে পারে। বিবেকানন্দ যখন আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইতেছিলেন তখন চন্দ্রসুন্দর কলেজের ছাত্র। অনেকেই বিবেকানন্দের পদধূলি লইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রসুন্দর কিন্তু সুযোগ পাইয়াও তাঁহাকে প্রণাম করেন নাই, তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব-বোধ তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল। হউন বিবেকানন্দ, কিন্তু কায়স্থ তো। ব্রাহ্মণ সন্তান হইয়া কায়স্থের পদধূলি কেন লইবেন তিনি? বার তিনেক ফার্ষ্ট আর্টস (সেকালে আই, এ. বা আই, এস-সি. ছিল না) ফেল করিয়া অবশেষে তিনি স্কুল মাষ্টারি গ্রহণ করেন। ধর্ম বিষয়ে বরাবরই তিনি গোঁড়া। ছাত্র জীবনেই মাছ-মাংস ছাড়িয়াছিলেন, তুইবেলা ধরিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতেন। একাধিক গুরুর নিকট দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সুতরাং ধার্মিক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে, এক্ষেত্রে বেশ প্রভাবও আছে। অনেক জায়গায় তাঁহার গুরু-ভাই আছেন, কেহ নগণ্য, কেহ কেহ মান্যগণ্য। এই ম্লেচ্ছভাবাপন্ন যুগে তিনি হিন্দুদের আচার-বিচার কঠোরভাবে মানিয়া চলেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা করে। এই সব কারণে যখন তিনি কোন তীর্থস্থানে বা গুরু-ভ্রাতার নিকট যান—তখন পথে নিবার্য কোন কষ্ট-ভোগ তাঁহাকে করিতে হয় না। খানকতক পোষ্টকার্ড সময় মতো লিখিয়া পোষ্ট করিয়া দিলেই হইল। হয় কোনও ছাত্র, না হয় কোনও গুরু-ভাই তাঁহার পথ-কষ্ট নিবারণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবেনই। তিনি তৃতীয় শ্রেণীতে আসিয়াছেন, কিন্তু রাজার হালে আসিয়াছেন। জলিল বলিয়া তাঁহার একটি মুসলমান ছাত্র

হাওড়ায় টিকিট কলেকটার। দাদার অস্থখের টেলিগ্রাম পাইবামাত্র তিনি তাহাকে, ব্রজগোপালকে এবং নরেশকে পত্র দিয়াছিলেন। জলিল ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল এবং পূর্ব হইতেই তাঁহার জন্য একটি বেঞ্চ দখল করিয়া বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিল এবং যে টিকিট চেকারটি ট্রেনে যাইতেছিল তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিল—সে যেন পথে মাষ্টার মশাইয়ের খোঁজ খবর লয়। নরেন রামপুরহাটে থাকে। সে রাত্রি তিনটার সময় আসিয়া তাঁহাকে শুদ্ধাচারে প্রস্তুত বাড়ির চা খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সাহেবগঞ্জে ব্রজগোপালের তত্ত্বাবধানে আসিয়া চন্দ্রস্থন্দর নিশ্চিন্ত হইলেন। ব্রজগোপাল স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক, তাহার বাধ্য ছাত্রও অনেক আছে নিশ্চয়, তাহাদের অসঙ্কোচে ফাইফরমাস করা চলিবে। হাতের কাছে ফাই-ফরমাস করিবার লোক না থাকিলে চন্দ্রস্থন্দর অস্বস্তিবোধ করেন। ফাই ফরমাস করিয়া করিয়া তিনি তাঁহার দুই পুত্র কার্তিক-গণেশের মাথা খাইয়াছেন। যতদিন নাবালক অবস্থায় তাহারা তাঁহার কাছে ছিল, ততদিন বালক-ভৃত্যের মতো তাহারা তাঁহার ফরমাস খাটিয়াছে। পড়া করিবার সময় তিনি তাহাদের ফরমাসের পর ফরমাস করিয়া পড়িতে দিতেন না। তাঁহার স্বভাবটা ছিল বিলাসী, কিন্তু চাকর রাখিবার ক্ষমতা ছিল না। ছেলে দুইটিকেই সব করিতে হইত। করিতে হইত, কারণ বাল্যকাল হইতে পরিবারের সকলের মনে একটা ধারণা হইয়া গিয়াছিল, 'চন্দরের শরীরটা ভাল নয়'। চন্দ্রস্থন্দরের দিদিমাই এই ধারণাটি তাঁহার শৈশবে সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার না কি স্নায়বিক দৌর্বল্য আছে। মাথা ঘোরে, হাত পা ঝিন ঝিন করে, মাঝে মাঝে হাত-পা অসাড়ও হইয়া যায়, অকস্মাৎ সারা গায়ে আমবাত বাহির হইয়া পড়ে। তাঁহার এক গুরু-ভাই কবিরাজী করেন। তিনি বলিয়াছিলেন বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের মধ্যে যে সাম্যভাব থাকিলে শরীর ভাল থাকে চন্দ্রবাবুর তাহা নাই। সেইজন্য কখনও বায়ু, কখনও

পিত্ত, কখনও কফ মাথা চাড়া দিয়া তাঁহাকে বিব্রত করে। একটু ঠাণ্ডা লাগিলে তাই সর্দি হয়, একটু গরমেই সর্বাঙ্গে ফোড়া বাহির হইয়া পড়ে। কার্তিক-গণেশকে এই সব অসুখের ধাক্কাই প্রধানত সামলাইতে হইয়াছে। চন্দ্রসুন্দরের পত্নী চিন্ময়ী বড়লোকের মেয়ে ছিলেন। বার বার সেক দেওয়া, ক্রমাগত বসিয়া পাখা করা বা পা টেপা—এ সব কার্যে তিনি তত অভ্যস্ত ছিলেন না। ছেলেরাই বাবার সেবা করিত। চন্দ্রসুন্দরের একটিমাত্র কন্যা হইয়াছিল। তাহাকে তিনি দশ বৎসর বয়সেই পাত্রস্থ করিয়াছিলেন। জামাতার মধ্যে যে গুণটি তিনি সর্বান্তঃক রণ কামনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সে ত্রিসন্ধ্যা করিত, নিরামিষাশী ছিল, বেশ বড় একটি শিখাও ছিল তাহার। চন্দ্রসুন্দর ফার্ষ্ট আর্টস পাস করিতে পারেন নাই বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে কোন উচ্চপদ অধিকার করিতে পারেন নাই। কোথাও কোথাও মাইনর স্কুলের হেডমাষ্টার হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তিনি উৎকৃষ্ট ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু বেতন বেশী পাইতেন না। তাই যেখানেই একটু বেশী বেতনের সন্ধান পাইতেন সেইখানেই দরখাস্ত করিতেন। এইভাবে বহু স্কুলে তিনি চাকুরি করিয়াছেন। পত্নী চিন্ময়ী এই অর্থকৃচ্ছ্রতা সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনি অধিকাংশ সময়ে পিতৃগৃহে থাকিতেন। অগ্রজ সূর্যসুন্দরের সহিত নানাকারণে তিনি একত্র থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার সহিত বহু বিষয়ে তাঁহার মতের মিল ছিল না। নিজের মতবাদকে দাদার গৃহস্থালীতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করিবার দক্ষতা বা কৌশলও তাঁহার ছিল না। যখনই সে চেষ্টা করিতে যাইতেন, তাহা কলহের মতো দেখাইত। আপোষ করিয়া থাকিবার মতো সহনশীল মনোভাবও ছিল না তাঁহার। ইহার প্রধান কারণ সূর্যসুন্দরকে ঠিক তিনি ভালবাসিতে পারেন নাই, অথচ তাঁহাকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিবার সামর্থ্যও তাঁহার ছিল না। দাদাই তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, বার বার ফেল করা সত্ত্বেও তাঁহার পড়ার খরচ

জোগাইয়াছেন—একথা বিস্মৃত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সূর্যসুন্দরের চেষ্টাতেই প্রথমে তাঁহার মাষ্টারি এবং তাহার পর পোষ্টাফিসের একটি চাকরি জুটিয়াছিল, যদিও এই শেষোক্ত চাকরিটি তিনি বজায় রাখিতে পারেন নাই ; পারিলে হয়তো তাঁহার উন্নতি হইত এবং এত অর্থকৃচ্ছ্রতা থাকিত না। অর্থাভাবে পড়িলে সূর্যসুন্দরই বরাবর তাঁহাকে টাকা জোগাইয়াছেন। তাই সূর্যসুন্দরকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে ঝাড়িয়া ফেলা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বস্তুত মনে মনে দাদাকে তিনি শ্রদ্ধাই করিতেন, ভয়ও করিতেন খুব। কখনও তাঁহার মুখের উপর প্রত্যুত্তর দিবার সাহস তাঁহার হয় নাই। যদিও দাদার আর্থিক উন্নতি এবং প্রবল প্রতিপত্তি তাঁহার মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিত, কিন্তু অন্তরের অন্তস্থলে এমন একটা নিগূঢ় বন্ধন ছিল যে দাদার অসুখের সংবাদ পাইয়া তাই তিনি সুদূর উড়িষ্যা হইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনের নেপথ্যে একটা অনুতাপের মেঘ জমিতেছিল। তাঁহার মনে হইতেছিল দাদার সহিত ঠিক আদর্শ অনুজোচিত ব্যবহার করেন নাই। এজন্য দাদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত—একথাও তাঁহার মনে হইতেছিল, কিন্তু কিভাবে তাহা যে করা সম্ভব তাহাও তিনি ভাবিয়া ঠিক করিতে পারেন নাই। কুমারের টেলিগ্রামটা পাইয়া প্রথমে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন, তাহার পর ঠিক করিলেন—যাইতে হইবে, যত কষ্ট যত অসুবিধাই হউক—যাইতে হইবে। দ্বিতীয়বার ফার্ষ্ট আর্টস ফেল করার পর দাদা তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার খানিকটা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল—"টাকার জন্য তুমি ভাবিও না। আমি টাকার অভাবে ভাল করিয়া পড়িতে পারি নাই। তোমার মনে সে ক্ষোভ যেন না থাকে। ফেল হইয়াছ তাহাতে দমিয়া যাইও না। ভাল করিয়া আবার পড়, আগামী বারে নিশ্চয় পাস করিবে।" কার্তিক-গণেশকে খবর দিয়া এবং ছাত্রদের পোষ্টকার্ড লিখিয়া তিনি ছুটির দরখাস্ত করিয়া দিলেন। কার্তিক-

গণেশ কেহই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিতে পারে নাই। কার্তিককে তাঁহার এক গুরু-ভাই রেলে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। গণেশও তাঁহার এক বড় লোক ছাত্রের জমিদারীতে গোমস্তাগিরি করিতেছে। পত্নী চিন্ময়ী এবং কন্যা জমাতাকেও তিনি একটি করিয়া পোষ্টকার্ড লিখিয়া আসিয়াছেন কিন্তু ইহারা যে আসিবে সে ভরসা তাঁহার নাই।

ব্রজগোপালবাবু জিনিনপত্রগুলি গাড়ি হইতে নামাইয়া পুনরায় গণিয়া গণিয়া দেখিলেন, পুনরায় গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া বাংকের উপর, বেঞ্চের নীচে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু লিষ্টে লিখিত একটি ছোট পুঁটুলি পাওয়া গেল না। তিনি তখন চন্দ্রসুন্দরের নিকট গিয়া বলিলেন, "একটি পুঁটিলি ছাড়া আর সব জিনিস পেয়েছি। নামিয়ে রেখেছি সেগুলি—"

"পুঁটুলিটা নেই? নরেশ তাহলে তুলে দিতে ভুলে গেছে। নরেশ ভোর বেলা রামপুরহাটে আমদের জন্যে চা এনেছিল। পুঁটুলিতে নিমকি ছিল কিছু। পুঁটুলিটা নিয়ে নরেশ বললে—ওয়েটিং রুমে চলুন। সেখানেই সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিল সে। গায়ত্রীটা জপে' নিয়ে সেইখানে বসেই নিমকি দিয়ে চা খেলুম। তাড়াতাড়িতে বোধহয় পুঁটুলিটা তুলে দেয় নি। চিরকালের ভুলো তো নরেশটা। যাক গে। চল তাহলে এবার। তোমার বাসাটা কত দূর—"

"কুলি পাড়ায়।"

"ও, তাহলে তো কাছেই।"

কুলির মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া তাঁহারা অগ্রসর হইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময় আর এক সমস্যার উদ্ভব ইহল।

"কাকাবাবু, কাকাবাবু—"

ডাক শুনিয়া চন্দ্রসুন্দর ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন, একটি মোটা-সোটা ফরসা মহিলা তাঁহার দিকে হাসিমুখে আগাইয়া আসিতেছে। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রী উষাকে তিনি প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই।

উষা প্রণাম করিয়া বলিল, "আমাকে চিনতে পেরেছেন ? মুখ দেখে মনে হচ্ছে পারেন নি, আমি উষা"

চন্দ্রসুন্দর বিস্মিতকণ্ঠে উত্তর দিলেন—"আরে, সত্যিই আমি চিনতে পারিনি"

"বাবার কিছু খবর পেয়েছেন ?"

"টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি, নতুন কোন খবর তো জানি না।"

"আমরাও টেলিগ্রাম পেয়ে আসছি। সন্ধ্যাও এসেছে—"

"ও—"

উষা ঘাড় ফিরাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "এই তিন সরে' আয় ওখান থেকে। গাড়ির নীচে কি দেখছিস। ছোটদাদুকে প্রণাম কর এসে। দাদাদের ডেকে নিয়ে আয়"

উষার তিন ছেলে আসিয়া দাঁড়াইল। বড়টির বয়স দশ, মেজটির আট, ছোটটির ছয়। নাম এক, দুই, তিন। তিনজনই হাফ-প্যাণ্ট হাফ-শার্ট পরিয়া রহিয়াছে, তিনজনেরই চুল দশ আনা ছ' আনা করিয়া ছাঁটা—চন্দ্রসুন্দর এই জিনিসটিই লক্ষ্য করিলেন।

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আমি জিনিসপত্রগুলো নিয়ে যাই, আপনি পরে আসুন। আমাকে স্কুলে যেতে হবে। আমার বাড়িটা চিনে বার করতে পারবেন কি—"

"তা পারব। কিন্তু—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও"

চন্দ্রসুন্দর ইতস্তত করিতে লাগিলেন নিজের ভাইঝিদের ষ্টেশনে রাখিয়া আরামে থাকিবার জন্য ছাত্রের বাসায় চলিয়া যাওয়াটা যে একটু দৃষ্টি কটু—এই ধারণাটা তাঁহাকে বাধা দিতেছিল।

ব্রজগোপালকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইটি আমার ছাত্র। তোরা তো প্ল্যাটফর্মে থাকবি, আমি এর বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করতে যাচ্ছি। পরে এসে দেখা করব এখন—"

উষা বলিল, "আমরা এখানকার এস, ডি, ও'র বাংলোয় যাব।

রঙ্গনাথ তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিল। রঙ্গনাথের বিশেষ বন্ধু সে, একসঙ্গে বিলেতে ছিল—"

ব্রজগোপাল বলিল, "এস, ডি, ও'র কার বাইরে এসেছে।—তিনিও এসেছেন—"

"রঙ্গনাথ কে—"

"সন্ধ্যার স্বামী। তুমি সব ভুলে গেছ কাকাবাবু। এই যে ওরা—"

স্লিপিং-স্যুট-পরা রঙ্গনাথ এবং তাঁহার পিছু পিছু সন্ধ্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গনাথ বেঁটে, শ্যামবর্ণ, চক্ষু দুইটি বুদ্ধি-দীপ্ত। সন্ধ্যা কালো, চোখে সোনার চশমা, মাথায় কাপড় নাই। কালো, হইলে কি হয়, অপূর্ব সুন্দরী। তাহার পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে লিটারারি ডাইজেষ্ট।

"—সন্ধ্যা, কাবাবাবুও যাচ্ছেন—"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথ উভয়েই প্রণাম করিল।

"হ্যালো, "হ্যালো, হ্যালো—"

এস, ডি, ও সাহেব ভীড় ঠেলিয়া রঙ্গনাথের করমর্দন করিলেন।

"জিনিসপত্র নেবে গেছে সব? তোমার সদানন্দদা কোথায়—"

"ওই যে—"

উষার স্বামী সদানন্দ ভীড় বাঁচাইয়া একটু দূরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। রোগা, লম্বা, ফরসা চেহারা জুলফির চুলগুলিতে পাক ধরিয়াছে। পরনে বাঙালী পোষাক। গিলে-করা চুড়িদার পাঞ্জাবী, কোঁচানো শান্তিপুরী ধুতি, গলায় পাকানো চাদর, পায়ে পেটেন্ট লেদারের পাম্-শু। দক্ষিণ হস্তের অনামিকায় হীরার আংটি জ্বল জ্বল করিতেছে। তিনিও আসিয়া চন্দ্রসুন্দরকে প্রণাম করিলেন।

সদানন্দকে চন্দ্রসুন্দর চিনিতে পারিলেন। কলিকাতায় ইতিপূর্বে সম্প্রতি দুই একবার দেখা হইছিল।

"এবার চলুন যাওয়া থাক, আমার স্কুলের না হলে দেরি হয়ে যাবে—"

ব্রজগোপাল মৃদুকণ্ঠে পুনরায় বলিল।

"হ্যাঁ, চল—। আমি তাহলে চলি—"

ব্রজগোপালের সহিত চন্দ্রসুন্দর চলিয়া গেলেন। ষ্টেশনের বাহিরেই দেখিলেন এস, ডি, ও সাহেবের প্রকাণ্ড 'কার' টি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ব্রজগোপালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এস, ডি, ও কি জাত? ব্রাহ্মণ? চেহারটা তো ব্রাহ্মণের মতো —"

"উনি হিন্দুই নন, মুসলমান—।"

"রাধামাধব, রাধামাধব—"

অকারণে চন্দ্রসুন্দর 'থুঃ' বলিয়া নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার অনেক প্রিয় মুসলমান ছাত্র আছে, অনেক মুসলমানের সহিত হৃদ্যতাও আছে, কিন্তু সামজিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের তিনি প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহাদের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলাই উচিত মনে করেন অথচ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীরা অসঙ্কোচে গিয়া মুসলমানের বাড়িতে গিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেছে। তাঁহার স্ত্রী কিম্বা মেয়ে আপত্তি করিত। এসব লেখা-পড়া শেখানোর ফল। দাদাকে তিনি মেয়েদের লেখাপড়া শিখাইতে বারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু দাদা তাঁহার বারণ শোনেন নাই, মেয়েদের কলেজেও পড়াইয়াছেন। জামাই দুইটিও বিলাত-ফেরত। উহারা যে মুসলমানদের বাড়িতে গিয়া খানা খাইতে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে। হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হইল —ব্রজগোপাল যদিও চুপ করিয়া আছে কিন্তু সে বোধহয় মনে মনে হাসিতেছে। চন্দ্রসুন্দরের যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। একবার মনে হইল তাহাকে বলেন যে তাঁহার বিরুদ্ধতাসত্ত্বেও দাদা তাঁহার ছেলে-মেয়েদের মনে ম্লেচ্ছ মনোভাব সঞ্চারিত করিয়াছেন, তিনি অনেক মানা করিয়াছিলেন, দাদা শোনেন নাই। মেয়েদের বেথুনে

লরেটোতে পড়াইয়াছেন, বিলাত-ফেরত জামাই করিয়াছেন। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল—মুমূর্ষু দাদার বিরুদ্ধে কিছু বলাটা কি ঠিক হইবে? চুপ করিয়া গেলেন।

ব্রজগোপালের বাসায় পৌঁছিয়া চন্দ্রসুন্দর কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহাদের ঘরের লোক হইয়া গেলেন। ব্রজগোপালের স্ত্রীকে মা এবং তাহার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঠাকুর-দা সম্পর্ক পাতাইয়া ঘণ্টাখানের মধ্যেই বেশ জমাইয়া ফেলিলেন তিনি। ব্রজগোপাল যে ছাত্র-জীবনে কতপ্রকার দুষ্টামি করিত এবং অবশেষে ধরা পড়িয়া যাইত, Circumnavigation শব্দটার প্রকৃত অ্যাক্‌সেন্ট-সম্মত উচ্চারণ তাহার মুখ দিয়া বাহির করিতে তাঁহাকে যে কত বেগ পাইতে হইয়াছিল, এই সব গল্পে তিনি আসর গুলজার করিয়া ফেলিলেন। ব্রজগোপালের স্কুল ছিল, তাহার ছেলেমেয়েদেরও ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল কেবল ব্রজগোপালের ছোট ছেলে মটরু, (বয়স পাঁচ বছর, সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে) আর ব্রজগোপালের স্ত্রী শিপ্রা।

চন্দ্রসুন্দর শিপ্রার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আমিও সকাল সকাল খাব মা। আমিও স্কুল-মাষ্টার তো, নটার সময় খাওয়াই অভ্যাস বরাবর—"

শিপ্রা বলিল, "জানি তো। আপনি চান টান করুন। ছানার ডালনাটা হয়ে গেলেই খেতে দেব আপানাকে"

"ছানার ডালনা হচ্ছে না কি? বাঃ"

চন্দ্রসুন্দর মাছ-মাংস খান না বটে, কিন্তু সুখাদ্যের দিকে বেশ লোভ আছে।

"আমাকে একটু তেল দাও তাহলে—"

"কি তেল মাখেন"

"গায়ে সরষের তেলই মাখি। মাথায় মাখি একটা কবরেজি তেল,

সেটা আমার সঙ্গেই আছে। ওই কাঠের বাক্সটা খোল, ওর কোণের দিকে আছে"

পৈতা হইতে একটি চাবি খুলিয়া শিপ্রার হাতে দিলেন। শিপ্রা কবিরাজী তেলের শিশিটি বাহির করিয়া দিল। তাহার পর একটা বাটিতে খানিকটা সর্ষপ তৈল আনিয়া ছোঁড়া চাকরটাকে বলিল, "মাখিয়ে দে বাবুকে—"

চন্দ্রসুন্দর বামহাতের তালুতে কবিরাজী তৈল ঢালিয়া লইয়া সেটি মাথায় ঘসিতে লাগিলেন। ঘসিতে ঘসিতে তাঁহার চক্ষু দুইটি আধ-বোজা হইয়া আসিল। শিপ্রা রান্নাঘর হইতে আসিয়া একটি ছোট মোড়া আগাইয়া দিল।

"এইটেতে বসে' তেল মাখুন। আমি রান্নাঘরে যাই ; ঘি-টা চড়িয়ে এসেছি—"

"যাও"

শিপ্রা চলিয়া গেল। ছোঁড়া চাকরটা পায়ে তেল মালিশ করিতে লাগিল। মটরু একধারে দাঁড়াইয়া নূতন ঠাকুরদাটির দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

"এদিকে সরে' এস দাদু। লিখতে শিখে গেছ ?"

সে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, শিখিয়াছে।

"আচ্ছা। কি কি শিখেছ—বল দেখি—"

"অ, আ আর ই—"

মটরু ঘাড়টি কাৎ করিয়া মুখের মধ্যে বামহস্তের তর্জনীটি পুরিল এবং মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল ;

"বাস, ওই পর্যন্ত ? ঈ ?"

"ওটা বড্ড শক্ত। ঠিক হয় না"

"হতেই হবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। ছিঃ মুখে আঙুল দিতে নেই। আচ্ছা ওই তিনটে আগে লিখে দেখা দিকি আমাকে"

ক্ষণ
য়ের
াহার

মটরু একছুটে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল এবং একটু পরে শ্লেটে আঁকা-বাঁকা করিয়া অ-আ-ই লিখিয়া আনিল।

"বাঃ, এতো চমৎকার হয়েছে। একেবারে মুক্তাক্ষর দেখছি। হ্রস্ব-ইটার ল্যাজটা একটু ছোট হয়েছে যদিও, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চান করে উঠে ঠিক করে' দিচ্ছি সব। ঈ-টা যদি ভাল করে' লিখতে পার তাহলে মজার জিনিস খেতে দেব একটা"

"কি ?"

"চুরণ"

"চুরণ. কি ? লবেনচুস ?"

"না। তার চেয়েও ভালো"

চন্দ্রসুন্দরের কাছে সুলেমনি লবণ, লেবুর রস এবং অন্যান্য জাৎক মশলা-যুক্ত একপ্রকার মুখরোচক কবিরাজী চূর্ণ কৌটা ভরতি সর্বদা থাকে। বিহারীরা ইহাকে 'চুরণ' বলে। তাঁহার এক বিহারী কবিরাজ গুরুভাই তাঁহাকে নিয়মিত এই 'চুরণ' সরবরাহ করেন। ঔষধটি পাচক, কিন্তু ইহার প্রধান গুণ ইহা খাইতে চমৎকার। চন্দ্রসুন্দর আবিষ্কার করিয়াছেন ছোট ছোট শিশুদের আকর্ষণ করিবার শক্তি ইহার যথেষ্ট। চন্দ্রসুন্দর তাই প্রায় ইহাকে টোপ-স্বরূপ ব্যবহার করেন।...ছোড়া চাকরটি পা দুইটি শেষ করিয়া পিঠে তেল মালিশ করিতে যাইতেছিল, চন্দ্রসুন্দর বাধা দিলেন।

"পিঠে দুটো ছোট ছোট ফোড়া হয়েছে, ওখানে তেল লাগিও না। বৌমা—"

শিপ্রা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

"বাড়িতে চন্দন-পিঁড়ে আছে নিশ্চয়"

"আছে"

"আর গোল-মরিচ ?"

"তা-ও আছে"

"তাহলে খাওয়ার পর একটা ওষুধ করে' দিও মা। চন্দন

পিঁড়িতে একটু গঙ্গাজল দিয়ে কয়েকটা গোল-মরিচ ঘসে' ঘসে' দিলে একটা ক্বাথ মতন হবে। সেইটে আমার পিঠের ফোড়া দুটোতে লাগিয়ে দেব। গোড়ায় গোড়ায় দিলে খুব উপকার হয়—"

শিপ্রা বলিল, "বেশ তো, করে' দেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "A Stitch in time Saves nine। মায়ের ইংরেজি পড়াশোনা আছে তো—?"

"কিছু আছে—"

তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল সে। পুরা খবরটা বলিল না। সে বি. এ. পাস।

আহারাদির পর পিঠের ব্রণ দুইটিতে গোলমরিচের মলম লাগাইয়া চন্দ্রসুন্দর ঘণ্টাখানেক ঘুমাইয়া লইলেন। ঘুমাইবার পূর্বেই তিনি মটরুকে ঈ লিখিবার কৌশলটা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। উঠিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মটরু কোথা"

"পাড়ায় খেলতে গেছে"

"খুব ব্রাইট্ বয়—"

তাহার পর পকেট হইতে নিকেলের ঘড়িটা বাহির করিয়া দেখিলেন তিনটা বাজিয়াছে।

"ব্রজ ক'টা নাগাদ ফেরে—"

"পাঁচটা। কোন কোন দিন সাড়ে পাঁচটাও হয়ে যায়।"

"এত দেরি হয় কেন"

"স্কুলের কাছেই বোসবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। আপনাকে চা করে' দি—"

"আমি একটু বেরুচ্ছি, এসে খাব"

চন্দ্রসুন্দর জামাটি গায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ হইতে একটি মতলব তাঁহার মাথায় ঢুকিয়াছিল। দাদার জামাইয়ের সঙ্গে এখানকার এস. ডি. ও সাহেবের যখন এত বন্ধুত্ব, তখন তাঁহার

ছোট ছেলের একটা ভাল চাকরি কি তিনি করিয়া দিতে পারেন না? ছেলেটা অজ পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া রহিয়াছে, ক্রমাগত ম্যালেরিয়ায় ভোগে, কাছে-পিঠে কোন ডাক্তার পর্যন্ত নাই। হাঁটিতে হাঁটিতে এবং দুএকজন পুলিস কনেষ্টবলকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে তিনি এস. ডি. ও সাহেবের বাংলোর সম্মুখীন হইলেন। প্রথমেই একটি গেট। গেটের ভিতর দিয়া একটা লাল কাঁকরের রাস্তা বাংলোর বারান্দা পর্যন্ত গিয়াছে। বারান্দার উপর ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড ভীষণ-দর্শন একটা কুকুর বাঁধা। বারান্দার অপর প্রান্তে সুদৃশ্য একটি বেতের চেয়ারে হেলান দিয়া একটি মেয়ে বসিয়া আছে। এস. ডি. ও সাহেবের স্ত্রী না কি? চন্দ্রসুন্দর চশমাটা বাহির করিয়া পরিলেন। তবু ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। গেটের ভিতর দিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবামাত্র কুকুরটা চীৎকার করিয়া উঠিল। চন্দ্রসুন্দর আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন মনে করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুকুরটাকে ধমক দিয়া সে বারান্দা হইতে নামিয়া চন্দ্রসুন্দরের দিকে আগাইয়া আসিল।

"কাকাবাবু, আসুন—"

চন্দ্রসুন্দর যাহাকে এস. ডি. ও'র স্ত্রী ভাবিয়েছিলেন সে সন্ধ্যা। তাহার মুখে মৃদু হাসি।

"কুকুরটা কিছু বলবে না তো"

"বাঁধা আছে। আপনি কি ওয়েটিং রুমেই আছেন?" চন্দ্রসুন্দর স্টেশনে বলিয়াছিলেন যে তিনি এক ছাত্রের বাসায় সন্ধ্যাহ্নিক করিতে যাইতেছেন। কথাটাকে একটু ঘুরাইয়া বলিলেন, "সেই ছাত্রটির বাসাতেই আছি। ওরা ছাড়লে না কিছুতে। এরা সব কোথা—?"

"উত্তর দিকের বারান্দায় গল্প করছে সব"

"তুমি এখানে একা কেন"

সন্ধ্যার মুখমণ্ডলে একটা লজ্জার আভা ছড়াইয়া পড়িল।

"আমি প্রুফ দেখছি"

"কিসের প্রুফ"

"দৃশদ্বতী বলে' আমি একখানা মাসিকপত্র বার করি। তারই প্রুফ—"

"তাই না কি। বাঃ। আমি তো কিছুই জানতাম না"

"বসুন"

চন্দ্রসুন্দরকে একটি চেয়ারে বসাইয়া কুকুরটাকে আর একবার ধমকাইয়া সন্ধ্যা ভিতরের দিকে চলিয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিল সে, তাহার হাতে দুইখানি দৃশদ্বতী। ছাপা ও প্রচ্ছদপট সুরুচির সাক্ষ্য বহন করিতেছে। প্রচ্ছদপটে একটি প্রস্তরাকীর্ণ নদীর ছবি রহিয়াছে। চন্দ্রসুন্দর যদিও খুশী হইবার ভান করিলেন, কিন্তু মনে মনে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন একটু। দৃশদ্বতী শব্দটির অর্থ তাঁহার জানা ছিল না। একটি প্রবন্ধের শিরোনামাও তাঁহাকে একটু বিচলিত করিল। প্রবন্ধটির নাম—"তথা-কথিত সতীত্বের ঐতিহাসিক ভিত্তি।" তৃতীয়ত মনে পড়িল, সন্ধ্যা এম. এ. পাস তিনি এফ. এ. ফেল।

"পড়ে দেখব'খন। ওদের খবর দিয়েছিস ?"

"না। আপনিই চলুন না ওধারে। মিস্টার রহমন্ লোক খুব ভালো"

"তোদের খাতির করে খুব। না ?"

"ওঁর সঙ্গে তো খুব বন্ধুত্ব"

"গণেশটা বাঁকড়ো জেলার অজ পাড়া-গাঁয়ে পড়ে' আছে। রহমন সাহেবকে বলে' ওর যদি একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারিস—"

"বলব ওঁকে। গণেশ কতদূর পড়েছে—"

"ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নি। উপর্য্যুপরি অসুখ; দু'বছর পরীক্ষাই দিতে পারলে না"—তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"হাতের লেখাটা কিন্তু চমৎকার"।

"টাইপ করতে পারে—"

"না। শেখবার সুযোগই পায় নি"

সন্ধ্যা আর কোন প্রশ্ন করিল না, চুপ করিয়া রহিল।

"বলিস একটু, বুঝলি। তুই বললে কাজ হবে"

"আমি মিস্টার রহমনকে বলতে পারব না। তবে ওঁকে বলব। ওঁর সঙ্গে খুব ভাব"

"তা যা ভাল বুঝিস করিস। বড্ড কষ্ট পাচ্ছে ছেলেটা—"

"চলুন না, আপনার সঙ্গেই আলাপ করিয়ে দিই রহমন সাহেবের। আলাপ হ'লে দেখবেন খুব ভালো লোক—"

"না থাক। দরকার হয়তো পরে দেখা করব আমি। শিপ্রা হয়তো চা করে' বসে' আছে আমার জন্যে। আমি যাই এবার—"

"শিপ্রা কে"

"আমার ছাত্রের বউ। ভারী ভালো মেয়েটি"

চন্দ্রসুন্দর উঠিয়া পড়িলেন।

"স্টেশনে দেখা হবে আবার। এখন চলি—"

গেট হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রসুন্দর নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে আবার পথ হাঁটিতে লাগিলেন। তিনি কেমন যেন বিমর্ষ বোধ করিতেছিলেন। কিছুদূর হাঁটিবার পর স্টেশনের কাছে আসিয়া পড়িলেন। গাছের তলায় একটা ফল-ওয়ালা কমলালেবু, বেদানা, খেজুর প্রভৃতি সাজাইয়া বসিয়াছিল। তাঁহার মনে হইল দাদার জন্য এক টাকার কমলালেবু কিনিয়া লইয়া যাওয়া উচিত। দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন। দোকানে কালো-কোট-পরা একটি বেঁটে লোকও তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া ফল কিনিতেছিল। চন্দ্রসুন্দর তাঁহার পিঠটা দেখিতে পাইতেছিলেন, মুখটা দেখিতে পান নাই। ভদ্রলোক মুখ ফিরাইতেই চিনিতে পারিলেন।

"আরে, হাবুল মামা যে—"

হাবুল মামা কয়েক মুহূর্ত নীরবে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মুখের ভিতর হইতে বাঁধানো দাঁতের পাটি বাহির করিয়া বলিলেন, "চন্দর ! সকালের ট্রেনে এসেছ বুঝি"

"হ্যাঁ। দাঁতটা খুললে কেন—"

"নতুন করিয়েছি। মুখে থাকলে ভালো করে কথা কইতে পারি না। মনে হয় এখনি পড়ে যাবে বুঝি—"

"তুমি কোন ট্রেনে এলে"

"এখনি এলাম একটা মালগাড়িতে"

"মালগাড়িতে ?"

"হ্যাঁ, চেনা গার্ড ছিল। তুমিও চেন তাকে। নরেনবাবুর ছেলে ক্যাবলা। ভাগনা কেমন আছে—"

"দাদার অসুখের খবর তুমি পেলে কি করে। কুমার কি তোমাকেও টেলিগ্রাম করেছিল ?"

"না। ওরা তো আমার ঠিকানা জানত না। আমি বোলপুরে যোগেনের কাছে শুনলাম। এসে দেখি ট্রেনটা ছেড়ে গেছে। খবর পেলাম একটু পরেই একটা মালগাড়ি ছাড়ছে, আর ক্যাবলা তার গার্ড। তার সঙ্গেই চলে' এলাম। ভাগনার কি খবর বল তো—"

"টেলিগ্রামে অসুখের খবর পেয়েছিলাম। আর তো কিছুই জানি না।"

হাবুলমামা পকেট হইতে ছোট একটি কৌটা বাহির করিয়া দাঁতের পাটি দুইটি তাহাতে পুরিয়া রাখিয়া দিলেন।

"দাঁত বাঁধালে কবে"

"মাসখানেক হল। মাড়ির ঘা এখনও শুকোয় নি"

"কৌটায় পুরছ কেন"

"অনেকদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল—গল্প করতে হবে

তো। বললুম তো, দাঁত পরলে কথা বলতে পারি না, মনে হয় এখুনি পড়ে' যাবে। খেতেও পারি না ও দিয়ে। অনিলার জেদে করাতে হয়েছে। জলে গেছে কতকগুলো টাকা অনর্থক—''

"অনর্থক কেন। ভালো করে' চিবিয়ে খেতে পারবে, ভালো হজম হবে"

''আমি এমনিতেই বেশ চিবিয়ে খেতে পারি, হজমও খুব হয়। আমার মাড়ির জোর খুব আছে। তোমার আঙুলটা আমার মুখে পুরে দাও না, কুট করে' কেটে নেব"

চন্দ্রসুন্দর হাসিলেন।

"এখনও মাংস টাংস চালাচ্ছ না কি"

"খুব। তবে পাই না, যা দাম আজকাল। পুজোতেও আজকাল লাউ কুমড়ো বলি দিচ্ছে"

"লেবু কিনলে না কি"

"হ্যাঁ, অসুখের বাড়িতে যাচ্ছি, কিছু নিয়ে নিলাম"

''দুজনে তো একসঙ্গেই যাচ্ছ, তাহলে আমার আর আলাদা করে' নেবার দরকার নেই, কি বল। একসঙ্গে কতকগুলো নিলে আবার পচে যাবে হয় তো—"

হাবুলমামা কোনও উত্তর দিলেন না। নাক দিয়া সশব্দে একবার নিশ্বাস টানিয়া লইলেন। এটি তাঁহার মুদ্রাদোষ।

''দাদার মেয়ে জামাইরাও এসেছে। তারা এস. ডি. ও'র ওখানে আছে"

"হ্যাঁ, তাতো থাকবেই। এক ক্লাসের ইয়ার নিশ্চয়।"

হাবুলমামা মুচকি হাসিয়া ভুরু নাচাইলেন।

"তুমি আজকাল রেলে চাকরি করছ না কি মামা"

''না। হঠাৎ এ কথা মনে হল কেন তোমার? ও, এই কোটটা। এটা ক্যাবলার। গার্ড গাড়িতে এলুম কিনা। ক্যাবলা

বললে তুমি এই কোটটা পরে' থাক, কেউ যদি দেখতে পায় ভাববে তুমিও বুঝি রেলের লোক। আজকাল কেউ 'চুগলি' করলেই তো চাকরিটি যাবে। চুগলি-খোরের অভাবও নেই। চল—"

"কোথা যাবে তুমি"

"ক্যাবলার বাড়ি। তার কোটটা তাকে দিয়ে যেতে হবে"

"আমিও ওই পাড়াতেই উঠেছি এক ছাত্রের বাড়ি"

"চল তাহলে"

উভয়ে কুলিপাড়ার দিকে অগ্রসর হইল।

৫

রাধানাথ গোপের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরের অসুখের খবর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসমাগম হইতে লাগিল। দশ বিশ ক্রোশ দূরের লোকেরাও আসিয়া হাজির হইল। কেহ পালকি করিয়া, কেহ ঘোড়ায় চড়িয়া, কেহ গো-শকটে, কেহ বা পদব্রজে। কেহ খবর লইয়া চলিয়া গেল, কেহ কেহ বা রহিল। যাহারা চলিয়া গেল তাহারা বলিয়া গেল শীঘ্রই আবার আসিবে। রাধানাথ গোপ যে চালাগুলি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন বাহিরের লোকেরাই সেগুলি ব্যবহার করিতে লাগিল। কুমার ভাবিতে লাগিল আরও করাইবে কি না। তাঁবুগুলি বাড়ির লোকেরা দখল করিয়াছিল। আত্মীয়স্বজনরা এখনও সকলে আসিয়া পোঁছায় নাই। সূর্যসুন্দরের মেজ এবং সেজ ছেলে আসে নাই এখনও। মেজছেলে
আসিবেন কিনা তাহা অনিশ্চিত। সেজ ছেলে উশনাও দূরে থাকেন। অনেক সময় তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হয়। তিনি কন্ট্রাক্‌টারি করেন, কখন যে কোথায় তাঁহার কাজ থাকে তাহা এখান হইতে সব সময় নির্ণয় করা যায় না। কুমার মাসখানেক পূর্বে নাগপুর হইতে তাঁহার চিঠি পাইয়াছিল। সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাম করিয়াছে। তিনি ঠিক আসিয়া পৌঁছিবেন, হয়তো একটু দেরি হইবে। কিন্তু মেজদা আসিবেন কি না ঠিক নাই। বহুদিন পূর্বে তিনি বিবাগী হইয়া গিয়াছেন, মাঝে মাঝে কুমারকে চিঠি লেখেন বটে, কিন্তু তখন হইতে আর বাড়ি আসেন নাই। সূর্যসুন্দর তাঁহার সম্বন্ধে বাহিরে কিছু প্রকাশ না করিলেও কুমার বুঝিতে পারিতেছিল মনে মনে তিনি প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমারের নিকট তাঁহার যে ঠিকানাটা ছিল সেই ঠিকনাতেই সে টেলিগ্রাম করিয়া দিয়াছে। কিন্তু কোনও খবর আসে নাই। সেজদা

সপরিবারে আসিবেন ; গগনের শ্বশুর-বাড়ির লোকেরাও আসিবেন খবর আসিয়াছে। আরও আত্মীয় স্বজন আসিবে। কিন্তু বাড়িতে আর স্থান কই ? ইহার উপর আর একটা সমস্যা দেখা দিয়াছে, সূর্যসুন্দর ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন যে গগনের বৌয়ের সাধ দিতে হইবে। সুতরাং আরও জনসমাগম অনিবার্য। কুমার অগ্রসর হইয়া দেখিল রাধানাথবাবু নাই। তিনি জনমজুরদের বলিয়া গিয়াছেন, আরও একটি বড়-গোছের আট-চালা প্রস্তুত করিতে। এটি প্রস্তুত করিলে আপাতত আর কিছু করিবার থাকিবে না। যদি প্রয়োজন হয় পরে দেখা যাবে। বাঁশ খড়ও ফুরাইয়া গিয়াছিল। কুমার ঠিক করিল আরও কিছু বাঁশ খড় সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হইবে। কুমার দেখিতে পাইল গঙ্গা আসিতেছে, তাহার মুখে বিরক্তির চিহ্ন। সে কিছু পূর্বে পুরসুন্দরীর নিকট হইতে একটি ফর্দ লইয়া বাজারে গিয়াছিল। জামাইরা আসিয়াছে, পুরসুন্দরী পোলাও-মাংসের আজোয়ন করিতেছেন।

গঙ্গা নিকটে আসিতেই কুমার প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল—"

"এখানে যা কিসমিস রয়েছে তাতে চলবে না। জাফরান কি আলুবোখরা তো পাওয়াই গেল না। যুগলের দোকান কি একটা দোকান। ভালো লবেঞ্চুস পর্যন্ত নেই। ভেবেছিলাম উষার ছেলেদের জন্য আনব কিছু—"

"কি হবে তাহলে—"

"আমাকে কাটিহারে দৌড়তে হবে, দেড়টার ট্রেনে চলে যাই। সাধের জন্যে কি কি লাগবে ফর্দটাও পেলে একসঙ্গে সব কিনে আনতাম"

"বাবা এখন এসব হাঙ্গামা না করলেই পারতেন—"

"বাঃ, বৌমার সাধ দেবেন না, বলিস কি তুই। হাঙ্গামা আবার কি। কাটিহার থেকে ঠাকুর আনলেই চলবে। বৌদি একা কতদিক সমালাবেন। ঊর্মিলা তো বাবার কাছেই রাতদিন

বসে' আছে, আর থাকতেই হবে। হ্যাঁ আর একটা সুখবর আছে—”

“কি—”

“নিখিলবাবু আর তাঁর স্ত্রী আজ সকালের ট্রেনে এসে গেছেন। এখুনি আসবেন তাঁরা। নিখিলবাবু যদি সাধের ভারটা নিয়ে নেন তাহলে আর ভাবনার কিছু থাকবে না”

“আচ্ছা, রাধানাথবাবু কোথা গেলেন বল তো”

“নিখিলবাবুর কাছেই গেছেন বোধহয়। কুঠির দিকেই তো যেতে দেখলাম। একটু খোসামোদ করতে গেছেন আর কি—”

“যাঃ। উনি শুধু শুধু নিখিলবাবুর খোসামোদ করবেন কেন”

“কেন আর, স্বভাব—”

মুচকি হাসিয়া গঙ্গা অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইল কুমার তাহার পিছু পিছু আসিতে লাগিল।

সূর্যসুন্দরের ঘরে প্রবেশ করিয়া কুমার দেখিল, বাবাকে কেন্দ্র করিয়া মেঝেতে বেশ একটি সভা বসিয়াছে। কাকাবাবু গীতা পাঠ করিতেছেন। চন্দ্রসুন্দরের ধারণা হইয়াছে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর ইহাই একমাত্র পাথেয়। সূর্যসুন্দর পাথেয় লইতে আপত্তি করেন নাই, চন্দ্রসুন্দরের আত্মতৃপ্তির জন্যই সম্ভবত তিনি রাজি হইয়াছেন, কিন্তু তিনি একটি সর্ত করিয়াছেন, একেবারে যেন পাঁচটি শ্লোকের বেশী পড়া না হয়। এক সঙ্গে বেশী পড়িলে সব গোলমাল হইয়া যাইবে, তাছাড়া সকলের হয়তো ভালও লাগিবে না। উর্মিলা তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া চুল কুরিয়া দিতেছিল, চম্পা বসিয়াছিল পায়ের কাছে। আস্তে আস্তে পায়ে হাত বুলাইতেছিল সে। মেঝেতে কম্বলের উপর চন্দ্রসুন্দরের পাশে গলায় আঁচল দিয়া এবং হাতজোড় করিয়া বসিয়াছিল কিরণ। একটু দূরে উষা পান সাজিতেছিল। সন্ধ্যা আর একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়া পড়িতেছিল সেদিনকার খবরের

কাগজটা। তাহার ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত। দিগন্তও তাহার পাশে বসিয়াছিল, সম্ভবত গীতাই শুনিতেছিল।

পশ্চিমদিকের প্রশস্ত বারান্দায় কুমার কয়েকটি চেয়ার, ক্যাম্প চেয়ার, তেপায়া, ছোট-টেবিল প্রভৃতি পাতাইয়া দিয়াছিল। কৃষ্ণকান্ত, রঙ্গনাথ, গগন এবং গ্রামের আরও জনকয়েক যুবক সেখানে বসিয়া মৃদুস্বরে গল্প করিতেছিলেন। প্রচুর সিগারেট পুড়িতেছিল। সদানন্দ কোণের ছোট ঘরটায় বসিয়া দাড়ি কামাইতেছিলেন। গ্রামের নাপিত লোচন (তাহার গলায় গলগণ্ড এবং গল-গণ্ডের উপর একটি তুলসীর মালা) তাঁহাকে কামাইয়া দিবার জন্য আসিয়াছিল। কিন্তু সদানন্দ বলিয়াছেন তিনি নিজে কামানোই পছন্দ করেন। লোচন তবু যায় নাই। সে বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল জামাই-বাবুদের তেল মাখাইয়া স্নান করাইয়া তবে যাইবে। কুমারের এইরূপই নির্দেশ। বিরুবাবু গিয়াছিলেন স্টেশনে। তাঁহার মেয়ে-জামাইরা কেহই আসিয়া পৌঁছায় নাই। কোথায় কি রকম ট্রেনের যোগাযোগ আছে, তাহারা কখন আসিয়া পৌঁছিতে পারে এই সব খবরাখবর করিতে তিনি গিয়াছিলেন। উষার ছেলে তিনটি, এক-দুই-তিনও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে। পার্বতী পুরসুন্দরীর সহকারিণী-রূপে রান্নামহলের দিকে আছে এবং কয়েকটি বোকা চাকরের উপর তম্বী করিতেছে। তাহার ধমকে সন্ত্রস্ত হইয়া একটি চাকর ঊর্ধশ্বাসে মশলা পিষিতেছে, একটি কাপড় কাচিতেছে এবং আর একটি ইঁদারা হইতে জল তুলিতেছে। উর্মিলা সংসারের সমস্ত ভার বড়দির উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে এবং বড়দির দক্ষিণ-হস্ত পার্বতী যে এই বোকা অথচ-পাজি চাকরগুলাকে দুই ধমকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে মনে মনে খুব খুশীও হইয়াছে। হাবুলমামা বাহির-বাড়িতে নূতন কম্পাউণ্ডারটির সহিত আড্ডা জমাইয়াছেন। কম্পাউণ্ডারটি যুবক। যুবকদের সহিত এবং কিশোরদের সহিতই হাবুলমামার জমে ভাল। তিনি গীতার আসরে আসেন নাই।

গঙ্গা একনজরে সমস্ত ব্যাপারটা প্রণিধান করিয়া বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল। কুমার একপাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

চন্দ্রসুন্দর আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে পড়িতেছিলেন—

যোগ-যুক্ত বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ
সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে।

যিনি বিশুদ্ধাত্মা কিনা শুদ্ধ-চিত্ত, বিজিতাত্মা কিনা আত্মাকে যিনি জয় করেছেন অর্থাৎ যিনি সংযত-দেহ, জিতেন্দ্রিয় কিনা যিনি ইন্দ্রিয়-জয়ী, সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কিনা, সর্বভূতের আত্মাকে যিনি নিজের আত্মার মতো দর্শন করেন, যিনি যোগযুক্ত, অর্থাৎ যোগী, মানে নিষ্কাম কর্মযোগী, তিনি কুর্বন্ অপি মানে কাজ করেও, ন লিপ্যতে, কাজে লিপ্ত হন না।

চন্দ্রসুন্দর সহসা চম্পার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বউমা, বুঝতে পারছ তো? আই-এতে তোমার সংস্কৃত ছিল কি—"

চম্পা সলজ্জভাবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, ছিল।

দিগন্ত নিম্নকণ্ঠে বলিল, "বউদি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেছেন গেলবার। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছেন—"

"ও তাই না কি। তাতো জানতুম না—"

চন্দ্রসুন্দর চুপ করিয়া গেলেন।

পুনরায় তিনি গীতা পাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সূর্যসুন্দর বাধা দিলেন।

"এখন আর থাক। এদের সঙ্গে একটু গল্প করি"

চন্দ্রসুন্দর ইহাতে একটু মর্মাহত হইলেন। কিন্তু দাদার বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব। তাই বলিলেন, "আমি তাহলে আহ্নিকটা সেরে নিই গে। ওবেলা আবার হবে"

তিনি গীতা বন্ধ করিয়া উঠিয়া গেলেন।

উষা একসঙ্গে দুই খিলি পান এবং খানিকটা কিমাম মুখে পুরিয়া গল্প করিবার জন্য সূর্যসুন্দরের বিছানায় আসিয়া বসিল। বসিয়াই বুঝিতে পারিল পিক্ ফেলিবার জন্য উঠিতে হইবে। পিক্ ফেলিয়া আসিয়া আবার বসিল। কুমার তখনও দাঁড়াইয়াছিল। তাহার দিকে চাহিয়া উষা বলিল, "তুইও ওই মোড়াটা টেনে নিয়ে ব'স্ না। দাঁড়িয়ে রইলি কেন। কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হয় বাপু"

"তোমরা গল্প কর। আমাকে একবার মাঠে যেতে হবে"

কুমার বাহির হইয়া গেল। যাইবার সময় বাবার 'স্মৃতিকথা'টি লইয়া গেল।

"তোমার শরীর দুর্বল লাগছে না তো বাবা"—উষা জিজ্ঞাসা করিল।

"না। আমি বেশ ভাল আছি। তোদের সবাইকে দেখে আমার অর্ধেক অসুখ সেরে গেছে। যেতে তো হবেই এবার, তবু অসুখ হয়েছিল বলেই দেখা হয়ে গেল তোদের সঙ্গে, তা না হলে সবাইকে একসঙ্গে এমনভাবে পেতাম কি—

সূর্যসুন্দর হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

কেন থামিলেন তাহা বুঝিতে উষার বিলম্ব হইল না।

"মেজদা সেজদার কোন খবর এখনও আসে নি, নয়?"

"না। উশন্ আসবে। পৃযু কি করবে কে জানে"

"মেজদার খবর কি পাও কোনও—"

কুমার মাঝে মাঝে চিঠি পায়। কুমার তাকে খবরও দিয়েছে"

"মেজদা খবর পেলে আসবে ঠিক"

সূর্যসুন্দর চুপ করিয়া রহিলেন।

সূর্যসুন্দরের অবস্থার সত্যই অনেকটা উন্নতি হইয়াছিল। মুখ-চোখের স্বাভাবিক রূপ আবার ফিরিয়া আসিয়াছিল। পক্ষাঘাত-গ্রস্ত বাম হাত এবং বাম পায়ের অবশ্য তেমন কিছু উন্নতি হয় নাই। কিন্তু

তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনও অশান্তি বা উদ্বেগ ছিল না। ব্যাপারটাকে তিনি মানিয়াই লইয়াছিলেন।

উষার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, তুই ডায়েট কন্‌ট্রোল করছিস শুনলাম। ওসব করতে যাস নি, দুর্বল হ'য়ে যাবি। আমাদের বংশে রোগা কেউ নেই। তোর মতো যখন আমার বয়স, তখন আমার ওজন ছিল আড়াই মণ। সাধারণ ঘোড়া আমাকে বইতে পারত না"

"তোমাদের সে যুগই আলাদা ছিল। এখন যে সবাই ঠাট্টা করে। আমার দেওর আমার কি নাম রেখেছে জান? ফ্যাট ফ্যাক্‌টারি। এফ. এফ. বলে' ডাকে। ওদের গুষ্টির সব ফড়িংয়ের মতো চেহারা। ওদের মধ্যে আমি হয়েছি বকো মধ্যে হংস যথা। প্রত্যেকটি জায়ের কাঠি-কাঠি চেহারা, কণ্ঠার হাড় দেখা যাচ্ছে। আর জান বাবা, সব্বাই আমার চেয়ে বেশী খায়। সেজ-জা তো তিনবার ভাত নেয়, অথচ ওই রোগা লিক্‌লিকে চেহারা—"

সন্ধ্যা খবরের কাগজের একটা অংশের উপর আঙুল বুলাইয়া তাহা দিগন্তকে দেখাইল। দিগন্ত তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া পড়িতে লাগিল সেটা। সন্ধ্যা মৃদুকণ্ঠে তাহার কানে কানে কি বলিল, ঠিক বোঝা গেল না।

সূর্যসুন্দর উষাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর ভাসুরপোর বিয়ে বেশ ভালয় ভালয় হয়ে গেল?"

"হ্যাঁ। সে ক'দিন যে খাটুনি গেছে তা আর বলবার নয়। ঝি চাকরের অভাব নেই, কিন্তু কেবল ঘুরতে ঘুরতেই কাবু হ'য়ে পড়েছিলাম আমি। যে দিকে না গেছি, অমনি একটা কাণ্ড হ'য়ে বসে' আছে। পঞ্চাশটা ছোট ছেলেই জুটেছিল বাড়িতে, আর প্রতেকটি ছেলে বায়নাদার। খাও বললেই খাবে না, প্রত্যেকের পিছনে খাবার নিয়ে নিয়ে ঘুরতে হবে। কুটুমের ছেলেদের বকা-ঝকাও যায় না। ওরি মধ্যে আবার শ্বশুরের মামাশ্বশুরের আলাদা

তত্ত্ব। শ্বশুর ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় দশটার সময় খাবেন; চার পাঁচ রকম নিরামিষ তরকারি চাই—ভাজাভুজি, সুক্তো, চচ্চড়ি, ডালনা, অম্বল—রোজ হওয়া চাই। আর মামা-শ্বশুরের আছে কলিক ব্যথা। তিনি ভাত রুটি খাবেন না। কখনও একটু হরলিক্‌স্। কখনও দু' শ্লাইস পাঁউরুটি, কখনও ছানা, কখনও ফলের রস। বাড়িতে পুরোনো ঝি চাকর সবই আছে, কিন্তু আমি নিজে না দাঁড়ালে ঠিক মতো কিচ্ছু হবে না। শাশুড়ি যখন ছিলেন তখন তিনিই এসব করতেন। এখন তিনি নেই, সব ঝক্কি আমার উপর—"

"বউ কেমন হ'ল—"

"ওই হয়েছে একরকম। ওরা তো সবাই বলছে সুন্দর-সুন্দর, আমার কিন্তু বাপু তেমন পছন্দ হয় নি। মানুষ নয় যেন পুতুল। কি রকম ফ্যাল ফ্যাল করে' তাকায়, সরু সরু হাত মুখে একটা মেকি হাসি, প্রাণ নেই যেন। গায়ের রং ঠিক কি তা বোঝবার উপায় নেই, দিন-রাত পেণ্টের উপরই আছে—। তবে জিনিসপত্র দিয়েছে একটি কাঁড়ি, মায় রেডিও পর্যন্ত—"

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাঁহার বাক্যবাগীশ কন্যাটির বাক্য-প্রবাহ উপভোগ করিতেছিলেন। ভাবিতেছিলেন উষার বয়স বাড়িয়াছে, কিন্তু স্বভাব বদলায় নাই। ছেলেবেলায় নিজের পুতুলের সহিতও সে ঠিক এইভাবে অজস্র কথা বলিত।

উষা উর্মিলার দিকে চাহিয়া বলিল, "উর্মিলা, তুমি উঠে চান টান করে' এস না। আমি ততক্ষণ বাবার কাছে বসছি"

উর্মিলা একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাহার উঠিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, মেজদির শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনিতে বেশ লাগিতেছিল।

"আমি বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে তবে যাব। সাড়ে আটটায় ফলের রস খাবেন"

"সে আমি করে' দেব এখন। তুমি চানটা সেরে এস। এর পর বাথরুম খালি পাবে না"

উষা নিজে তখনও স্নান করে নাই। ঊর্মিলাকে সে তাড়া দিতেছিল, সন্ধ্যাকে তাড়া দিয়া পূর্বেই স্নান করাইয়াছে, কারণ নিজে যখন সে বাথরুমে ঢুকিবে তখন বেশ দেরি হইবে তাহার। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগিবে। তাই বাথরুমটা যাহাতে খালি থাকে সেই ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেছে। দিদি বউদির স্নান সকালেই হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যারও হইয়াছে, ঊর্মিলার হইয়া গেলেই সে বাথরুমটা দখল করিবে। স্নান সম্বন্ধে তাহার একটি বিশেষ পদ্ধতি সে তাহার ফয়জাবাদ-প্রবাসিনী পিস্‌শাশুড়ীর কাছে শিখিয়াছে। তাহা অনুসরণ করিয়া ফলও পাইয়াছে। তাহার বুকে-পিঠে ছুলি হইয়াছিল, সারিয়া গিয়াছে। প্রথমে একটা চট্‌চটে কালো তেল মাখিতে হয়, হাকিমি তেল, বিশ্রী গন্ধ। তাহার পর সাবান দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া সেটা উঠাইয়া ফেলিতে হয়। বেশ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। ইহা ছাড়া আরও একটা কাজও সে করে, নিজের কাপড় সায়া ব্লাউস প্রভৃতি নিজের হাতে কাচিয়া আলাদা শুকাইতে দেয়। তাহার ধারণা নোংরা চাকরদের দিয়া কাপড় কাচাইয়াই তাহার উক্ত চর্মরোগটি হইয়াছিল।

ঊর্মিলা বেচারী কি করিবে, উঠিয়া গেল। ঊর্মিলা চলিয়া গেলে সন্ধ্যা দিদির দিকে তাকাইয়া মুচকি হাসিল একটু, হাসিয়া দিগন্তর কানে কানে চুপি চুপি কি বলিল।

"সন্ধ্যা কি বলছে রে দিগন্ত—"

দিগন্ত নিরীহ মুখভাব করিয়া বলিল, "হিন্দু কোডবিল নিয়ে আলোচনা করছি আমরা—"

"তাতে আমার দিকে চেয়ে সন্ধ্যার মুচকি হাসার কি আছে! জানো বাবা, সন্ধ্যাটার আজকাল বড় বাড় বেড়েছে। কাগজের সম্পাদক হ'য়ে ও ধরাকে সরা জ্ঞান করছে—"

সন্ধ্যা আর একবার মুচকি হাসিল, কোন প্রতিবাদ করিল না, দিগন্তর সঙ্গে যেমন নিম্নকণ্ঠে আলাপ করিতেছিল তেমনি করিতে

লাগিল। উষা হয় তো আরও কিছু বলিত কিন্তু মিস বোস প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না। মিস বোসের পুরা নাম অনুপমা বসু। সকলে তাহাকে অনু বলিয়াই ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুমার তাহার জন্য আলাদা একটা ছোট তাঁবু ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে।

অনু আসিয়া চম্পাকে বলিল, "বৌদি, আসুন একটু আমার সঙ্গে এবার—"

চম্পা মৃদুস্বরে বলিল, "এখন থাক—"

অনু দিগন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, "আমি আগেই জানতাম, বৌদি এখানে এসে আর কিছু করতে চাইবেন না। আজও ইউরিণ রাখেন নি—"

চম্পার নত মস্তক আরও নত হইয়া পড়িল।

"চলুন ব্লাড প্রেসারটা নিয়ে নি। আমি কথা দিয়ে এসেছি ওঁদের রোজ রিপোর্ট পাঠাব। কাল পাঠানো হয় নি, আজও হবে না কি। চলুন—"

চম্পার মুখখানা লাল হইয়া উঠিল, লজ্জায় না রাগে ঠিক বোঝা গেল না।

সে আর বাদ-প্রতিবাদ না করিয়া উঠিয়া গেল।

উষা ঠোঁট উলটাইয়া বলিল, "গগনের শাশুড়ি দেখছি একটি মেয়ে দারোগা পাঠিয়ে দিয়েছে সঙ্গে!"

সন্ধ্যা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কাগজ পড়িতেছিল, একথায় তাহার ভ্রূ আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ভালই করেছে। যা করা উচিত তা ঠিক ঠিক হবে। ও না এলে কিচ্ছু হ'ত না"

"ওসব না হলেও কিছু ক্ষতি হ'ত না। আমাদের রোজ ব্লাড প্রেসারও কেউ মাপে নি, পেচ্ছাপও কেউ দেখে নি, অথচ তিন তিনটে সুস্থ ছেলে বেশ নির্বিঘ্নেই হয়েছে। সকলেরই হচ্ছে। ওসব আদিখ্যেতা—"

দিগন্তর চোখের দৃষ্টিতে একটু কৌতুক-মিশ্রিত শঙ্কা ঘনাইয়া আসিল। তাহার ভয় হইল দুই পিসিতে ঝগড়া না বাধিয়া যায়। সে সন্ধ্যাকে চুপি চুপি বলিল, "চল, ও ঘরে যাই—"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বিজ্ঞানের রোজ কত উন্নতি হচ্ছে! যতটা সম্ভব তার সাহায্য নেওয়া উচিত বই কি। যার সামর্থ্য আছে সে কেন নিবে না—"

বাবার সমর্থন পাইয়া সন্ধ্যা তির্যক দৃষ্টিতে দিদির পানে একবার চাহিয়া তাহার পর পাশের ঘরে উঠিয়া গেল। যাইবার পূর্বে বিজয়িনীর মতো আর একবার উষার দিকে চাহিয়া যেন বলিল—শুনলে তো!

উষা কিন্তু হারিবার মেয়ে নয়, সে পুনরায় বলিল, "বিজ্ঞান টিজ্ঞান বুঝিনা, ও সব আদিখ্যেতা। সব খরচ দাদাকেই দিতে হবে, গগনের শ্বশুর একটি আধলা দেবে না, দেখে নিও"

এ আলোচনা কিন্তু আর অধিকক্ষণ চলিল না। ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে গগন প্রবেশ করিল।

"দাদু, আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করে' দেখি"

"দেখ—"

সূর্যসুন্দর মুখে আর কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি যেন বলিয়া উঠিল—সেই আশাতেই তো আছি।

গগন নানারকম যন্ত্রপাতি বাহির করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিল।

পশ্চিম দিকের বারান্দায় তিনটি ক্যাম্প চেয়ারে তিন জামাই বসিয়াছিলেন। গ্রামের যে তিনটি যুবক আসিয়াছিল, যোগেন, রামপ্রসাদ এবং প্রিয়গোপাল, গগন উঠিয়া যাইবার পর তাহারাও একে একে উঠিয়া গেল। ইহারা তিনজনেই শিকারী। কৃষ্ণকান্তের মুখে শিকারের গল্প তাহারা পূর্বে শুনিয়াছিল, আশা ছিল এবারও তিনি কিছু শুনাইবেন। কিন্তু সনানন্দ এবং রঙ্গনাথের সম্মুখে কৃষ্ণকান্ত মুখ খুলিলেন না। বলিলেন, পরে শুনাইবেন। বিলাত-

ফেরত বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে তাঁহার একটু সভয় কৌতূহলও ছিল। তাঁহার ধারণা বিলাত-ফেরত মাত্রেই একটু চালিয়াত হয়, কখনও জ্ঞাতসারে—কখনও বা অজ্ঞাতসারে। স্বদেশবাসীদের, এমন কি স্বদেশের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদেরও তাহারা যেন একটু অনুকম্পার চক্ষে দেখে। তাহাদের বিশ্বাস সাগরপারে গিয়া এবং একটা বিশেষ দেশে বা শহরে কিছুদিন ঘোরা-ফেরা করিয়া তাহারা যেন উচ্চতর শ্রেণীর জীবে রূপান্তরিত হইয়াছে। মুখে এ ভাবটা সকলে প্রকাশ করেনা, কিন্তু কৃষ্ণকান্তের বিশ্বাস মনে মনে ইহারা সকলেই একজাতের। তাই কৃষ্ণকান্ত নীরবে ইহাদের চাল-চলন পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, আসল মৎস্যটি ধরা পড়ে কি না। কৃষ্ণকান্ত একজন শিকারী, শিকারীসুলভ সাবধানতা সহকারে তিনি অগ্রসর হইতেছিলেন।

মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "পাড়াগাঁ কেমন লাগছে তোমাদের। সাহেব মানুষ তোমরা, অসুবিধা হওয়ারই কথা। আর এ একেবারে অজ পাড়া-গাঁ তো—"

রঙ্গনাথ একটু মুচকি হাসিয়া পুনরায় গ্রন্থে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি সকাল হইতেই একটি চীনা গল্প-সংগ্রহে মন দিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকান্তের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দ কিন্তু যাহা বলিলেন, তাহা কৃষ্ণকান্ত প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি একটা মামুলি বিনয়-বচন শুনিবেন আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু যাহা শুনিলেন তাহা মামুলি বিনয়-বচন নহে। তাহাতে একটা আন্তরিকতার সুর ফুটিয়া উঠিল, মেকি মনে হইল না।

সদানন্দ বলিলেন, "পাড়া গাঁয়েই তো চিরকাল বাস করেছি ভাই। বিলাতে তো দিন কতকের জন্যে গিয়েছিলাম পড়াশোনা করবার জন্যে। যে কদিন ছিলাম অতি কষ্টেই ছিলাম। বিলাতে গিয়েই প্রথম বুঝেছিলাম যে মুখে ওরা যত কেতা-দুরস্তই হোক না,

ওটা বাইরের চাকচিক্য মাত্র, আমাদের ওরা কখনও আপন বলে' ভাবতে পারে না। ওদের চোখে সবাই আমরা 'ব্রাউনি'। কি বল হে রঙ্গনাথ।"

রঙ্গনাথ আর একটু মুচকি হাসিলেন।

তাহার পর মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আর আমাদের চোখে ওরা ফিরিঙ্গি—"

সদানন্দ এ উত্তর শুনিয়া দমিলেন না, ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, "ওদের যে আমরা ঘৃণা করি তার একটা সঙ্গত কারণ আছে। আমাদের দেশে ওরা লুটপাট করতে এসেছিল। ডাকাতদের সম্বন্ধে কারও সম্ভ্রম থাকতে পারে না"

রঙ্গনাথ আর একবার হাসিলেন। কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু তাঁহার মনে একটা উত্তর আসিয়াছিল—মারাঠা দস্যুরাও আমাদের দেশকে এই কিছুদিন আগেই তছনচ্ করিয়াছিল, বর্গীদের ভয় দেখাইয়া ছেলেদের যে ঘুমপাড়ানি ছড়া রচিত হইয়াছিল তাহা এখনও প্রচলিত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া মারাঠা বীরদের নাম আমরা সগর্বে উচ্চারণ করি না কি? ফিরিঙ্গিদের মধ্যে যাহা সত্যই ভালো তাহা স্বীকার করিতে ক্ষতি কি। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলিলেন না। তর্কটা তিনি পারতপক্ষে এড়াইয়া চলিতে চান।

সদানন্দ কৃষ্ণকান্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এটা সার বুঝেছি স্বদেশকে ভালবেসেই আনন্দ বেশী। বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল। তাছাড়া পুরোপুরি স্বদেশী না হতে পারলে আমরা বাঁচতেও পারবো না। পরের দ্বারে হাত পেতে কতদিন চলবে। স্বদেশী হবার জন্যে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, কৃচ্ছ্রসাধন করতে হয় তা-ও করতে হবে—"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় রঙ্গনাথের দিকে চাহিলেন, কিন্তু সেদিক হইতে আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তিনি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটাইয়া পুস্তকের দিকেই নিবদ্ধ-দৃষ্টি হইয়া রহিলেন। কৃষ্ণকান্ত

বুঝিলেন—এ ছোকরা বেশ চতুর। চিতা-বাঘের মতো প্রকৃতি। সদানন্দের কথা শুনিয়া কিন্তু কৃষ্ণকান্ত আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন। কৃষ্ণাকান্ত স্বদেশী বক্তৃতায় ভুলিবার লোক নন। তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে আমাদের দেশে স্বদেশীর ধুয়া প্রধানত বিলাত-ফেরতরাই তুলিয়াছেন, কিন্তু ইহাও তাঁহার ধারণা যে ওটা তাহাদের আহত অহঙ্কারের আস্ফালন মাত্র। ওটা মুখোশ, আর ওই মুখোশের তলায় আছে নানাজাতের লোভ এবং মোহ। তাই তাঁহাদের মুখের বুলি সহজে কাহারও অন্তর স্পর্শ করে না। এদেশের লোক অধঃপতিত বটে, কিন্তু আসল নকলের প্রভেদ তাহারা বোঝে। শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে চিনিতে তাহারা ভুল করে নাই। কৃষ্ণকান্তের মতে শ্রীরামকৃষ্ণই আধুনিক যুগের প্রবর্তক এবং একমাত্র স্বদেশী নেতা। সদানন্দের কথার সুরে তিনি কিন্তু বিস্মিত হইলেন, সুরটা মেকি মনে হইল না।

সদানন্দের মানসিক জগতের খবর রাখিলে তিনি এতটা বিস্মিত হইতেন না। সদানন্দের মানসিক জগতে বারবার ঋতু পরিবর্তন হয়। যখন প্রথমে তিনি বিলাত হইতে ফেরেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল সাহেবী-কেতায় ব্যবসায় না করিলে প্রকৃত ব্যবসা করা যায় না। তিনি নিজের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তাই নাম রাখিয়াছিলেন 'চ্যাটো ইনডাস্'। তিনি নিজে চট্টোপাধ্যায় এবং ভারতবর্ষীয়, ফার্মের নামে ইহাই তিনি বিলাতী ঢঙে প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন। ফার্মের নাম এখনও তাহাই আছে, কিন্তু তাঁহার মনের ঋতু-পরিবর্তন হইয়াছে। পুরাপুরি স্বদেশী না হইতে পারিলে আত্মসম্ভ্রম বজায় থাকে না, আনন্দও পাওয়া যায় না—এই কথা ভাবিয়া এখন তিনি সুখ পাইতেছেন এবং ইহার স্বপক্ষে নানাবিধ যুক্তি আহরণ করিতেছেন। গত বৎসর ফার্মের নাম বদলাইয়া তিনি "চট্ট-ভারতী" করিবেন ঠিক করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দাদারা তাহা করিতে দেন নাই। অনেক বিষয়েই তাঁহার মত বদলাইয়াছে। পূর্বে তিনি বিদেশী জিনিস এদেশে

আনিয়া বিক্রয় করিতেন, এখন তিনি এদেশের জিনিস বিদেশে বিক্রয় করিবার আয়োজন করিতেছেন। এদেশের তাঁতের কাপড়, শাল, রেশমবস্ত্র প্রভৃতি বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনে এবং প্যারিতে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে তিনি বিলাতী-ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহার মত বদলাইয়াছে। এখনও তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী, কিন্তু স্বাধীনতার ছুতায় প্রগলভলতা প্রশ্রয় দিতে চান না। বিদেশের পার্কে, মিউজিকহলে, ক্যাবারেতে যে সব দৃশ্য একদিন তিনি সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন সে সব দৃশ্য আমাদের দেশে দেখিতে তিনি আর প্রস্তুত নহেন। এখন তাঁহার মানসিক জগতে যে ঋতুর রাজত্ব রঙে রসে তাহাতে স্বদেশীয়ানারই প্রভাব। হয়তো এ ঋতুও বেশী দিন থাকিবে না, আবার নূতন কোন ঋতুর আবির্ভাব হইবে নূতন ভাবের পশরা বহিয়া। কৃষ্ণকান্ত এত খবর জানিতেন না, তাই একটু বিস্মিত হইলেন। তবু একটু টিপ্‌পনি কাটিতে ছাড়িলেন না।

"তোমার ও কৃচ্ছ্রসাধন কথাটা থেকে কিন্তু মনে হচ্ছে যে তোমার কষ্ট হচ্ছে"—

"কিছুমাত্র না। খুব ভাল লাগছে আমার এখানে। আর কিছু না হোক, কান আর চোখ বিশ্রাম পেয়েছে। এতদিন শহরের মাপা জলে স্নান করেছি, এখানে অবগাহন হচ্ছে। রঙ্গনাথেরও নিশ্চয়ই তাই মনে হচ্ছে—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "যে কোনও পরিবর্তনই আমার ভাল লাগে"

হাস্যদীপ্ত চক্ষে কৃষ্ণকান্তের দিকে এক নজর চাহিয়া আবার চীনা-গল্পে মনোনিবেশ করিলেন। কৃষ্ণকান্তের পুনরায় চিতাবাঘের কথা মনে হইল। তিনি পুনরায় প্রশ্নের একটি টোপ ফেলিবেন কিনা ভাবিতেছিলেন, কিন্তু বাধা পড়িল। দাদুর পরীক্ষা শেষ করিয়া গগন আসিয়া প্রবেশ করিল।

"কেমন দেখলে দাদুকে ছোট ডাক্তারবাবু"

"ভালই। হার্ট বেশ ভালো। তবে রক্তটা পরীক্ষা করতে হবে। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় চলে যাক কেউ"

"কুমারকে বল—"

"ছোটকাকা কোথা"

"মাঠে গেছে শুনলাম"

"আচ্ছা আসুক"

সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিলেম।

সকলে মনে করিল তাঁহার ঘুম আসিয়াছে, কথা বলিয়া আর বিরক্ত করা উচিত নয়। এক উর্মিলা ছাড়া আর সকলে একে একে উঠিয়া গেল। উর্মিলা চুপ করিয়া তাঁহার মাথার শিয়রে বসিয়া রহিল। সে-ও ক্রমশ ঢুলিতে লাগিল। একবার ঝুঁকিয়া দেখিল, বাবা ঘুমাইয়াছেন কি না। তাঁহার নিমীলিত চক্ষু দেখিয়া মনে হইল ঘুমাইতেছেন। তখন সে-ও শিয়রের দিকে যে জায়গাটুকু ছিল তাহারই একধারে সন্তর্পণে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। চোখ বুজিয়া মনে মনে তিনি অদ্ভুত একটা ছবি দেখিতেছিলেন। প্রকাণ্ড একটা পথ যেন পূর্বদিগন্ত হইতে আসিয়া পশ্চিমদিগন্তের দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের আদি-অন্ত কিছু নাই। সেই পথে তিনি যেন একা চলিতেছেন। তাঁহার পিছন দিক হইতে মাঝে মাঝে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে। মামার, মামীর, দিদিমায়ের, মায়ের, মন্মথর, রাজেশ্বরীর, বাবার, পৃথ্বীশের, আরও অনেকের। মনে হইতেছে অনেকদূর হইতে যেন ভাসিয়া আসিতেছে, তিনি মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছেন না। সম্মুখ দিকেল কেহ নাই। কেবল পথ, দিগন্তবিস্তৃত পথ, সর্পিল রেখায় আঁকিয়া বাঁকিয়া পশ্চিম-দিগন্তে বিলীন হ্ইয়া গিয়াছে। সে পথে একা তিনি যাত্রী। দুইদিকে ধূ ধূ করিতেছে প্রান্তর, প্রান্তরও দিগন্তপ্রসারী। কিছুক্ষণ পথ

চলিবার পর সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, পশ্চিমদিগন্ত হইতে ওই পথ ধরিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। কৃষ্ণবর্ণ একটি মনুষ্যমূর্তি। ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। সহসা তাঁহার মনে হইল, ওই কি কৃষ্ণ? তখনই মনে হইল কৃষ্ণ তাঁহার কাছে আসিবেন কেন, তাঁহাকে তো জীবনে তেমন করিয়া কখনও ডাকি নাই। তবে ও কি মৃত্যু? নিষ্পলক নয়নে সূর্যসুন্দর সে দিকে চাহিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে আসিতেছে, কিন্তু আসিতেছে…।

কুমার মাঠে গিয়াছিল। মাঠের কুঁড়ে ঘরটিতে বসিয়া সে সূর্যসুন্দরের জীবন-স্মৃতি পড়িতেছিল। চতুর্দিকে ফাঁকা মাঠ। রবি-ফসল বুনিবার সময়, কোথাও জমিতে লাঙল দেওয়া হইতেছে, কোথাও বা বীজ ছিটাইতেছে। দূরে একটা জমিতে কিছু আখ ছিল, কয়েকটি চাকর তাহা কাটিয়া কাটিয়া একধারে স্তূপীকৃত করিতেছে। কুমার মাঝে মাঝে সেদিকে চাহিয়া দেখিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ছিল বাবার 'জীবন-স্মৃতি'তে। তাহার মনে হইতেছিল বাবার অসুখের পটভূমিকায় তাঁহার অতীত জীবন-চিত্রটা অদ্ভুতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে—শিশু সূর্যসুন্দর এবং বৃদ্ধ সূর্যসুন্দর যেন এক বিছানায় পাশাপাশি শুইয়া আছেন। সাগ্রহে সে পড়িতেছিল।

"সাহেবগঞ্জে আমাদের রাখিয়া বাবা পুনরায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। সাহেবগঞ্জে পৌঁছিয়া দিন সাতেক ছিলেন তিনি। অধিকাংশ সময়ই বাগচী মহাশয়ের বাসায় গান-বাজনা লইয়া থাকিতেন; খাইবার সময় এবং শুইবার সময় অনেক ডাকাডাকি করিয়া তবে তাঁহাকে বাড়িতে আনিতে হইত। একদিন কাহাকেও কিছু না বলিয়া পুনরায় তিনি অন্তর্ধান করিলেন। দিদিমার অশ্রুধারা পুনরায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। মা-কে কোনদিন কাঁদিতে দেখি নাই। কিন্তু তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। ক্রমে ক্রমে তিনি যেন পাষাণ-প্রতিমার মতো হইয়া গেলেন। যন্ত্রচালিতবৎ ঘরের কাজ করিয়া যাইতেন, কোনও কথা বলিতেন না। তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষিণী ছিলেন, আরও যেন নীরব হইয়া গেলেন।

ইহার আরো একটা কারণ বোধহয় ছিল। দেশের বাড়িতে মা-ই ঘরের গৃহিণী ও সর্বেসর্বা ছিলেন। সাহেবগঞ্জে আসিয়া কিন্তু মামীমার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইল। কারণ ইহা বেশ বোঝা যাইত যে মামা যদিও মুখে খুব 'দিদি' 'দিদি' করিতেন, দিদিকেই গৃহের সর্বময়ী কর্ত্রী বলিয়া অভিমত করিতেন, কিন্তু চাবিকাঠিটি ছিল মামীরই হাতে। সংসারে যে পুরুষ উপার্জন করে স্বভাবত তাহার স্ত্রীরই সেই সংসারে প্রতিপত্তি হয়। আজকাল খোলাখুলি ভাবেই হয়, সেকালে লোক-দেখানো ভব্যতার একটা আবরণ থাকিত। আবরণ সত্ত্বেও কিন্তু বোঝা যাইত। আমি তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, আমিও তাহা অনুভব করিতাম নিজের আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এবং নিজের ভাগ্যকে মানিয়া লইয়া মা যে ভাবে মামার সংসারে থাকিতেন তাহার তুলনা বড় একটা মেলেনা। তাহা বর্ণনা করিয়া বোঝানও শক্ত। নিজের জন্য বা আমার জন্য মা কখনও কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিতেন না। কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে গভীর রাত্রে গোপনে সেলাই করিয়া লইতেন, তবু বলিতেন না যে কাপড় কিনিয়া দাও। দিদিমার দৃষ্টিশক্তি ক্রমশই ক্ষীণ হইয়া যাইতেছিল, তিনি ভাল করিয়া দেখিতেই পাইতেন না। মামীমা মায়ের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছিলেন, নিজে বেশ সাজিয়া গুজিয়া থাকিতেন, মাকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও কিছু কিনা দিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না। তাঁহার ভাবটা ছিল—দিদিই তো কর্ত্রী, তিনি যাহা করিবেন তাহাই হইবে, আমার উপড়-পড়া হইয়া কিছু করিতে যাওয়া কি ভালো? মা কিন্তু নিজের জন্য কিছুই করিতেন না। সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছু-দিন পর হইতে মায়ের মুখভাবে অপূর্ব একটা আত্মসমাহিত ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মায়ের সে মুখভাব আমি কখনও ভুলিব না। দুঃখ এই যে আমার ছেলে-মেয়েরা তাহা দেখিল না, কখনও দেখিবেও না। তাঁহার কোনও ছবি নাই। তখন ফোটো তোলার রেওয়াজ অবশ্য প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু আমার মায়ের বা বাবার

ফোটো তোলানো সম্ভবপর হয় নাই। বাবা কোথাও বেশীদিন থাকতেন না, ফোটো তোলাইবার সুযোগ উপস্থিত হইলেও তিনি রাজি হইতেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মনোভাবই অন্যপ্রকার ছিল। তিনি সুরূপ শক্তিমান লোক ছিলেন, কিন্তু শরীর লইয়া কোন-প্রকার আস্ফালন তিনি পছন্দ করিতেন না। মায়েব ফোটো-তোলান হয় নাই, কারণ তখন মামার বাড়িতে পরদা-প্রথার বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। রাস্তা দিয়া সমারোহে শোভাযাত্রা গেলেও বাড়ির মেয়েরা জানলার ধারে বা বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহা দেখিবার অনুমতি পাইত না। অপরিচিত ফোটোগ্রাফারের সম্মুখে মুখের কাপড় খুলিয়া বসিবার কথা কেহ চিন্তাও করিতে পারিত না। যাহারা পারিত তাহাদের অভিনেত্রীর বা কুলটার সমপর্যায়ে ফেলিয়া রক্ষণশীলেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। তখন ঘরে ঘরে ক্যামেরারও এত ছড়াছড়ি ছিল না। প্রতি শহরে এত ফটোগ্রাফারও ছিল না। তখন একমাত্র কলিকাতাতেই বোধহয় পেশাদার ফটোগ্রাফাররা কিছু অর্থোপার্জন করিতেন।

সাহেবগঙ্গে মামা বেশ পশার জমাইয়াছিলেন। প্রত্যহ অনেক রোগী তাঁহার ডিস্‌পেনসারিতে আসিত। তিনিও প্রায় প্রত্যহ বাহিরে রোগী দেখিতে যাইতেন, কখনও মিরজাচৌকিতে, কখনও পীরপৈঁতিতে, কখনও সকরিগলিতে। গঙ্গার ওপারেও তাঁহার নাম ডাক হইয়াছিল, সেখানকার অনেক গ্রাম হইতেও তাঁহাকে ডাকিতে আসিত। নৌকা করিয়া যাইতেন, কখনও কখনও একাধিক দিন তাঁহাকে বাহিরে থাকিতে হইত। মোট কথা, তিনি ও অঞ্চলে বেশ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা যখন গেলাম তখন মামা ভাড়াটে বাড়িতে ছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি নূতন বাড়ি কিনিলেন। সেই বাড়িতে আমরা উঠিয়া গেলাম। গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে খুব ধুমধাম করিয়া অনেক লোক খাওয়ানো হইয়াছিল।

সেই সময় সাহেবগঞ্জের বাঙালী পরিবারের অনেককে দেখিলাম, অনেকের সহিত পরিচয়ও হইল।

সাহেবগঞ্জ মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বরদাবাবু সপরিবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার তিনপুত্র আনন্দ, মন্মথ এবং বসন্ত। মন্মথ আমার সমবয়সী ছিল। যখন দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইলাম তখন দেখিলাম সে আমার সহপাঠীও। বসন্তর তখন সবে হাতে-খড়ি হইয়াছে। আনন্দ-দা পাঠশালার পড়া শেষ করিয়া মাইনর স্কুলে ভরতি হইয়াছেন। ঘটক পরিবারের এবং বাগচী পরিবারের সকলেও আসিয়াছিলেন। ডাক্তার সুরথবাবুও সে উৎসবে সপরিবারে যোগদান করিয়াছিলেন। অভিভাবকের মতো তিনি আসিয়া সব দেখাশোনা করিতেছিলেন। বস্তুত, তাঁহারই আনুকূল্যে মামার পশার এত শীঘ্র বাড়িয়াছিল। মামার নূতন বাড়িটিও তিনি চেষ্টা করিয়া শস্তায় কিনাইয়া দিয়াছিলেন। ইঁহারা ছাড়া সাহেবগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের কর্ম্মচারীরা, পোস্টমাস্টারবাবু, থানার দারোগা ও কনেষ্টবলগণ. মামার রোগীদের আত্মীয়-স্বজনেরা, স্কুলের পাঠশালার শিক্ষকেরা, সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন। আনন্দে উৎসবে সমস্ত বাড়িটা যেন গমগম করিতেছিল।

সেই সময়ই দীনুপণ্ডিতকে আমি প্রথম দেখিয়াছিলাম। দেখিয়া একটু অবাক হইয়া গিয়াছিলাম। ও রকম ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং অত লম্বা লোক আমি ইতিপূর্বে দেখি নাই। তিনি বারন্দার একধারে একটি বেঞ্চির উপর বহুক্ষণ আগেই আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং শহরের কোনও গণ্যমান্য লোক আসিলেই দাঁড়াইয়া উঠিয়া খুব ঝুঁকিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাঁহার গায়ে কোনও জামা ছিল না। কাঁধে একটি সাধারণ চাদর, পরনে থান কাপড় এবং পায়ে একজোড়া লাল চটি-জুতা। বাঁ হাতে কনুইয়ের ঠিক উপরে কালো সুতা দিয়া একটি মাদুলি বাঁধা ছিল, মাথায় টিকিও ছিল। মাথার চুল কদম ছাঁট। দীনু পণ্ডিতকে এই বেশেই বরাবর দেখিয়াছি।

তাঁহার চেহারার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। দুইটি চোখেরই বাহিরের কোণে শাদা পিঁচুটি জমিয়া থাকিত। তিনি কেন যে তাহা পরিষ্কার করিতেন না, জানি না। সেকালে অনেকে দাড়ি কামাইত, কিন্তু যুগপৎ গোঁফদাড়ি কামানো প্রথা তখনও প্রচলিত হয় নাই। পিতৃমাতৃ বিয়োগের পর অবশ্য শ্রাদ্ধের সময় সকলে মাথার চুলের সহিত গোঁফ-দাড়িও কামাইয়া ফেলিত, কিন্তু নিয়মিতভাবে ক্লিন-শেভড্ হইবার আগ্রহ কাহারও তেমন ছিল না ঃ দীনু পণ্ডিতের মুখে গোঁফ-দাড়ি না দেখিয়া আমি ভাবিলাম—সম্ভবত উঁহার কোন আত্মীয় বিয়োগ হইয়াছে। কিন্তু একটু পরেই জানিতে পারিলাম, তিনি মাকুন্দ এবং জাতিতে কৈবর্ত। দীনু পণ্ডিতের বর্ণনা একটু বিশদ করিয়া দিলাম, কারণ তাঁহার স্মৃতিটা এখনও মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করিতেছে। শৈশবে তাঁহার হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছি ; যদিও দিদিমা আমার সহায় ছিলেন, তবু তাঁহার প্রবল প্রকোপ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব ছিল, কেহই পাইত না। সেইদিনই বরদাবাবুর মেজছেলে মন্মথর সহিত আমার আলাপ হইল। আলাপ হৃদ্যতায় পরিণত হইতে বেশী দেরি হইল না। সেই আমাকে আড়ালে ডাকিয়া দীনু পণ্ডিতকে দেখাইয়া বলিল, "ওই লোকটিকে চিনে রাখ। কিছুদিনের মধ্যেই ওর খপ্‌পরে পড়তে হবে তোমাকে"

"উনি কে—"

"দীনু পণ্ডিত। এখানকার পাঠশালায় পড়ায়"

"গোঁফদাড়ি কামানো কেন"

"শালা মাকুন্দ, জাতে কৈবর্ত"

আমি বিস্মিত হইয়া গেলাম। পাঠশালার পণ্ডিতকে 'শালা' বলিতেছে। দীনু পণ্ডিতের সঙ্গে পরে যখন ঘনিষ্ঠতর পরিচয় হইল তখন এই বিস্ময়ভাবটা আর রহিল না। অনেকে তাহাকে আরও অশ্লীলভাষায় গালাগালি দিত্য। সত্যই লোকটি নর-রূপী পশু ছিল। ছাত্রদের চরিত্র সংশোধন করিবার জন্যই শিক্ষকেরা শাস্তি

দেন। দীমু পণ্ডিত কিন্তু শাস্তি দিতেন বড়লোকদের খোশামোদ করিবার জন্য; কথাটা অদ্ভুত শুনাইতেছে, কিন্তু কথাটা সত্য। সাধারণত বড় গভর্নমেণ্ট অফিসার বা রেলওয়ে অফিসারদের খোশামোদ করিতেন তিনি। রেলি কোম্পানীর বড়বাবু মুকুন্দবাবুকেও এবং থানার দারোগা কার্তিকবাবুকেও করিতেন। তখন এস-ডি-ও ছিলেন সুধাকান্ত সেন এবং ডি-টি-এস আপিসের বড়বাবু ছিলেন জগন্ময় রায়। দীমু পণ্ডিত ইঁহাদের গোলাম ছিলেন। কোনও কারণে ইঁহাদের মধ্যে কেহ যদি শহরের কাহারও উপর অপ্রসন্ন হইতেন দীমু পণ্ডিত তাহার শোধ তুলিতেন তাহাদের ছেলেদের পিঠের উপর! অর্থাৎ বড় অফিসারদের শত্রু দীমু পণ্ডিতেরও শত্রু স্থানীয় ছিল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদের শাসন করিবার ক্ষমতা দীমু পণ্ডিতের ছিল না, তিনি নির্যাতন করিতেন তাঁহাদের ছেলেদের। মন্মথর বাবা বরদাবাবু মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বলিয়া দীমু পণ্ডিত তাঁহাকে খোশামোদ করিতেন। সুতরাং মন্মথ এবং বসন্ত তাঁহার বেত্রাঘাত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। মন্মথ কিন্তু তাঁহার স্বরূপ চিনিত, কারণ চেয়ারম্যান হইবার পূর্বে বড়দাবাবুর সহিত কার্তিকবাবুর ঝগড়া হয়। বরদাবাবু তেজস্বী লোক ছিলেন। কার্তিকবাবু একটি লোককে অন্যায়ভাবে গ্রেফ্তার করাতে বড়দা-বাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। এই লইয়া শহরে কিছুদিন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, বরদাবাবু সেই লোকটির পক্ষ অবলম্বন করিয়া মকোর্দমা পর্যন্ত লড়িয়াছিলেন এবং মকোর্দমায় জয়লাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু এজন্য বেচারা মন্মথকে দীমু পণ্ডিতের পাঠশালায় প্রত্যহ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল। দীমু পণ্ডিত যে বড়লোকদের খোশামোদ করিতেন তাহার একটা সঙ্গত কারণও ছিল। অপোগণ্ড পাঁচটি পুত্র ছিল তাঁহার। একটিও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নাই। তাহাদের কোথাও কোনও কাজে ঢুকাইয়া দিবার জন্য তিনি সর্বদা সচেষ্ট থাকিতেন। একজন আবগারি

কমিশনারকে খোশামোদ করিয়া বড় ছেলেটিকে আবগারি বিভাগে ঢুকাইতে সক্ষমও হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় পুত্র শামুক আমাদের সঙ্গে পড়িত। তাহারও লেখাপড়ায় তেমন মাথা ছিল না, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছিল। সে খুব ভালো ম্যাজিক দেখাইতে পারিত। ক্যারিকেচার করিবার ক্ষমতাও ছিল তাহার। পরবর্তী জীবনে এই সব করিয়াই জীবিকা অর্জন করিত সে।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আমার সময়সী অনেক বাঙালী ছেলের সহিত আলাপ হইয়াছিল। বিশেষ করিয়া মন্মথর সহিত বন্ধুত্বটা একদিনেই যেন জমিয়া গেল। এ বন্ধুত্ব বরাবর অক্ষুণ্ণ ছিল।

সেদিনের আর একটি ঘটনাও আমায় স্মৃতি-পথে এখনও জাগরূক আছে। আমার বিবাহের ঘটক শিবু ঘটকের দাদা মধু ঘটক সাহেবগঞ্জে গোলাদারি কারবার করিতেন ইহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহারই পরামর্শে মামা সাহেবগঞ্জে আসিয়া বসিয়াছিলেন, কিছুদিন ইঁহার বাড়িতেও ছিলেন। এই মধু ঘটককে সেদিন আমি প্রথম দেখিলাম এবং তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম।

মধু ঘটকের চেহারা ছিল পাতলা ছিপছিপে লম্বা ধরনের। পরনে হাতকাটা লংক্লথের ফতুয়া এবং শাদা থান। কানে খড়কে গোঁজা। মাথার চুলগুলি ঘননিবদ্ধ নয়, যে গুলি আছে তাহাও পাকা, কিন্তু সুবিন্যস্ত। পাকা সরু গোঁফটিও সুরক্ষিত। চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, চোখের তারা নীল, চোখের দৃষ্টি খুব উজ্জ্বল এবং মর্মভেদী। মুখটিও ছোট, কিন্তু মুখের ভাব বেশ গম্ভীর। সর্বদাই যেন ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আছেন, দুনিয়াটাকে সর্বদাই যেন ঈষৎ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন। মন্মথই সেদিন দূর হইতে মধু ঘটককেও চিনাইয়া দিয়াছিল। বলিয়াছিল, "ওই ঘটক মশাই। লোক খুব সাঁচ্চা, কিন্তু বড় তিরিক্ষে। ওর কাছে পারতপক্ষে আমরা ঘেঁসি

না। দেখা হলেই পড়া জিগ্যেস করেন, না পারলে বকেন। ব্যাকরণ-ট্যাকরণ এখনও সব মুখস্থ—"।

একটু পরেই শুনিতে পাইলাম পাশের ঘরে মামার সহিত মধু ঘটক কথা বলিতেছেন।

"রান্না বান্না কি সব রাঁধুনী বামুনই করছে"—মধু ঘটক মামাকে প্রশ্ন করিলেন।

"কোলকাতা থেকে চার জন রাঁধুনী আনিয়েছি। এখানকার জন দুই আছে। উমেশ আর দুনিয়ালাল"

"এত হৈ হৈ না করলেই পারতে। বৌমা চারটি শাকান্ন রেঁধে দিলে আমরা তৃপ্তি করে' খেতাম। আচ্ছা, আমি এখন উঠি তাহলে। কাল আবার আসব"

"আপনি খেয়ে যাবেন না?"

"না, আমি রাঁধুনী বামুনের হাতে খাই না। থাক্, আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি তো ঘরের লোক"

"না, না, সে কি হয়। আজকের দিনে আপনি না খেয়ে গেলে আমাদের অকল্যাণ হবে যে। খেতে হবে আপনাকে—"

"নিতান্তই যদি না ছাড় তাহলে বৌমাকে একটু আলাদা করে' চারটি ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে বল। বেশী কিছু হাঙ্গামা কোরো না যেন—"

তাহাই হইল। উৎসবের দিন মামীমা শৌখীন কাপড় গহনা পরিয়া সাজিয়া-গুজিয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। মামার আদেশে তাঁহাকে সে সব ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিতে হইল। মামা নিজে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া রান্নাঘরটি গোবর এবং গঙ্গাজল দ্বারা পরিশুদ্ধ করাইলেন। মামীমাকে সেই স্যাঁতসেঁতে রান্নাঘরে বসিয়া ঘটক মহাশয়ের জন্য নিরামিষ পঞ্চ ব্যঞ্জন ও মিহি আতপ চালের ভাত রান্না করিতে হইল। আমার মা অবশ্য তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মা-ই অনায়াসে সব রাঁধিয়া দিতে পারিতেন,

কিন্তু ঘটক মহাশয় যখন মামীমার নাম করিয়া বলিয়াছেন তখন মামীমাকেই রাঁধিতে হইল। রান্না তত ভাল হয় নাই, কিন্তু ঘটক মহাশয় অজস্র প্রশংসা করিতে করিতে আহার করিলেন। ঘটক মহাশয়ের চারিত্রিক অনমনীয়তার আরও পরিচয় পরে পাইয়াছিলাম। তিনি লোক খুব ভালো ছিলেন। নিজের মতে নিজের পথে চলিতে চাহিতেন, কোনও কারণেই তাঁহাকে স্বমতের বিরুদ্ধে লওয়া যাইত না।

সেদিন আরও দুইটি অদ্ভুত ধরনের চরিত্র দেখিয়াছিলাম মনে পড়িতেছে। দুইজনেই স্ত্রীলোক। একজন ভৈরবী-মা, আর একজন সিপাহী-ঠাকরুণ। ভৈরবী-মা কোথা হইতে আসিয়াছিলেন, মামার সহিত তাঁহার কি সূত্রে পরিচয় তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম। শুধু আমি কেন অনেকেই। সে চেহারার অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল। টক্‌টকে গৌরবর্ণ মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা, হাতে ত্রিশূল, পরিধানে গৈরিক, কপালের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের টিপ। সম্ভবত পূর্বে নাকছাবি পরিতেন, ডান নাকের পাতায় একটি ছিদ্র ছিল। আমি যখন তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাঁহার দেহে কোনরূপ অলংকার বা বিলাসের কোন নিদর্শন ছিল না। তাঁহার সৌম্যমূর্তি আমাকে বিস্মিত করিয়াছিল ; পরে তিনি আমার জীবনে আরও কয়েকবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনের সেই বিস্ময়ভাব কখনও কাটে নাই। তিনি আজও আমার নিকট প্রহেলিকার মতো রহস্যপূর্ণ। তিনি একটু খোঁড়াইয়া হাঁটিতেন, ডান পায়ের কয়েকটি আঙুল বাঁকা ছিল, শুনিয়াছিলাম কেদার-বদরি তীর্থ করিতে গিয়া তাঁহার পায়ে আঘাত লাগিয়াছিল, তাহার ফলেই আঙুলগুলি বাঁকিয়া গিয়াছে। তাঁহার আর একটি বৈশিষ্ট্যও সেদিন লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তিনি সর্বদা আকাশের তলায় থাকিতেন। ঘরে, এমন কি ঢাকা বারান্দাতেও থাকিতেন না। গ্রীষ্মকালের দিনে গাছের ছায়ায় থাকিতেন,

শীতকালে রাত্রে ছোট একটু ধুনী জ্বালাইয়া লইতেন। খাওয়ারও বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও রান্না জিনিস খাইতেন না। সাধারণত ফল মুল কাঁচা তুধই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। দ্বিপ্রহরে একবার মাত্র আহার করিতেন, তাহাতেই তাঁহার স্বাস্থ্য অতি সুন্দর ছিল।

মামা আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গিয়া বলিলেন, "এইটি আমার ভাগ্না"

"ও, কেদারের ছেলে ?"

"হ্যাঁ"

মামার আদেশে তাঁহাকে আমি প্রণাম করিলাম। তিনি আমার মাথার উপর দক্ষিণ হস্তটি অনেকক্ষণ রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার পর বলিলেন, "এ লক্ষণযুক্ত ছেলে, উন্নতি করবে"

মামা আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখ, এঁর জন্যে ফল আনা হয়েছে কি না"

তাঁহার জন্য নানাবিধ ফল আসিয়াছিল। সেগুলি একটি ছোট ঝুড়ি করিয়া লইয়া আসিলাম। আসিয়া শুনিলাম মামা বলিতেছেন, "জামাইবাবু কোথায় যে চলে গেলেন আবার। একটা চিঠি পর্যন্ত লেখেন নি"

ভৈরবী মৃত্যু হাসিয়া বলিলেন, "ও তো সংসারে থাকবার লোক নয়। তবে আসবে আবার। ওর ভোগ কিছুদিন আছে এখনও"

মামা আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তুমি যাও"

আমি পুনরায় চলিয়া গেলাম। মামা ভৈরবী-মায়ের সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। আমার মনে হইল ভৈরবী-মা বাবাকে যখন চেনেন তখন হয়তো তাঁহার সহিত নিগূঢ় কোন যোগাযোগও আছে। কিন্তু কি প্রকার যোগাযোগ তাহা বুঝিবার সামর্থ্য আমার তখন ছিল না।

সিপাহী ঠাক্‌রুণের সহিতও সেদিন কিঞ্চিৎ পরিচয় হইয়াছিল। মন্মথই পরিচয় করাইয়া দিয়াছিল।

"ওই দেখ, সিপাহী ঠাক্‌রুণ। জানিস, ও মেয়েমানুষ—"

"মেয়েমানুষ! তাই না কি"

"হ্যাঁ, লুকিয়ে পুলিসে কাজ করত, ধরা পড়ে' গেছে"

প্রকাণ্ড লম্বা-চওড়া লোকটিকে মেয়েমানুষ বলিয়া মনে করা সত্যই শক্ত। পোষাকও পুরুষের পোষাক, ঢিলাহাতা, গেরুয়া-রঙের আজানুলম্বিত পাঞ্জাবী এবং লুঙ্গি, মাথায় হলুদরঙের প্রকাণ্ড পাগড়ি। পাগড়ির লেজটি বেণীর মতো পিঠের উপর ঝুলিতেছে। পায়ে নাগরা জুতা, হাতে একটি বেঁটে মোটা লাঠি, লাঠির প্রত্যেকটি গাঁটে পিতলের তার-জড়ানো, চোখে গগলস্। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকরুণ না কি পুরুষের ছদ্মবেশে মিলিটারিতে ভরতি হইয়াছিল, ভরতি হইবার সময় কেহ তাহাকে স্ত্রীলোক বলিয়া সন্দেহ করে নাই। তাহার পর কোথায় যেন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধে উরুতে গুলি লাগিয়া সিপাহী ঠাক্‌রুণ যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। স্টেচারে করিয়া তাঁহাকে হাসপাতালে লইয়া গেল, সেখানে বোঝা গেল যে তিনি স্ত্রীলোক। তাঁহার বীরত্বে সাহেব-জেনারেল খুব খুশী হইয়া ছিলেন, তাঁহার একটা মোটা রকম পেন্‌সন বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। সেই পেনসন লইয়া সিপাহী ঠাক্‌রুণ এখানকার থানার জমাদার পাঁড়েজির বাসায় থাকেন। পাঁড়েজি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র। মন্মথ বলিল—সিপাহী ঠাকুরুণ কনেষ্টবলদের সঙ্গে রাত্রে রোঁদও দেন। কিছুদিন আগে একটা চোরকে হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। অত্যন্ত কড়া মেজাজের লোক, কিন্তু ছোট ছেলেদের খুব ভালবাসেন।

বাংলাও বলিতে পারেন, মাঝে মাঝে দু একটা ইংরাজি কথাও বলেন। ড্যাম, স্টুপিড, ভেরী গুড—এই তিনটি কথা প্রায়ই তাঁহার মুখে শোনা যায়। আর একটা আশ্চর্যজনক কথাও মন্মথ সেদিন বলিয়াছিল।

"ওই দীন্নু পণ্ডিতও ওঁকে ভয় খায়। যতু বলে' একটা ছেলে আমাদের সঙ্গে পড়ে। তাকে দীন্নু পণ্ডিত খুব মেরেছিল, অথচ বেচারার তেমন কোন দোষ ছিল না। যতু বেচারা কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যাচ্ছিল, রাস্তায় সিপাহী ঠাক্‌রুণের সঙ্গে তার দেখা। সিপাহী-ঠাকরুণ সব কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর তার কান আর পিঠ দেখলেন। কালো রক্তাক্ত পিঠে বেতের দাগ। তখন কিছু বললেন না। কিন্তু সেই দিন রাত্রেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দীন্নু পণ্ডিতের বাসায়। দীন্নু পণ্ডিতকে কান ধরে পঁচিশবার উঠবোস করিয়ে ছিলেন।"

মন্মথর এ উক্তি কতদূর সত্য তাহা জানি না। মন্মথর কথা বাড়াইয়া বলিবার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ পরে পাইয়াছি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ছিল সে কিন্তু দীন্নু পণ্ডিত যে সিপাহী-ঠাকরুণকে ভয় করিতেন, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের পাঠশালা ভিজিটও করিতেন, অর্থাৎ মহসা কোন কোন দিন পাঠশালার সামনের রাস্তায় দাঁড়াইয়া পাঠশালার দিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। সিপাহী ঠাকরুণকে ওই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলে দীন্নু পণ্ডিতের ভাবান্তর হইত, মুখভাব অবর্ণনীয় হইয়া উঠিত। মুখে একটা ভয়-ভয় অথচ হাসি-হাসি ভাব ফুটাইয়া তিনি আমাদের দিকে চাহিয়া কোমল কণ্ঠে বলিতেন—'মন দিয়ে লেখা-পড় কর বাবারা, আখেরে তোমাদেরই ভাল হবে।' বলিতেন এবং আড়চোখে সিপাহী-ঠাকরুণের দিকে চাহিতেন।

সেদিন গৃহ-প্রবেশ উৎসবে আরও তিনটি লোক দেখিয়াছিলাম, যাহাদের কথা এখনও ভুলি নাই। প্রথম লোকটি ফেলু পুরুত। থলথলে চেহারার লোকটি। মুখটি হাঁড়ির মতো বড়, চোখ দুটি ঈষৎ কটা এবং টানা টানা। মুখটি ফোলা-ফোলা। দুই গালে

এবং চিবুকের তলায় মাংস থলথল করিতেছে, সামান্য উত্তেজনাতেই, সেগুলি নড়িয়া নড়িয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে সেগুলির ভিতরে জীবন্ত যেন কিছু আছে। তিনি ঘটক মহাশয়ের সমস্ত ব্যাপারীদেরও নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। মামার অনুরোধে অঘোরবাবু ফেলু পুরোহিতকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। খাইতে বসিয়া ফেলু পুরুত তাক লাগাইয়া দিলেন সকলকে। মামার এক জেলে রোগী অনেক চিতল মাছ উপঢৌকন পাঠাইয়াছিল। প্রায় তিন চার মণ। ফেলু পুরোহিত পুরা আহারের পর একুশখানি চিতলমাছের পেটি উদরস্থ করিলেন। যে পংক্তিতে তিনি বসিয়াছিলেন সে পংক্তির লোকেরা তাঁহার খাওয়া দেখিয়া খুব খুশী হইলেন, 'আরও খান', 'আরও খান' বলিয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। চারিদিকে একটা সাড়া পড়িয়া গেল।···পরদিন প্রভাতে দেখিলাম চার পাঁচজন লোক উঠানে বসিয়া পা ধুইতেছে, তাহাদের পায়ে প্রচুর কাদা। শুনিলাম উহারা ফেলু পুরুতকে পুড়াইয়া ফিরিয়াছে। আহারের ঘণ্টাখানেক পর হইতেই ফেলুর ভেদ বমি শুরু হয়। ভোর হইতে না হইতে তিনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি শঙ্খ-মামা। একটি ছোট ন'হাতি কাপড় পরিয়া, কপালে নিজের পৈতাটি কসকসে করিয়া বাঁধিয়া তিনি বাড়ির ভিতর বারান্দার এক কোণে একটি মোড়ার উপর বসিয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেছিলেন। মুখময় খোঁচাখোঁচা গোঁফদাড়ি, নাসারন্ধ্র হইতে চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে, কপালে রগে সাদা সাদা কি একটা লাগাইয়াছেন। অত্যন্ত দৃষ্টিকটু একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিয়া তিনি বসিয়াছিলেন। মামা একবার আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"শেঁকো। তুই এমনভাবে এখানে বসে' কোঁতাচ্ছিস কেন। মাথা ধরেছে তো শুয়ে পড়গে যা না—"

শঙ্খমামা কোনও জবাব দিলেন না, আরও বার দুই 'ওঁ' 'ওঁ'

করিলেন কেবল। মামা ব্যস্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শঙ্খমামা তখন নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া মামীমাকে বলিলেন—"ওঁ বৌঁদি দাঁদাঁ শুঁতে বঁললে আমাকে। খেঁতে দাঁও, খেঁয়ে শুঁয়ে পঁড়ি"। একটু পরেই মামীমা তাঁহাকে খাইতে দিলেন। দেখিলাম মাথা-ধরার জন্য তাঁহার অগ্নিমান্দ্য হয় নাই। প্রচুর আহার করিলেন। তাহার পর কোঁথাইতে কোঁথাইতে গিয়া একটা ঘরে শুইয়া পড়িলেন। শঙ্খমামাকে আরও কয়েকবার দেখিয়াছি, ঠিক ওই এক চেহারা, এক ধরন। কোনও ভোজবাড়ির নিমন্ত্রণ তিনি উপেক্ষা করিতেন না, কিন্তু ভোজ-বাড়িতে গিয়া পাছে কোনও কাজ করিতে হয় তাই মাথা-ধরার ভান করিয়া বসিয়া থাকিতেন, এবং মাথায় পৈতা বাঁধিয়া, কপালে চন্দন লাগাইয়া 'ওঁঃ' 'ওঁঃ' শব্দ করিতেন।

তৃতীয় যে লোকটি সেদিন আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাঁহাকে 'দালাল মশায়' বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার আসল নাম দেবেন ভট্টাচার্য। মধু ঘটকের যে ব্যবসায় ছিল, তাহাতে তিনি পাটের দালালি করিতেন। দীর্ঘঋজু-দেহ, গৌরবর্ণ। ভীড়ের মধ্যেও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। নাকটি বেশ বড় ও সূচ্যগ্র, চক্ষু বুদ্ধি-দীপ্ত, পাতলা ঠোঁটে চাপা হাসি। সেদিন ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে শেষের দিকে একটা জায়গা খালি ছিল। কে একজন বলিল, 'বংশীবাবু আপনি বসে পড়ুন ওখানে।' বংশীবাবু একজন প্রতিপত্তি-শালী ব্যক্তি, কোন-এক জমিদারের নায়েব তিনি, দালাল মহাশয়কে পাটসংগ্রহ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার এলাকায় যাইতে হয়। বংশীবাবুকে খুশী রাখিলে তাঁহারই সুবিধা। কিন্তু দালাল মশাই ইহাতে আপত্তি করিলেন।

"বংশীবাবু, ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে বসবেন কি করে'। উনি যে বত্তি—"বংশীবাবুর স্তাবক হরিহর বলিলেন, "শিক্ষিত সমাজে বিদ্যার

প্রকৃত ব্রাহ্মণও, তাঁর পৈতে আছে, অত গোঁড়ামি আজকাল অচল—"

দালাল মশায় ধমকাইয়া উঠিলেন।

"আপনি যদি স্যাকরাকে দিয়া একটা সোনার মুকুট তৈরি করিয়ে মাথায় পরে' বেড়ান, অপেনাকে কি কুইন ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এক টেবিলে খেতে দেবে ?"

হরিহর দে লোকটি কুৎসিত-দর্শন এবং বেঁটে। তিনি মাথায় সোনার মুকুট পরিয়া কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত এক টেবিলে খাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা কল্পনা করিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন। বংশীবাবু মানী ব্যক্তি, তিনিও ইহাতে অপ্রতিভ হইলেন একটু, কিন্তু সামলাইয়া লইলেন।

"না, না, দালাল মশাই ঠিকই বলেছেন, আমি আলাদাই বসব। সামাজিক ব্যাপারে সাবেক প্রথা মেনে চলাই নিরাপদ"

হরিহর দে-কে মৃদুকণ্ঠে বলিতে শোনা গেল—"এই জন্যেই তো দলে দলে ব্রাহ্ম হয়ে যাচ্ছে সব"

পঙ্‌ক্তি ভোজন সম্বন্ধে এই ধরনের কড়াকড়ি আজকাল কেহ ভাবিতেও পারেন না। কিন্তু সে যুগে ইহা সকলে মানিয়া চলিত। কুলীন ব্রাহ্মণদের বিশেষ মর্যাদা ছিল তখন। এখনও সেই সাবেক-প্রথা চালু আছে, কিন্তু ভিন্নরূপে। এখন কাঞ্চন-কৌলীন্য প্রবর্তিত হইয়াছে। ধনীরা এখন এক পঙ্‌ক্তিতে বসে এক সঙ্গে আহার-বিহার করে, গরীবদের সেখানে স্থান নাই। দালাল মহাশয় পঙ্‌ক্তির ব্যাপারে সেদিন ওই কাণ্ড করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি ভিন্নজাতের লোকেদের যে ঘৃণা করিতেন না ইহাও আমি পরে দেখিয়াছি, এমন কি অনেক মেথরকে তিনি অর্থ-সাহায্য করিতেন, তাহাদের সহিত তাঁহার স্নেহের সম্বন্ধও ছিল। কিন্তু কোন-প্রকার বাহাদুরি চালিয়াতির গন্ধ পাইলে তিনি ক্ষেপিয়া উঠিতেন।

তাঁহার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। নিজের গ্রামে তিনি এই কাণ্ডটি করিয়াছিলেন। তখন ট্যাঁক ঘড়ি নামে এক প্রকার ঘড়ির খুব প্রচলন হইয়াছিল। ছোট-ঘড়ি, ডালা বন্ধ, ঘড়ির মাথার কাছে একটু চাপা দিলেই ডালাটা লাফাইয়া উঠে। ঘড়িটি সাধারণত ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখা হইত। দালাল মশাই নিজের গ্রামে একদিন সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া সময় নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গ্রামের তপু নাপিতের ছেলে ঝপু আসিয়া উপস্থিত হইল। তপু নাপিত হইলেও গরীব ছিল না। জমিজমা কিছু ছিল, একটি মনিহারি দোকানও ছিল। ঝপু কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় গিয়া কোনও সদাগরি আপিসে একটি চাকরিও জোগাড় করিয়াছিল। তাহার দিকে একনজর চাহিয়াই দালাল মশায় চটিয়া গেলেন। দশ-আনা-ছ-আনা চুল ছাঁটা, গলায় ফুলদার কম্ফর্টার, পায়ে মোজা ও বুট জুতা।

"আকাশে কি দেখছেন দালাল মশাই"

"বেলা কত হল তাই ঠিক করছি"

"এই যে দেখে নিন"

ঝপু ট্যাঁক হইতে ট্যাঁক-ঘড়ি বাহির করিয়া দালাল মহাশয়ের প্রায় নাকের কাছে তাহা লইয়া গেল। স্প্রিং টিপিতেই ডালাটা লাফাইয়া উঠিল। দালাল মশাই চমকাইয়া উঠিলেন। পরমূহূর্তেই তাঁহার ক্রোধবহ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"শালা, আমাকে ঘড়ি দেখাচ্ছিস তুই—"

ঝপু দালাল মহাশয়কে চিনিত। সে প্রাণভয়ে দৌড় দিল। দালাল মহাশয়ও তাহার পিছু পিছু ছুটিতে লাগিলেন। প্রায় এক মাইল ছুটিয়া ঝপুকে তিনি ধরিলেন, ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন···

গগনের ডাক শুনিয়া কুমার খাতা হইতে চোখ তুলিল।

"দাদুকে পরীক্ষা করে' দেখলুম। দাদুর রক্তটা একবার পরীক্ষা করা দরকার। পাটনা কিম্বা কোলকাতায় লোক পাঠাতে হবে। এখানে হবে না"

"সিভিল সার্জন তো সে কথা বললেন না কিছু"

"বলা উচিত ছিল"

"কাটিহারে বাবার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছিল একবার। ব্লাড শুগারও দেখেছিল। তুই দেখেছিস রিপোর্টগুলো?"

"দেখেছি। আমি W. R. করাতে চাই—"

"সেটা আবার কি"

"রক্তে সিফিলিসের কোন বিষ আছে কিনা সেটা দেখা দরকার"

কুমার অবাক হইয়া গেল।

"সিফিলিসের বিষ? পাগল না কি তুই"

"খুব সম্ভবত কিছু নেই। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে ওটা দেখে নেওয়া উচিত। ওটা একটা রুটিনের মধ্যে। আমি রক্ত নিয়ে সিরাম্ বার করে' দিচ্ছি—কেউ নিয়ে চলে' যাক্। যাবার মতো লোক নেই কেউ?"

"লোক আছে। চল্ দেখি, বাবা আবার কিছু মনে করবেন না তো"।

কথাটা শুনিয়া সূর্যসুন্দর কিন্তু খুশী হইলেন।

"গগন ঠিকই বলেছে। W. R. করা উচিত। একবার একটা রোগীর বিউবো কাটতে গিয়ে আমার আঙুলের কোণে ছুরির খোঁচা লাগে। বগলের গ্ল্যাণ্ডগুলো খুব ফুলে ওঠে, জ্বর হয়। তখনকার দিনে এর যা চিকিৎসা ছিল তা করেছিলাম, তবু দেখে নেওয়া ভালো। দাদু আমার বুদ্ধিমান ডাক্তার হয়েছে দেখছি—"

সেই দিনই রক্ত লইয়া একজন লোক কলিকাতা চলিয়া গেল।

৭

বাহিরে তিনটি বড় বড় আটচালা প্রস্তুত হইয়াছিল, আর সেগুলিতে আড্ডা জমাইয়াছিল তিন শ্রেণীর লোক। এক নম্বর আটচালায় জুটিয়াছিলেন বিভিন্ন গ্রামের বৃদ্ধগণ। ইঁহারা অনেকেই সূর্যসুন্দরের যৌবনকালের সঙ্গী। ডাক্তার হিসাবেই নয়, নানাভাবে ইহাদের সুখ-দুঃখের সহিত সূর্যসুন্দর জড়িত হইয়া আছেন। প্রকৃত আত্মীয় বলিতে যাহা বুঝায় ইঁহারা তাহাই। হিন্দু-মুসলমান-বিহারী-মাড়োয়ারি বাঙালী আধা-বাঙালী সব রকম লোকই আছেন ইঁহাদের মধ্যে। হিন্দিতেই গল্প চলিতেছে। আমরা অবশ্য তাহার মর্ম বাংলাতেই ব্যক্ত করিব।

প্রবীণ সুবতালী তহশিলদার খুব ভোরেই নিজের ঘোড়াটিতে চড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহার ঘোড়াটি সাধারণ দেশীয় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে জিনও নাই। চামড়ার লাগামও নাই। লাগামের বদলে আছে রঙীন পাটের দড়ি। জিনের বদলে একটি গদি। সাধারণ সতরঞ্চি ও কম্বল পাট করিয়া এবং তাহার উপর একটি কাপড় বিছাইয়া ছোটখাটো একটি গদির মতো করা হইয়াছে। সেই গদিতে বসিয়া সুবাতালী তহশিলদার সারজীবন ভ্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার ছেলেদের বড় বড় ঘোড়া, ঘোড়ার পিঠে দামী জিন, দামী সাজ, সুবাঙালী কিন্তু ওই ছোট দেশী ঘোড়ার উপর দেশী বিছানা পাতিয়া চড়িতে ভালবাসেন। তাঁহার পরিধানে একটি সাদা লংক্লথের মেরজাই, পায়ে দেশী মুচির তৈরি জুতা এবং মাথায় পাতলা-কাপড়ে তৈরি মুসলমানী টুপি। তিনি একটি দড়ির খাটে বসিয়া জমাইয়াছেন। সূর্যসুন্দরের বিষয়েই গল্প হইতেছে।

আজকাল ব্রাহ্মণ বলে' স্বীকৃত হয়েছেন, বংশীবাবু আচারে ব্যবহারে

সুবাতালী বলিছেন, "আমাদের ডাক্তারবাবু মানুষ নন, বিরাট একটা বটগাছ। কত আজব ধরনের চিড়িয়া যে ওঁর ডালে এসে বাসা বেঁধেছে তার আর ঠিক নেই। কেশ মশাইকে মনে আছে রমেশ ?"

স্থানীয় জমিদারি সেরেস্তার প্রবীণ গোমস্তা রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "খুব আছে। কেশ মশাইকে ভোলা যায় না কি। আপনি যে তার চাকরি করে' দিয়েছিলেন, তা-ও মনে আছে"

রমেশ গদগদ দৃষ্টিতে সুবাতালীর দিকে চাহিলেন, যেন কেশমশাই চাকরি দিয়া সুবাতালী রমেশেরই ব্যক্তিগত কোন উপকার করিয়াছেন। একটু মিহি খোশামোদ করা রমেশবাবুর স্বভাব।

সুবাতালী হাসিয়া বলিলেন, "দিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুর খাতিরে। কিন্তু সে কি চাকরি করত ? আফিংই খেত তিনবার করে'—সকালে দুপুরে আর রাত্রে। যখনই সেরেস্তায় গেছি তখনই দেখেছি ঢুলছে বসে'। তবু ডাক্তারবাবুর খাতিরে রেখেছিলাম তাকে, কিন্তু নিজেই সে চাকরি ছেড়ে দিলে একদিন। বললে সেরেস্তার চৌকিতে না কি এত ছারপোকা যে বসা যায় না—"

রমেশ মন্তব্য করিলেন, "আয়েসী লোক ছিলেন তো। ঘুমের ব্যাঘাত হ'ত"

একটা হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।

"না, না হাসির কথা নয়। কেউ খাদ্য-রসিক থাকে, কেউ সাহিত্য-রসিক থাকে, তেমনি উনি ছিলেন ঘুম-রসিক"

চোখ বড় বড় করিয়া সুবাতালী বলিলেন, "লোকটা গুণী ছিল কিন্তু। আমার আস্‌গরের বিয়ের সময় নেচে গেয়ে বাজিয়ে একাই জমিয়ে তুলেছিল লোকটা—"

"ওই জন্যেই তো ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আর

একটা খবর আপনারা কেউ বোধহয় জানেন না, এই যে এখানকার হাই-স্কুল—এর প্রথম ভিৎ পত্তন করেন ডাক্তারবাবু। দুর্গাস্থানে প্রথমে খোলা হল লোয়ার প্রাইমারি স্কুল, আর সে ইস্কুলের প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই—”

সুবাতালী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “তারাপদ পণ্ডিতই তো ওই পাঠশালাটা চালাতেন”

“সে পরে। প্রথম পণ্ডিত ওই কেশমশাই। ওর হাতখরচের মতো যাতে দু'চার টাকা হয়ে যায় তার জন্যেই ওই পাঠশালাটা। বসিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু এক ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবকে ধরে'। সেকালে বড় বড় বাঙালী অফিসররা ডাক্তারবাবুর বাড়িতে উঠতেন, ডাক-বাংলা তো ছিল না। একবার এক ইনেস্‌পেক্‌টার অতিথি হয়েছিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে। পাঠশালার কথা শুনে তিনি বললেন, বেশ আমি মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে' দেব। আজ আমি পাঠশালাটা দেখি একবার। তারপর আপনারা দরখাস্ত দিলেই হয়ে যাবে। ইনেস্‌পেক্‌টার নাম-মাত্র দেখলেন গিয়ে, পাঠশালাটার সামনে মিনিট পাঁচেকও দাঁড়িয়েছিলেন কিনা সন্দেহ, ডাক্তারবাবু গ্রামের পাঁচজনকে দিয়ে সই করিয়ে একটা দরখাস্ত দিয়ে দিলেন তাঁর হাতে। তারপর থেকে মাসে পাঁচ টাকা করে' পেতে লাগলেন কেশমশাই। কিন্তু মজার কথা কি জানেন, কেশ মশাই প্রথমে এতে রাজি হন নি। তিনি ডাক্তারবাবুকে বলেছিলেন, ‘আপনি ভুল করলেন, ডাক্তারবাবু। ছাত্রেরা যে যা দিত তাতেই আমার বেশ চলে' যাচ্ছিল। এখন এই ইনেস্‌পেক্‌টার টিনেস্‌পেক্‌টার এসে রোজই একটা না একটা বখেড়া বাধাবে দেখবেন। কথায় আছে, বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ওরা বাঘ'। ডাক্তারবাবু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ‘আরে না না। কোন ভয় নেই। আপনি যেমন কাজ করছেন করে' যান না। কি করবে আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। যদি করে তখন দেখা যাবে। ভাল করে' কাজ

করলে এইটেই পরে আবার প্রাইমারি স্কুল হ'য়ে যাবে। আপনার মাইনেও বাড়বে তখন।' কেশমশাই কিছু বললেন না, চুপ করে' রইলেন।"

সুবাতালী হাই তুলিয়া বলিলেন, "এক নম্বর কোঢ়ি ছিল লোকটা"

কোঢ়ি মানে কুঁড়ে।

"তারপর কি হল ?"

"মাস ছয়েক বেশ চলল। তারপরেই হল মজার কাণ্ড একটি! সেই ইনেস্‌পেক্‌টারটি বদলি হ'য়ে গিয়েছিলেন, তাঁর বদলে নূতন আর একজন এসেছিলেন, তিনিও অবশ্য বাঙালী, কিন্তু একেবারে অচেনা লোক, এ অঞ্চলে আসেন নি কখনও। তিনি যেদিন ইস্কুল ভিজিট করতে এলেন সেদিন তুমুল বর্ষা। ট্রেন থেকে নেবেই বুঝতে পারলেন, এত বর্ষায় স্টেশন থেকে বেরুনো যাবে না আর তখন এখানকার পথ-ঘাট যা ছিল তা তো জানেনই। ইনেস্‌পেক্‌টার কি করবেন ভেবে না পেয়ে শেষকালে নিজের চাপরাশিটাকে পাঠালেন। স্কুলটা খুঁজে বার করতে, আর সম্ভব হলে স্কুলের পণ্ডিতকে খবর দিতে। তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে, চারিদিকে ঘুরঘুটি অন্ধকার। কেশমশাই তখন আপিঙের নেশায় মশগুল হ'য়ে স্কুল ঘরেই। তিনিও বেরুতে পারেন নি ইস্কুল থেকে। খানিকক্ষণ পরে সেই চাপরাশি জিগ্যেস করতে করতে হাজির হ'ল এসে তাঁর কাছে। দরজা ঠেলাঠেলি করতেই কেশমশাই জিগ্যেস করলে—"কে—"

"আমি ইনেস্‌পেক্‌টারের চাপরাশি—"

"এখানে কি চাই"

"আপনি কি পণ্ডিতজী"

"হ্যাঁ, কেন"

"ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব এসেছেন, স্টেশনে বসে আছেন"

"তা আমি কি করব ?"

"তিনি আপনার স্কুল দেখতে এসেছেন"

"কাল বেলা দশটার সময় আসতে বোলো"

চাপরাশি এরকম জবাব শুনবে প্রত্যাশা করে নি। অবাক হ'য়ে চলে' গেল সে। খবরটা শুনে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেবও উদ্বিগ্ন হলেন। রাত্রে থাকেন কোথা। ডাক-বাংলা নেই, স্টেশনে ওয়েটিং রুমও নেই। স্টেশন মাস্টার শ্যামবাবু ছিলেন তখন। তিনি পরামর্শ দিলেন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চলে যান, সেখানে খাওয়া-শোয়ার ব্যবস্থা হবে, আপনার কাজের ব্যবস্থাও হয়ে যাবে। জলটা একটু ধরতেই এক কুলির সঙ্গে স্টেশনের এক-চোখো আলোর সাহায্যে ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব ছপ ছপ করে' ডাক্তারবাবুর বাড়িতে এসে হাজির হলেন। তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে গানের মজলিশ বসত। অন্য রকম আবহাওয়াই ছিল তখন এ বাড়ির। আমি সুদ্ধ গান গাইতাম তখন। তবলা বাজাত কানা কাতিক। তবলা বাজাতে তার কানা চোখটাও ফাঁক হয়ে যেত। ইনেস্‌পেক্‌টার আসতেই ডাক্তারবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন তাঁকে। তারপর চা এল, নিমকি এল। ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব গানের মজলিশে জমে গেলেন বেশ। কেশমশাই তখনও এসে পৌঁছন নি। তিনি না আসাতে মজলিশটা জমেও যেন জমছিল না তেমন। তিনি সর্ববিদ্যাবিশারদ ছিলেন তো। তবলা, বাঁশী, বেয়ালা, হার্মোনিয়াম সব বাজাতে পারতেন, গানের গলাও খুব মিষ্টি ছিল, নাচতেনও চমৎকার। ওঁর এই সব গুণের জন্যই না ডাক্তারবাবু ওঁকে খাতির করতেন এত। ওঁর একটা যাত্রার দল ছিল না কি এককালে। শোনা যায় উনি ফিমেল পার্ট করতেন, আর মদও খেতেন, কিন্তু পয়সার অভাবে—"

তহশিলদার সাহেব একটু অধীর হয়ে পড়েছিলেন রমেশের গল্পের দৈর্ঘে।

বল্‌লেন, "আগে বঢ়ো না ভাই। পহলে গপ্‌ খতম্‌ করো—"

"হ্যাঁ। তারপর গান-বাজনা যখন জমে' উঠেছে, তখন কেশমশাইয়ের গলা শোনা গেল বাইরে। বাইরে থেকেই চেঁচিয়ে তিনি বলছেন, "বুঝলেন ডাক্তারবাবু, এক শালা ইনেস্‌পেক্‌টার এসে হাজির হয়েছে। তখনই বলেছিলুম আপনাকে, বখেড়া হবে। চাপরাশি পাঠিয়েছে আমার কাছে। উদ্দেশ্যটা যাতে তাঁকে আমি জামাই আদরে ডেকে এনে অভ্যর্থনা করি—বলতে বলতে ঘরে এসে ঢুকলেন তিনি। ঢুকতেই ডাক্তারবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'ইনিই আপনার ইনেস্‌পেক্‌টার। অচেনা জায়গা, জলে বৃষ্টিতে বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন বলেই লোক পাঠিয়েছিলেন আপনার কাছে। নিন আলাপ করুন'। ইনেস্‌পেক্‌টার মৃদু মৃদু হাসছেন। কেশমশাই তো স্তম্ভিত। সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। নমস্কার করে' করজোড়ে বললেন, 'ধর্মাবতার, আপনি এখানে আছেন জানলে কক্‌খনো আমি এসব কথা বলতুম না। তবে একটা কথা আপনাকে বলব, আমার মতো বহু গরীব পণ্ডিতদের মনের কথা আজ আপনি শুনে ফেললেন আমার মুখ দিয়ে। এখন আমাকে ক্ষমা করা না করা হুজুরের ইচ্ছে। জানি না ভগবানের মনে কি আছে।' এমন-ভাবে মুখ কাঁচুমাচু করে' বললেন কথাগুলো যে সবাই হেসে উঠল।

ইনেস্‌পেক্‌টার সাহেব বললেন, "না, না, তাতে কি হয়েছে, আমি কিচ্ছু মনে করি নি। আপনি ঠিকই বলেছেন। বসুন—"

কেশমশাই বসলেন একধারে। ডাক্তারবাবু তখন আসল পরিচয়টি দিলেন কেশমশাইয়ের। বললেন "ইনি গান-বাজনাতেও খুব গুণী লোক। আপনি সে পরিচয়ও পাবেন"। তারপর কেশ-মশাই নেচে গেয়ে আর বেয়ালা বাজিয়ে এমন জমিয়ে তুললেন যে ইনেস্‌পেক্‌টার তাঁর বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট তো লিখলেনই না, উপরন্তু মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে গেলেন। গুণী ছিল লোকটা—"

সুবাতালী বললেন, "বেশক্‌। আব্‌ উসব জমানা গিয়া ভাই। ওরকম কেশমশাইও আর হোবে না, নিস্‌পিট্টরও হোবে না"

বনাবগঞ্জের গোবিন্দ মণ্ডল ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ ঘাড় তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন, সীয়া রাম, সীয়া রাম, সীয়া রাম—বলিয়া আবার ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ষু বুজিলেন। গোবিন্দলাল মণ্ডল একজন জমিদার, কিন্তু তাঁহার বেশ-বাস হইতে তাহা বুঝিবার উপায় নাই। তিনি আসিয়াই কুমারকে ডাকিয়া তাহার হাতে দুইশত টাকা দিয়া বলিয়াছিলেন, এটা রাখিয়া দাও। কুমার ব্যাপারটা বুঝিতে পারে নাই, প্রশ্ন করিয়াছিল, "কোথায় রেখে দেব"

"পোস্টাপিসে রেখে দাও। আমার ঘরে টাকা চুরি হয়ে যায়। এটা তোমার নামে জমা থাক—"

কুমার তবু ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ইতস্তত করিতেছিল। তাহার ইতস্তত ভাব দেখিয়া মণ্ডল মহাশয় বলিয়াছিলেন, "আমার টাকা আমার কাছে থাকাও যা, তোমার কাছে থাকাও তা। তোমার কাছেই থাক—"

"যদি খরচ করে' ফেলি—"

ইহা শুনিয়া গোবিন্দ মণ্ডলের ক্ষুদ্র চক্ষু দুইটি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বলিয়াছিলেন, "ফেল। খুব খুশী হব তাহলে। সেই জন্যেই তো আনলাম। খরচ তো হচ্ছে চারিদিকে—"

কুমার অবশেষে টাকাটা লইয়া চলিয়া গেল। মণ্ডল মহাশয় আটচালার এক কোণে গিয়া বসিলেন, তখন হইতে বসিয়াই আছেন এবং মাঝে মাঝে "সীয়ারাম, সীয়ারাম" বলিতেছেন।

তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার চমকলাল সিংহও আসিয়াছেন। চমক লাগাইবার মতোই চেহারা তাঁহার। প্রকাণ্ড পাকানো গোঁফ এবং জুলফি, দুইই পাকা। সিংহ মহাশয়ের বর্ণ ঘোর কালো বলিয়া পাকা গোঁফ এবং জুলফি বেশ মানাইয়াছে। চক্ষু দুইটি টানাটানা এবং লাল। তিনি একধারে বসিয়া নিম্নকণ্ঠে স্থানীয় গোলাদার মহাজন ওঝাজির সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ওঝাজির

চেহারাও দেখিবার মতো। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। প্রকাণ্ড টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। গায়ে জামা নাই। কাঁধে গামছা, গলায় পৈতা, বুক ও পিঠ-ভরা লোম, আজানুলম্বিত বাহু। চাকরবাকরদের সহিত ক্রমাগত চেঁচামেচি করিতে হয় বলিয়া গলার স্বরটা একটু ভাঙা-ভাঙা। প্রচুর চীৎকার করিতে হয় তাঁহাকে। কারণ তিনি শুধু গোলাদারি কারবারই করেন না, রেলের কুলি-কনট্র্যাক্টারিও করেন। প্রত্যহ প্রায় দুইশত কুলিকে খাটাইতে হয়। চমকলাল ওঝাজির সহিত গোপনে পরামর্শ করিতেছিলেন একটি হারের জন্য। চমকলাল ডাক্তারবাবুর নাত-বৌয়ের সাধ-উপলক্ষে বধূকে একটি সোনার হার উপহার দিতে চান এবং এ খবরটি গোবিন্দ মণ্ডলের নিকট হইতে গোপনও রাখিতে চান। তিনি ওঝাজিকে অনুরোধ করিতেছেন যাহাতে তিনি কলিকাতায় কোনও বিশ্বাসী লোক পাঠাইয়া আনাইয়া দেন। এখানে হার করাইতে গেলে ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইতে পারে। ওঝাজির মুনিম্‌জি (ম্যানেজার) বিশ্বাসী লোক, সমঝদারও। ওঝাজির রেলের পাস আছে, ওঝাজি ইচ্ছা করিলেই তাঁহার এ কাজটি করাইয়া দিতে পারেন। ওঝাজি প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন দিবেন, যদি টি-আই না আসেন। টি-আই আসিলে মুনিম্‌জিকে এখানেই থাকিতে হইবে। তখন তিনি অন্য ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এই আলোচনাই চলিতেছিল এমন সময় নিখিলবাবু প্রবেশ করাতে সুবাতালী ছাড়া আর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

"আরে বস, বস, দাঁড়াচ্ছ কেন—"

নিখিলবাবুও একধারে বসিয়া পড়িলেন। তিনি স্থানীয় জমিদারের ম্যানেজার। বাংলাদেশে তাঁহার নিজেরও ছোট-খাটো জমিদারি আছে একটা। বড় বংশের ছেলে, শিক্ষিত, মার্জিত-রুচি। এখানেও কার্যত তিনি জমিদার। আসল জমিদার কলিকাতা-বাসী। সবাই নিখিলবাবুকে খাতির করেন। সুবাতালী বয়োবৃদ্ধ

বলিয়া নিখিলবাবু তাঁহাকে সমীহ করিয়া চলেন। সুবাতালীও স্নেহ করেন তাঁহাকে। নিখিলবাবুর দিকে সহাস্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সুবাতালী প্রশ্ন করিলেন, "কি নিখিলবাবু, কি 'পিলান' করলেন?" পিলান মানে, প্ল্যান।

"এই যে সব লিখে এনেছি কাগজে। মেয়েদের উপর কোনও ভার থাকবে না। এমন কি পান পর্যন্ত সাজবে মহাদেব বারুই। ছুনিয়ালাল মাংস রান্না করবে কুঠিতে। এ বাড়িতে মাংস এলে চন্দরবাবু খুঁত খুঁত করবেন। মুষণকে বলে' দিয়েছি যে খাসী নিয়ে কুঠিতেই যাবে। ওইখানেই সব হবে। আর আমিষ হবে ওদিকের চোয়ারীতে—"

নিখিলবাবু একটি লম্বা কাগজ বাহির করিয়া সুবাতালীর হাতে দিলেন। সুবাতালী মিরজাইয়ের পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া সেটি পরিলেন এবং কাগজটির প্রতি ক্ষণকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন। তাহার পর সেটি ফেরত দিয়া বলিলেন, "কুছ নেহি সম্‌ঝা। অংরেজি পঢ়্তে পারি না"

নিখিলবাবু মৃদু হাসিয়া কাগজটি পকেটে পুরিলেন।

বলিলেন, "আপনার সমঝাবার কোন দরকার নেই। আপনার বাথানে ক'টার সময় দুধ দোয়া হবে বলুন"

"ভোর তিন্ বাজে। দু'মণ দুধ এখানে আসবে আমি বলে' দিয়েছি"

"আমি রামটহলকে দুধ আনতে পাঠাব। কয়েকটা পরিষ্কার পিতলের হাঁড়ি নিয়ে যাবে সে। আপনার গোয়ালাদের বলে' দেবেন তারা যেন দুধটা পিতলের হাঁড়িতে দোয়, কারণ ওদের কেঁড়েতে দুইলে এমন ধোঁয়া-গন্ধ হবে যে পায়েস মাটি হয়ে যাবে—"

সুবাতালী স্মিতমুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, "বেশ তাই হোবে। আমার উপর আর কোনও ফরমায়েস আছে—?"

"আপনি কেবল আসর জমিয়ে বসে' থাকবেন, আপনি আর মোড়লজি। আর কিছু করতে হবে না। গল্প করবেন খালি—"

গোবিন্দ মণ্ডল "সীয়ারাম সীয়ারাম" বলিয়া মস্তকে হাত বুলাইলেন। অর্থাৎ সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন।

চমকলাল ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নিজের গোঁফে তা দিলেন একবার, তাহার পর আড়-চোখে নিখিলবাবুর দিকে চাহিলেন। ভাবটা, আমার উপর কি কোনও ভারই দিবেন না? আমি কি কোনও কিছুরই যোগ্য নই? নিখিলবাবু তাহার দৃষ্টির ভাবার্থ বুঝিলেন কি না বোঝা গেল না। কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন, "চমকলাল, তোমার উপর খুব একটা শক্ত কাজের ভার দিচ্ছি। পারবে কি না না বল—"

"হুকুম করুন"

"তোমাকে মশলা-বাটার ভারটা দিতে চাই। তার মানে, মশলাগুলি বাছিয়ে, ধুইয়ে, বাটিয়ে রাখতে হবে সকাল দশটার মধ্যে। ভোর চারটে থেকে কাজ শুরু করতে হবে। গোটা দশেক জোয়ান গোয়ালা চাই। শিল-নোড়ার ব্যবস্থা আমি করেছি। তোমার তো অনেক গোয়ালা প্রজা আছে, তোমার পক্ষে দশটা লোক জোগাড় করা শক্ত হবে না—"

"দশ বিশ যেত্‌না কহিয়ে—"

"তুমি তাহলে তোমার গোয়ালাদের নিয়ে সন্ধ্যের সময় এখানেই চলে এস। তুমি নিজে মোতায়েন থাকলে কাজ ভাল হবে, ফাঁকি দিতে পারবে না। আমি তোমাকে একটা এলার্ম ঘড়ি দিয়ে দেব, চারটে থেকে উঠে কাজ শুরু করে' দিও"

"হাঁ হাঁ—ই কোন্‌ বড়ি বাত্‌ হায়"

"তাহলে তোমার সঙ্গে ওই কথা রইল"

নিখিলবাবু তারপর ওঝাজির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "আপনি ওঝাজি কুলি সাপ্লাই করবেন। ঝাড়ু দেওয়া, সামিয়ানা টাঙানো,

জল-তোলা—এসব আপনার কুলিদের দিয়ে আপনাকেই করাতে হবে। আমার কাছে চারটে বড় বড় ড্রাম্ আছে, আপনার কাছে কটা আছে—"

"দশঠো—"

"আরও গোটা পাঁচ ছয় চাই। বড় বড় কলসীও আনিয়ে রেখেছি আমি কিছু। সব জল ভরাতে হবে। অনেক কুলি চাই, এই ভারগুলো আপনি নিন—"

হাত-জোড় করিয়া ওঝাজি বলিলেন, "লেঙ্গে—"

"আর রমেশ—"

নিখিলবাবু রমেশবাবুর দিকে ফিরিলেন।

"বলুন—"

"তোমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছি। আমিষ আর নিরামিষ তিনটে ব্যাচ্ তিন জায়গায় খাবে। যারা খালি নিরামিষ তারা একঘরে, যারা মাছ আর নিরামিষ তারা একঘরে, আর যারা সব খাবে তারা আর এক ঘরে। মাছ-মাংসের ব্যাপারটা চোয়ারীতে ব্যবস্থা করলে ভালো হয়—"

"তার মানে তিন ব্যাচ্ ছোকরা চাই—"

"ছ' ব্যাচ্ চাই। তিন ব্যাচ্ পরিবেশন করবে, আর তিন ব্যাচ্ রান্না ঘর থেকে ওদের হাতে জিনিস তুলে দেবে"

রমেশবাবু একটু ভাঁড় প্রকৃতির লোক। চেহারাও ভাঁড়ের মতো। বেশ মোটা-মোটা, মুখখানিও গোলগাল। নিখিলবাবুর কথা শুনিয়া চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিলেন, তাহার পর অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

"কি, পারবেন না?"

"পারব না বললে চলবে কেন, পারতেই হবে। আমি ভাবছি ছোঁড়াগুলোর কথা, জানেনই তো, আজকাল ছোঁড়াদের ব্যাপার। উত্তর দিকে যেতে বললে দক্ষিণে যাবে, পুবে যাবে, কিন্তু উত্তর

দিকটিতে কিছুতে যাবে না। ওদের নিয়েই কাজ করতে হবে তো, তাই ভাবনায় পড়ে গেছি—"

"কেন, জন্তু, বঙ্কিম, বাজন, তোমার নাতি সুদো, এরা তো ছেলে খারাপ নয়—"

"আজ্ঞে, ওই ওপর-ওপরই ভালো। প্রত্যেকটির আঁটিতে টক। সেদিন জ্ঞানচাঁদের ছেলে রাত্রে হাটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছিল, আমাকে দেখে বিড়িটি ফেলে দিলে অবশ্য, এ খাতিরটুকু এখনও করে, কিন্তু তাকে যেই বললাম, বাবা এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থেকো না, অসুখ করবে, বাড়ি যাও। উত্তরে কি বললে জানেন, আজকাল ডাক্তারেরা বলে ওপ্‌ন এয়ারে শরীর ভাল থাকে। তখন আমাকে বলতে হল, ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আমারই ভুল হয়েছে, রঘুসিংয়েয় নিমোনিয়া হয়েছে শুনলাম। সত্যিই তো, তার নাক দিয়ে পাম্প্‌ করে' ঠাণ্ডা ঢোকানো হয়েছিল, মনে ছিল না কথাটা আমার—"

একটু থামিয়া চোখ বড় বড় করিয়া তাহার পর নিম্নকণ্ঠে বলিলেন—"প্রত্যেকটি ডেঁপো—"

গোবিন্দ মণ্ডল বসিয়া উঠিলেন—"সীয়ারাম, সীয়ারাম, সীয়ারাম—"

নিখিলবাবু স্মিতমুখে বলিলেন, "তোমাদের বংশধর তো সব"

সুবাতালী হাসিয়া ফোড়ন দিলেন, "আপনা আপনা জোয়ানি ইয়াদ করো ভাই"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। রাধানাথ গোপ প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি খাতা। তিনি খাতা হইতে সূর্যসুন্দরের অবস্থা পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। এটিও নিখিলবাবুর বন্দোবস্ত। তাঁহার নির্দেশ অনুসারেই রাধানাথ গোপ প্রতিদিন ডাক্তারের রিপোর্ট লিখিয়া রাখেন। এই ব্যবস্থা করিয়া নিখিলবাবু এক ঢিলে দুইটি পাখী মারিয়াছেন। প্রথমত যাহারা

দলে দলে আসিয়া ডাক্তারবাবুর খবর লইবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে, তাহাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে ডাক্তারবাবুকে বাঁচানো হইয়াছে, দ্বিতীয়ত, রাধানাথ গোপকে একটা কাজ দেওয়া হইয়াছে। নিখিলবাবুর ধারণা তাঁহাকে কাজ না দিলে তিনি অকাজের সৃষ্টি করিবেন।

রিপোর্ট পাঠ করিয়া রাধানাথ বলিলেন, "অনেক ভাল আছেন আজ ডাক্তারবাবু। হয়তো এ যাত্রা সামলেও যেতে পারেন পীর-বাবার কৃপায়। সুবাতালী তশিলদার উপরে হাত তুলিয়া বলিলেন, "খোদা কি মরজি—"

নিখিলবাবু রাধানাথ গোপকে পুনরায় মনে করাইয়া দিলেন, "তোমাকে কলা-পাতার ভার দিয়েছি, মনে থাকে যেন। এক হাজার কলাপাতা চাই"

"খুব মনে আছে। ব্যবস্থাও করেছি। এতো আমাদেরই নাত-বোয়ের সাধ। এ কথা মনে থাকবে না? আচ্ছা, আমি চলি—"

তিনি ব্যস্তভাবে চলিয়া গেলেন।

উষার বড় ছেলে 'এক' আসিয়া খবর দিয়া গেল—"দাদুর চান খাওয়া সব হ'য়ে গেছে। আপনাদের ডাকছেন—"

"আমি একাই একবার দেখা করে' আসি আগে। এক সঙ্গে গিয়ে ভীড় করা ঠিক হবে না"

"তাই যান"

নিখিলবাবু উঠিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় আট চালাটিতে আড্ডা জমাইয়াছিল গ্রামের যুবকবৃন্দ। রামপ্রসাদ, যোগেন, প্রিয়গোপাল তো ছিলই, তাছাড়া ছিল ওঝাজির তিন ছেলে শিউনাথ, দেওনাথ এবং জিলন। আর ছিল স্বর্গীয় ধাড়ি হালুয়াই-এর দুই পুত্র ঘোটন ও লোটন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ গল্প শুনিতেছিল।

কৃষ্ণকান্ত জমাইয়া শিকারের গল্প শুরু করিয়াছিলেন।

"বাঘ শিকারের সাধারণ নিয়ম হচ্ছে মাচায় বসে' শিকার করা। যে জঙ্গলে বাঘের খবর পাওয়া যায় সেই জঙ্গলে প্রথমে খোঁজ-খবর নেওয়া হয় কোন দিকে বাঘটার থাকা সম্ভব, কোন রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কোথায় ঘুমোয়, কোথায় জল খায়। এসব জানবার পর তার যাতায়াতের রাস্তায় একটা মোষ বেঁধে রাখা হয়। মোষটাকে যদি বাঘে মারে তাহলে সেই মরা মোষটার কাছাকাছি একটা জায়গায় একটা উঁচু মাচা বেঁধে তার উপর বসে' থাকতে হয়। বাঘের স্বভাব হচ্ছে—গরু বা মোষ মেরে তখ্খুনি তার সবটা সে খেয়ে ফেলে না, রক্তটা খেয়ে তারপর আধ-খাওয়া করে' সেটাকে ফেলে রেখে বাঘ চলে যায়। তারপর দিন এসে বাকিটা খায়। সেই সময়ই তাকে মারতে হয়। কিন্তু আমি যে গল্পটা বলছি তাতে মাচার ব্যাপার নেই। আমি একটা প্রকাণ্ড উঁচু গাছে উঠে বসেছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল অ্যালফ্রেড। এ লোকটিকেও অ্যালফ্রেড দি গ্রেট বললে অন্যায় হয় না, যদিও সে সায়েব নয়। কুচকুচে কালো সাঁওতাল ক্রিশ্চান। আমার বেয়ারার পদে বাহাল ছিল সে, কিন্তু আসলে ছিল আমার শিকারের বন্ধু। চেহারাটা অনেকটা বাঁদরের মতো। বেঁটে, রোগা, তরতর করে গাছে উঠতে পারত, গাছের ডাল ধরে' ঝুলে সড়াক করে' অন্য গাছে

চলে' যেতে পারত। হাসলে চোখ-মুখের চামড়া কুঁচকে যেত, বুজে যেত চোখ ছুটো, বেরিয়ে পড়ত হলদে দাঁতের সারি! চোখের রং কটা ছিল। তাকে দেখে সাঁওতাল মনেই হত না! শুনেছিলাম তার বাপ না কি সায়েব ছিল। এই অ্যালফ্রেড ছিল জঙ্গলের একটি সেরা গোয়েন্দা। জঙ্গলে কোথায় কি হচ্ছে সব তার নখদর্পণে। কোথায় শম্বর আছে, কোন্ পাহাড় থেকে দুর্ধর্ষ বুনোশুয়োররা নাবে, কোথায় ভালুকের আস্তানা, ময়ালসাপ কবে কোথায় হরিণ ধরেছিল—সব খবর তার জানা। সেই আমাকে একদিন খবর দিলে যে বনের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে যে নদীটা চ'লে গেছে তারই একটা বাঁকে একটা বাঘ প্রায়ই জল খেতে আসে সন্ধ্যা বেলা। বাঁকটার ঠিক সামনেই প্রকাণ্ড একটা গাছও আছে, তাতে চড়ে যদি বসে থাকি, তাহলে বাঘটাকে অনায়াসে মারা যায়। অ্যালফ্রেড বললে, কাছাকাছি দ্বিতীয় আর একটা গাছও আছে সেটাতে সে থাকবে। লোভ হ'ল। একদিন গিয়ে দেখে এলাম জায়গাটা। আমার বাংলো থেকে বেশ দূরে। মোটরে করে' মাইল দশেক যেতে হবে, তারপর আর মোটর চলবে না। হাঁটতে হবে জঙ্গলের ভিতর। তা-ও প্রায় মাইল ছুই। জঙ্গলের ভিতর হাঁটতে খুব ভালো লাগে। সরু সরু পথ আছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। কাঠুরেরা রোজ যায় সেই পথ দিয়ে সকাল বেলা। সমস্ত দিন বনে কাঠ কাটে, সন্ধ্যের দিকে ফিরে আসে আবার। চমৎকার লাগে বনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে। বেশ একটা ছায়া-ছায়া ভাব, মাঝে রোদের আভাস, কোথাও আলো-ছায়ার অদ্ভুত আলপনা, কাঠঠোকরার ডাক, বনমুরগীর ডাক, তিতিরের ডাক শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে; ছ'পাশে মাথা উঁচু করে' দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় গাছ, প্রত্যেক গাছে লতাও জড়িয়ে আছে। লতা বললেই সাধারণ আমাদের মনে যে রকম নরম-নরম রোগা পাতলা মেয়েলি ধারণা হয় এসব সেরকম লতা নয়। বেশ বলিষ্ঠ লতা সব, কাছির মতো শক্ত—"

"হাঁথীও বান্‌হা যায়—?"

প্রিয়গোপাল সরল লোক। সে বিস্ফারিত নেত্রে উৎকর্ণ হইয়া কৃষ্ণকান্তের অরণ্য বর্ণনা শুনিতেছিল। অনেক প্রশ্নই মনে জাগিতেছিল তাহার, কারণ শুধু সে সরল নয়, কৌতূহলীও। কিন্তু কাছির মতো লতার কথা শুনিয়া সে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, আধা-বাংলা আধা-হিন্দীতে উক্ত প্রশ্নটি করিয়া বসিল।

"হাতী বাঁধা যায় কি না পরীক্ষা করে' দেখি নি আমি। তবে খুব সম্ভবত যায়—"

৯

রামপ্রসাদ একটু ফক্কোড় প্রকৃতির। সে হঠাৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া প্রিয়গোপালকে বলিল—"তাহলে তুই এক কাজ কর না। তোর ভুসির ব্যবসা ছেড়ে এই লতার ব্যবসা আরম্ভ করে' দে। জামাইবাবুকে ধরলেই উনি ব্যবস্থা করে' দেবেন। অমন মজবুত লতা যখন, খুব বিক্রি হবে"

প্রিয়গোপাল চটিয়া গেল। চটিয়া গেলে সে শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করে।

"দেখো রামপ্রসাদ, ফাজলামি করিও না"

স্থূলকায় শিউনাথ গল্পে আকৃষ্ট হইয়াছিল। বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হইল।

"আরে ভাই কচ্-কচ্ নেহি করো। জামাইবাবু আপনি বলুন, তারপর কি হ'ল"

"তারপর একদিন গিয়ে সেই গাছে চড়লাম।"

"কখন গেলেন? রাত্রে?"

"না, সূর্যাস্তের প্রায় ঘণ্টা দুই আগে গিয়েছিলাম। তার আগের দিন ছোটখাটো একটা মাচাও বাঁধিয়ে রেখেছিলাম গাছের উপর"

"কি দিয়ে বানালেন?"—ঘোটন প্রশ্ন করিল।

ঘোটন হালুয়াই (খয়রা) এখন আর জাত-ব্যবসা করে না। সে এখন কণ্ট্রাক্টারি করিতেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সে কৌতূহলী।

"খড় বাঁশ আর গাছের ছোট ছোট ডাল দিয়ে। পাতা-সুদ্ধ ডাল কেটে আরও তৈরি করতে হয়, যাতে বাঘ বুঝতে না পারে যে গাছের উপর কেউ বসে' আছে, বা গাছের উপর মাচা বাঁধা হয়েছে"

"ওতে কি মাচান বেশ মজবুত হয়—?"

ঘোটন পুনরায় প্রশ্ন করিয়া ভ্রাতা লোটনের দিকে চাহিল। সে যে বোকা নয়, বুদ্ধিমান—তাহা কনিষ্ঠ ভ্রাতা লোটনের নিকট জাহির করিবার কোনও সুযোগ সে ত্যাগ করে না। লোটনের ধারণা ঘোটন জ্যেষ্ঠ বটে, কিন্তু উজবুক। কনিষ্ঠের এ ধারণা অপনোদন করিবার জন্য সে সর্বদা ব্যগ্র। দুই ভাই অনেকদিন পূর্বেই পৃথক হইয়া গিয়াছে। কন্ট্রাক্টারি করিতে গিয়া ঘোটন প্রায় সর্বস্বান্ত, অর্থের প্রয়োজন ঘটিলে লোটনের কাছে হাত পাতিতে হয়, লোটনও যতটা পারে জ্যেষ্ঠকে সাহায্যই করে, কিন্তু জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে তাহার ধারণা উচ্চ নহে।

কৃষ্ণকান্ত উত্তর দিলেন, "যতটুকু হয় কাজ চলে যায় তাতে। একজন বা বড় জোর দু'জন এক রাত্তির বা দু' রাত্তির কাটাতে পারলেই হল। চুপ করে' বসে' থাকা ছাড়া তো কাজ নেই। বেশী মজবুত করতে গিয়ে মহাফ্যাসাদে পড়েছিলাম একবার—"

"কি রকম—"

ঘোটনই প্রশ্ন করিল আবার।

রামপ্রসাদ অর্ধ-স্বগতোক্তি করিল—'লোটন এবার আর টাকা দিচ্ছে না।'

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "একবার একটা গাছের উপর ছোট একটা চৌকি তুলিয়ে তার পায়াগুলো বেশ মজবুত করে' বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম গাছের ডাল-পালার সঙ্গে। খুব মজবুত হয়েছিল। অনেকগুলো 'বাগ' মেরেছিলাম। প্রায় শতখানেক হবে"

"বলেন কি?"

"হ্যাঁ হে, অসংখ্য ছারপোকা ছিল চৌকিটাতে—"

জিলন এবং দেওনাথ খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজি পড়িতেছে, 'বাগ' মানে যে ছারপোকা তাহা তাহারা জানে। যাহারা ইংরেজি জানে না তাহারা ব্যাপারটার রস ঠিক উপভোগ করিতে পারিল না। জিনল জিজ্ঞাসা করিল—"আসল বাঘ শিকারের কি হল ?"

"হল না। বাঘ এল, সামনে দিয়ে হেলতে দুলতে চলে গেল। আমি রাইফেল তোলবার পর্যন্ত সময় পেলাম না। চৌকির বাগ সামলাতে আমি ব্যস্ত তখন। তারপর থেকে গাছের ডাল দিয়েই মাচা বানাই—"

শিউনাথ একটু অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

বলিল, "তারপর কি হল বলুন। বিকেলে গিয়ে সেই মাচানে চড়লেন ?"

"আপনি গাছেও চড়তে পারেন বুঝি"

"পারি। কিন্তু ওটাতে চড়েছিলাম মই দিয়ে। অনেক উঁচুতে মাচা বাঁধতে হয় কিনা। মাটি থেকে অন্তত চল্লিশ ফুট উঁচুতে—"

"অত উঁচুতে কেন"

"তা না হলে বাঘে ধরবার সম্ভাবনা থাকে। বাঘ উনিশ কুড়ি ফুট অনায়াসে উঠে পড়তে পারে—"

প্রিয়গোপাল বিস্মিত হইল এ কথায়।

"গাছে চড়ে যায় বিল্লির মতো !"

"হ্যাঁ, বিল্লিরই জাত তো"

এইবার প্রিয়গোপাল অদ্ভুত প্রশ্ন করিল একটা।

"আচ্ছা, বাঘ বিল্লির মতো মুসা ভি খায় ?"

মুসা মানে ইঁদুর।

"বাঘ না খায় এমন জিনিস নেই। গরু মহিষ ছাগল ভেড়া হরিণ, শম্বর, নীলগাই, শেয়াল কুকুর এমন কি বাঘ পর্যন্ত। শুনেছি কাকের মাংস কাকে খায় না, কিন্তু বাঘের মাংস বাঘে খায়"

"তা হলে মুসা ভি খায় জরুর—"

"এক-একবারে হাজার খানেক মুসা না খেলে তো ওর পেটই ভরবে না। মেহনতে পোষাবে না—"

"পেলে খায় জরুর"

শিউনাথ ধমকাইয়া উঠিল।

"আরে ভাই বেকার কচকচ নেহি করো। বলুন আপনি গল্প বলুন—"

রামপ্রসাদ যোগেনের কানে কানে চুপি চুপি বলিল—"মুসাতে ওর বোরা বোরা ভুসি কেটে সাফ করে' দিচ্ছে। তাই বাচ্চুর মুসার উপর রাগ। তিনটে বিল্লি পুষেছে—"

উচ্চকণ্ঠে সে কৃষ্ণকান্তকে বলিল, "জামাইবাবু আপনি এবার গিয়ে ওকে একটা বাঘের বাচ্চা পাঠিয়ে দিন। তা না হ'লে ওর ভুসির ব্যবসা তো গেল—"

"ফাজলামি করিও না রামপ্রসাদ বলে দিচ্ছি"

"তোমরা গল্প শুনবে, না, ঝগড়া করবে"—আবার ধমকাইয়া উঠিল শিউনাথ। কৃষ্ণকান্ত ইতিমধ্যে একটি দিয়াশলাই কাঠি কানে ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিয়া কান চুলকাইতে ছিলেন। সকলে থামিয়া গেলে আবার শুরু করিলেন।

"তিনটে নাগাদ মাচার উপর গিয়ে উঠে বসলাম। বনের ভিতর তিনটের সময়ই মনে হয় সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অ্যালফ্রেড উঠল আর একটা গাছে, সেটার উপরও মাচা বানানো হয়েছিল। তার কাছেও একটা রাইফেল ছিল"

কৃষ্ণকান্ত পুনরায় কর্ণ-বিবরে কাঠি ঢুকাইয়া চক্ষু বুজিলেন।

"তারপর ?"

"তারপর চুপচাপ বসে রইলাম। বাঘ-শিকারে এই বসে' থাকাটাই সব চেয়ে কষ্টকর। শুধু বসে থাকা নয়, একেবারে স্থির

হয়ে বসে' থাকা। অনড়, অচল হয়ে বসে' থাকতে হবে। সিগারেট খাওয়া চলবে না, নস্যি নেওয়া চলবে না—"

"কেন—"

শিউনাথ প্রশ্ন করিল এবার। সে একটি পাকা সিগারেট-খোর। তখনও তাহার হাতে জ্বলন্ত সিগরেট ছিল একটি। সিগারেট-হীন হইয়া এক নিদ্রা দেওয়া ছাড়া যে আর কিছু করা সম্ভব তাহা তাহার চিন্তার অতীত।

"সিগারেটের গন্ধ পেলে বাঘ সরে' পড়ে। তার সন্দেহ হয়। যে কোনও অস্বাভাবিক গন্ধ পেলেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে সে। বড় বড় শিকারীরা আতর এসেন্স মেখেও শিকারে যেতে বারণ করেছেন। বাঘের ঘ্রাণশক্তি আর শ্রবণশক্তি দুই-ই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। চোখের দৃষ্টিও। তাই রংচঙে ডগমগে জামা-কাপড় পরেও শিকারে যাওয়া মানা। খাকি কিম্বা পাঁশুটে রঙের পোষাক ছাড়া অন্য কিছু চলে না। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বেমালুম মিশে যাওয়া চাই। ঢিলে-ঢালা কাপড় পাঞ্জাবিও চলবে না, হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরতে হবে। বাঘ যদি গাছের দিকে তাকায় এবং শিকারীকে যদি দেখতেও পায়—তা হলেও সে যেন ভাবে ওটা গাছেরই একটা অংশ। এই ভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে' থাকতে হবে"

যোগেন এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, এইবাঁর বলিল।

"এ তো তা হলে একটা তপস্যা বলুন"

"নিশ্চয়, তপস্যা বই কি। একটু শুধু তফাত আছে, তপস্বী চায় ভগবান, শিকারী চায় বাঘ"

এ রসিকতায় অনেকেই হাসিয়া উঠিল, হাসিল না প্রিয়গোপাল।

তাহার কেমন যেন খটকা লাগিল। কোনও যুক্তির বা উক্তির খুঁত থাকিলে তাহার মন হোঁচট খায়। সে ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "খালি বাঘ চায়? ভালুক, শুয়োর ইসব?"

"হ্যাঁ, ইসবও চায়। আমারই ভুল হয়েছে, বলা উচিত ছিল,

শিকার চায়। তবে যে শিকারী বাঘের আশায় বসে আছে সে ভালুক বা শুয়োর দেখে ফায়ার করবে না। করলে বাঘ ভড়কে যাবে”

“তারপর কি হল বলুন—”

“গাছে মাচার উপর ঠায় বসে রইলুম ঘণ্টা দুই। তারপর হঠাৎ ময়ূরের ডাক শোনা গেল। বুঝলাম বাঘ বেরিয়েছে এবার—”

“বাঘ বেরুলে ময়ূর ডাকে নাকি”

“হ্যাঁ, আর ডাকে এক রকম হরিণ, ইংরেজিতে তার নাম ‘বার্কিং ডিয়ার’, ওদেশে বলে কোটরা হরিণ। এদের ডাক শুনলে শিকারীরা বুঝতে পারে বাঘ বেরিয়েছে।

অনেক সময় শম্বরের ডাকও শোনা যায়—”

“শম্বর কি?”—প্রিয়গোপাল জিজ্ঞাসা করিল।

“এক জাতের বড় হরিণ”

“ভঁইসের মতো? না, তার চেয়েও বড়ো—”

সঙ্গে সঙ্গে ধমক দিল শিউনাথ।

“কি পাগলের মতো যা তা জিগ্যেস করছ। আপনি গল্প বলুন জামাইবাবু। ওর কথায় কান দেবেন না।”

প্রিয়গোপাল রুখিয়া উঠিল।

“আমার যা জানবার তা জেনে লিব না? তুমি আমাকে মানা করবার কে আছে। জামাইবাবুকে আর ক’দিন পাব। যা শিখবার শিখে লি—”

কলহের উপক্রম হইল।

কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, “শম্বর বেশ বড় হরিণ। একটা গরুর মতো প্রায়। খুব প্রকাণ্ড শিং থাকে ওদের মাথায়। ডাল-পালা-ওলা চমৎকার শিং—”

রামপ্রসাদ ফোড়ন দিল—“তুই ভঁইস্ বেচে দিয়ে একটা শম্বর কেন গোপলা। জামাইবাবু, শম্বর কিনতে পাওয়া যায় কি—”

প্রিয়গোপাল রামপ্রসাদের দিকে একটা অগ্নি-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

"বলুন, আপনি তারপর কি হ'ল। এদের কথার জবাব দিতে গেলে আর গল্প বলা হবে না আপনার"

শিউনাথ একটু অধির হইয়া পড়িয়াছিল।

"একটু পরেই বাঘটা দেখা গেল। অ্যাল্‌ফ্রেড্‌ ঠিক খবরই দিয়েছিল। নদীর বাঁকে এসে জল খাচ্ছে। করলাম ফায়ার। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠল বাঘটা। গুলি লেগেছে কিনা বুঝতে পারলাম না, কারণ লাফিয়ে উঠেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় গুলি মারবার আর ফুরসৎ পাওয়া গেল না"

"গুলি নিশ্চয় লাগলে পড়ে' যেত না কি"

"গুলি যদি মাথায় লেগে ব্রেনে ঢোকে, কিম্বা বুকে লেগে হার্টে ঢোকে—তাহলেই বাঘ সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। অন্য জায়গায় লাগলে পড়ে না। তখন একটা গুলিকে ওরা গ্রাহ্যও করে না। পায়ে কিম্বা ঘাড়ে গুলি খেয়ে অনেক দূর চলে' যেতে পারে। আর সেই চোট্ খাওয়া বাঘ বড় সাংঘাতিক হ'য়ে ওঠে তখন—"

"কি করলেন আপনি—"

"দু'এক মিনিট চুপ করে' বসে' থেকে আর একটা ফায়ার করলাম যে বনে সে লাফিয়ে ঢুকেছিল সেই বনটাকে লক্ষ্য করে'। অ্যালফ্রেডও তাই করলে"

"কেন—"

"যদি বাইচান্স লেগে যায় আরও ঘায়েল হবে, কিম্বা তেড়ে-ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে চার্জ করবে, কিম্বা আরও দূরে যাবে—"

এইবার গল্পটা জমিয়াছিল।

উৎসুক শিউনাথ এমন মুখভাব করিয়া শুনিতেছিল যেন সে-ই এই দারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছে।

"কি হ'ল দ্বিতীয়বার ফায়ারের পর"

"সরেই পড়ল। আর দেখতে পেলাম না। তখন একটা 'সিটি' মেরে অ্যালফ্রেডকে ডাকলাম। সে-ও সিটি মেরে সাড়া দিলে—"

"সিটি ?"

"হ্যাঁ, মুখে আঙুল পুরে খুব জোরে সিটি দেওয়া যায়। বনে জঙ্গলে মনে হয় কোনও পাখী বুঝি ডেকে উঠল। শিকারীরা সিটি দিয়ে পরস্পরের খবর নেয়। সিটি শুনে অ্যালফ্রেড্ নেবে এল, আমিও নাবলুম"

"তারপর ?"

"তারপর বন্দুক রি-লোড করে' রওনা দিলুম বাড়ির দিকে। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে, বনের মধ্যে অন্ধকার। একটা বাঘের উপর গুলি চলে' গেছে কিন্তু সে মারা পড়েনি। এ অবস্থায় বনের ভিতর দিয়ে হাঁটা খুবই দুঃসাহসিক কাজ। কিন্তু প্রাণ হাতে করেও অনেক সময় এরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে হয়। অনেকে এই করতে গিয়ে মারাও পড়ে। কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা সেবার বেঁচে গেলাম। বরং জঙ্গল থেকে বেরিয়েই চিতল পেয়ে গেলাম একটা—"

"চিতল মাছ ?"

"না, চিতল হরিণ। রাত্রে গিয়ে মাংসের ঝোল আর ভাত খাওয়া গেল"

"হরিণের নামও চিতল হয় না কি"

"হ্যাঁ। গায়ে চিতা চিতা দাগ থাকে বলে ওদের নাম চিতল"

"বাঘটাকে ছেড়ে দিলেন ?"

"পাগল! ও বাঘকে কখনও ছেড়ে দেওয়া যায়। পরদিনই তার খোঁজ করবার জন্য লোক লাগালাম। বিকেলে অ্যাল্ফ্রেডের এক অনুচর এসে খবর দিলে যে সে রক্তের দাগ দেখতে পেয়েছে, শুধু দেখতে পায়নি, রক্তের দাগ ধরে' ধরে' সে অনেকদূর পর্যন্ত গিয়েছে। তার ধারণা নদীর ওপারে যে দুটো পাহাড় পাশাপাশি আছে বাঘটা সেই পাহাড় দুটোর মাঝখানের সঙ্কীর্ণ গলির মতো জায়গায় ঢুকে

বসে আছে। সে দুর্গম স্থান। দু' পাশে খাড়া পাহাড়, মাঝখানের সঙ্কীর্ণ জায়গাটুকু কাঁটার জঙ্গলে পরিপূর্ণ, তাছাড়া তার ভিতর দিয়ে একটা ঝরনার ধারাও বেরিয়ে আসছে। সেখানে ঢুকে বাঘ শিকার অসম্ভব”

“কি করলেন তাহলে—”

“অবস্থা অন্য রকম হ'লে ছেড়ে দিতাম, কিন্তু যে বাঘ গুলি খেয়েছে তাকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। তাকে মারতেই হবে এই শিকার-শাস্ত্রের আইন। ছেড়ে দিলে ওই জখম বাঘরাই শেষে মানুষ-খেকো বাঘ হবে। সুতরাং সেইখানে লোক মোতায়েন করে' রাখা হ'ল বাঘটা বেরোয় কি না, দেখবার জন্য। কাছাকাছি সুবিধে মতো জায়গা বেছে মাচাও বাঁধা হ'ল একটা, আর একটা ছাগল বেঁধে রাখা হ'ল সেই মাচার কাছাকাছি। আর দিনরাত সেখানে বসে' পাহারা দিতে লাগলাম আমরা। প্রথম দিন এল না, দ্বিতীয় দিনও এল না। তবু দোনো-মোনো করে' তৃতীয় দিনও বসলাম গিয়ে মাচায়। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও পাত্তা নেই। ছাগলটা সমানে ডেকে চলেছে। মশার কামড় অগ্রাহ্য করে' ঠায় বসে' আছি। পাশে অ্যাল্‌ফ্রেড। হঠাৎ ছাগলের ডাকটা পট করে' থেমে গেল, বাঘের গোঙরানি আওয়াজও পেলাম। অ্যাল্‌ফ্রেড সঙ্গে সঙ্গেই (spot light) ফেলতেই দেখতে পেলাম বাঘটা ছাগলটাকে ধরেছে। ছাগলটা ছটফট করছে আর বাঘটা সেইখানেই বসে' তার ঘাড় কামড়ে ধরেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলাম। আবার লাফিয়ে উঠল ব্যাটা, এবার কিন্তু আর পালাতে পারল না, পড়ে গেল সেইখানেই। আর একটা ফায়ার করলাম। ব্যাঘ্র-লীলা শেষ হল তার—”

“প্রথম গুলিটা লাগেই নি?”

“লেগেছিল, ভাল করে' লাগে নি। ঘাড়ে লেগেছিল, কিন্তু বেঁধে নি!”

"দ্বিতীয় গুলিটা মাথায় লেগেছিল, আর তৃতীয়টা পেটে"

বাঘের গল্প আরও কিছুদূর হয়তো চলিত, কিন্তু পোস্টমাস্টারবাবু আসিয়া একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। দেখা গেল, ডাকের চিঠি-পত্র তিনি নিজেই বহন করিয়া আনিয়াছেন। চিঠিগুলি কৃষ্ণকান্তের হাতে দিয়া সহসা তিনি করজোড়ে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, "জামাইবাবু, আমি গরীব। আমাকে রক্ষা করুন—"

কৃষ্ণকান্ত বিস্মিত হইলেন।

"কি ব্যাপার, কে আপনি ?"

"আমি এখানকার পোস্টমাস্টার। নতুন এসেছি বদলি হ'য়ে। এখানকার হাল-চাল কিছুই জানি না। বড়ই বিপদে পড়ে' গেছি জামাইবাবু—"

"কেন, কি হ'ল"

"একদিন রাত্রে একটা জরুরি তার এল কুমারবাবুর নামে। রাত্রে তার এলে এখানে রাত্রে সেটা ডেলিভারি হয় না, কারণ কোনও পিওন রাত্রে থাকে না। 'তার'টা সকাল বেলা পাঠিয়ে দিলাম। রাধানাথবাবু বলছেন—অত জরুরি তার আমার নিজেরই এসে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। পোস্টমাস্টার নিজে বাড়িতে গিয়ে 'তার' দিয়ে আসবে এ রকম কানুন তো কোথাও নেই—"

শিউনাথ মন্তব্য করিল—"এখানকার কানুন আলাদা, আপনার দিয়ে আসাই উচিত ছিল। আপনার আগে ছিলেন নিয়ামৎআলী, জরুরি তার রাত্রে এলে নিজেই দিয়ে যেতেন বাড়িতে। দুঃসংবাদ থাকলে খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিনা সে খবর জেনে তবে দিতেন। ডাক্তারবাবুর বাড়ির 'তার', আপনার দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল বই কি"

"আমি নতুন লোক, কিছুই জানতাম না"

কৃষ্ণকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাতে হয়েছে কি। আর আমাকেই বা এর মধ্যে জড়াচ্ছেন কেন, আমি কি করতে পারি"

"আপনি রাধানাথবাবুকে বলুন একটু, তিনি আমার নামে রিপোর্ট করেছেন। আপনি জামাই মানুষ, আপনার অনুরোধ উনি রাখবেন"

"রাধানাথবাবুর রিপোর্ট কি খুব মারাত্মক হবে ?"

"হবে। তিনি আমার নামে লিখেছেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে, তিনি ওঁর জামাই। আর পোস্টাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমার নামে লম্বা এক ডি. ও. এসেছে জবাবদিহি চেয়ে—আমি কেন পাবলিকের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করছি। তাতে আরও লেখা আছে—এন্‌কোয়ারি করবার জন্যে একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টার আসবেন, আমি যেন সেজন্য প্রস্তুত থাকি। দোষ সাব্যস্ত হ'লে শাস্তি হবে। মানে, রাধানাথবাবু যা বলবেন তাই হবে। আমি বিরুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তিনিই টেলিগ্রামটা করেছিলেন, তিনি খুব চটে আছেন দেখলাম। বললেন, আমার শাস্তি হওয়াই উচিত। কুমারবাবু বললেন, আমি ওসবের মধ্যে থাকতেই চাই না। আমি রাধানাথবাবুকে কিছু বলতে গেলে তিনি আমাকেই ধমকে দেবেন। আপনি যদি কাকাবাবুকে দিয়ে বলাতে পারেন কাজ হবে, উনি কাকাবাবুর ছাত্র। চন্দ্রবাবুর কাছে গেলাম। তিনি ভদ্র ব্যবহার করলেন খুব। আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর আমি ব্রাহ্মণ শুনে আমার পিতার নাম, পিতামহের নাম, প্রপিতামহের নাম, অতিবৃদ্ধপিতামহের নাম এই সব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ঠাকুরদার বাবা কিম্বা ঠাকুরদার নাম আমি জানতাম না। এইতেই খুব চটে' গেলেন তিনি মনে হল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—গায়ত্রী জানি কিনা। গায়ত্রী সেই বিশ বছর আগে শিখেছিলাম, তা কি আর মনে আছে? বললাম সে কথা। তখন তিনি প্রশ্ন করলেন, সন্ধ্যাহ্নিক করেন না রোজ? সত্যি কথাই বলতে হল, করি না। এ শুনে তিনি ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ আমার দিকে, তারপর ভিতরের দিকে চলে গেলেন। বুঝলাম, সুবিধা হবে না। যোগেনবাবু তখন বললেন, আপনি জামাইবাবুদের মধ্যে কাউকে যদি অনুরোধ করেন, তাহলে হয়তো কাজ হবে। জামাইদের খাতির হয়তো উনি রাখবেন। আপনি যদি একটু দয়া করেন গরীবের উপকার হয়—"

কৃষ্ণকান্ত একটু বিব্রত বোধ করিতে লাগিলেন।

"আমার সঙ্গে তেমন আলাপ তো নেই ভদ্রলোকের, তবে আপনি যখন এত করে' বলছেন তখন অনুরোধ করে' দেখব। ওই যিনি মুখের সামনে মাঝে মাঝে হাত চাপা দেন, তিনিই তো রাধানাথবাবু—'

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, তিনিই—"

"আচ্ছা, আমি বলব"

পোস্টমাস্টারবাবু চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদ তাঁহার প্রস্থান পথের দিকে চাহিয়া মন্তব্য করিল—"লোকটা একের নম্বর হারামি। ঠিক করেছেন রাধানাথবাবু—"

কৃষ্ণকান্ত হাসিয়া বলিলেন, "কিছু তো দোষ করে নি বেচারা। আইনত ওর কোন দোষ নেই"

"সব সময় আইন চালাতে গেলে কি চলে' জামাইবাবু। সেদিন আমার মাত্র পাঁচ মিনিট দেরি হয়েছিল, মনি-অর্ডারটা নিলে না"

রমেশবাবু আসিয়া হাজির হইলেন।

রামপ্রসাদ বলিল, "এই রমেশবাবুকে জিগ্যেস করুন না।"

রমেশবাবু জিজ্ঞাসুদৃষ্টি কৃষ্ণকান্তের মুখের উপর নিবদ্ধ করিলেন।

"এই এখানকার পোস্টমাস্টারবাবুর কথা হচ্ছে"

"এসেছিল বুঝি তোমার কাছে। তুমি রাধানাথকে বললে হয়তো বেঁচে যাবে বেচারা। তা না হলে ওর অদৃষ্টে দুঃখ আছে"

"যা শুনলাম তাতে মনে হচ্ছে বেচারার তেমন দোষ নেই বিশেষ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে টেলিগ্রাম আর কোন পোস্টমাস্টার দিয়ে আসে বলুন—"

রমেশবাবু চক্ষু দুইটি ঈষৎ বিস্ফারিত করিয়া গম্ভীর হইয়া গেলেন।

রমেশবাবুর মুখখানা চাকার মতো গোল এবং তালের মতো নিভাঁজ। চক্ষু দুইটি বড় বড় এবং রক্তাভ। বেশ ভারিক্কি গোছের

চেহারা। যখন কাহারও সহিত কথা বলেন বাম হাতটি পিছন দিকে কোমর এবং পিঠের সন্ধিস্থলে স্থাপন করেন। তিনি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কৃষ্ণকান্তের মন্তব্যটি প্রণিধান করিলেন। তাহার পর পুনরায় কৃষ্ণকান্তের দিকে মুখ ফিরাইলেন। পৃষ্ঠস্থ বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি একবার খুলিয়া আবার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। উত্তেজিত হইলে এরূপ করেন।

"দেখ বাবা, যস্মিন দেশে যদাচারঃ। আমাদের এ গ্রামটি ছোট এবং সেকেলে। অনেক কিছুই নেই এখানে। ট্রাম, মোটর, ফোন, সিনেমা—এসব কিছু নেই। কিন্তু একটা জিনিস আছে। এখনও আছে। এই গ্রামের ডাক্তার, মাস্টার, দারোগা, স্টেশন মাস্টার, পোস্ট মাস্টার, কাছারির ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা, মানে গ্রামের ছোট বড় সবাই আমরা একটি পরিবারের মতো বাস করি। এতকাল করে এসেছি, আর যতদিন আমরা থাকব ততদিন করব। আমাদের পরস্পরকে পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ নিতে হবে। এই এখানকার আইন—অন্য কোন আইন চলবে না এখানে। খোদ লাট সাহেবও যদি এখানে বাস করতে আসেন তাহলে তাঁকেও আমার দাওয়ায় বসে গুড়ুক টানতে টানতে পাশার আড্ডায় বসতে হবে। এখনও এই ভাবটি বজায় আছে আমাদের। আমরা যতদিন আছি। ওই টেলিগ্রামটি রাত্রে না দিয়ে ওই পোস্টমাস্টার গ্রামসুদ্ধ লোককে চটিয়েছে। ওই বুড়ো ডাক্তারবাবু আমাদের গ্রামের মাথা। তাঁকে আমরা দেবতার মতো ভক্তি করি। শুধু আমরা কেন, এ অঞ্চলের সবাই করে। তাই তাঁর নাত-বোয়ের সাধ দেওয়া হবে বলে দশখানা গাঁয়ের মাতব্বরেরা মাথা ঘামাচ্ছে। ওঁর টেলিগ্রামটা আটকে রাখা উচিত হয় নি ছোকরার। ওঁর অপমানে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ হয়েছি। কোনও গয়লা ওকে দুধ দেয় নি তা জান? কুমারই ওকে দুধ পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরকম ব্যাপার শুধু আজ নয়, বরাবরই চলে আসছে। ডাক্তারবাবুকে অপমান করে' কেউ রেহাই পায় নি

কখনও। অনেকদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল। শুনবে ?”।

“বলুন”

“তখন আমি নেহাৎ ছেলে মানুষ, সবে এসে স্টেটের চাকরিতে বাহাল হয়েছি। ডাক্তারবাবুর তখন তুমুল প্র্যাক্‌টিস্। তিনটে বড় বড় ঘোড়া বাঁধা বাড়িতে। আর সে সব কি সাধারণ ঘোড়া ? বড় বড় পাহাড়ী ঘোড়া। সাধারণ ঘোড়া ওঁকে বইতেই পারত না। একটা ঘোড়া ক্লান্ত হ'লে আর একটা ঘোড়ায় চড়তেন। সেটা ক্লান্ত হ'লে আর একটায়। এ অঞ্চলের সর্বত্র ডাক তখন ওঁর। মালদ থেকে পর্যন্ত কল আসত। হাতী আসত, নৌকো আসত, পালকি আসত, সে একদিনই ছিল আলাদা। ডাক্তারবাবু প্রায় সমস্তদিন বাড়ির বাইরেই থাকতেন। ফিরতেন রাত্রি বেলা। ফিরেই থিয়েটারের রিহার্সালে আসতেন। ওঁর বাড়িতেই থিয়েটারের আখড়া ছিল তখন”

“উনি থিয়েটার কর'তন না কি”

“করতেন মানে”

রমেশবাবু সবিস্ময়ে ভ্রূযুগল উত্তোলন করিলেন।

“উনি যদি ডাক্তারি না করে' পেশাদার অভিনেতা হতেন তাহলে গিরিশ ঘোষ দানীবাবুর মতোনই হতে পারতেন। সীতার বনবাসে উনি রামের পার্ট যা করতেন তেমনটি আর কখনও দেখি নি। সন্ধ্যেবেলা হাসপাতালে রোজ রিহার্সাল হ'ত। এ হাসপাতাল তখন ছিল না। তখন ছিল মাটির প্রকাণ্ড একটা চোয়ারি। মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা ঘর, চার-পাশে বড় বড় বারান্দা। প্রত্যেক বারান্দার কোণে কোণে ঘর। মাঝের বড় ঘরটায় রিহার্সাল হ'ত। রিহার্সাল দেবার জন্যে বাইরে থেকেও লোক আসত, কাটিহার থেকে সাহেবগঞ্জ থেকে প্রায়ই আসত অনেক ছোকরা। বলাবাহুল্য, বিনা-টিকিটেই আসত সবাই। সবই তো চেনা-শোনা

ছিল। এখনকার স্টেশনে এসে কেউ যদি বলত—'ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যাব'—কেউ আর টিকিট চাইত না। এই রেওয়াজ ছিল। হঠাৎ এক নতুন টিকিট কালেক্টার বদলি হ'য়ে এল। ছোকরা যেমন তিরিক্ষি মেজাজের, তেমনি দুর্মুখ। একদিন তার খপ্পরে পড়ে গেল কাটিহারের ভূষণ। আলিবাবার রিহার্সাল হচ্ছে তখন, ভূষণ আবদাল্লা সাজবে, সপ্তাহে দু'দিন রিহার্সাল দিতে আসে। যথারীতি সে উইদাউট্ টিকিটে এসেছে। নতুন টিকিট কালেক্টার টিকিট চাইতে সে যথারীতি বলেছে, ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব। নতুন টিকিট কালেক্টার কপালের উপর ভুরু তুলে বলে উঠল—'ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব মানে? ডাক্তারবাবু কি রেল-কোম্পানীর মালিক, না জামাই? ডাক্তারবাবুর ওখানে যাব বললেই ছেড়ে দিতে হবে!' ভূষণ রুখে উঠল এ কথায়। পকেট থেকে পেনালটি সুদ্ধ গাড়ি-ভাড়া বার করে বললে, 'ডাক্তারবাবু কে, তা দু'দিন পরে জানতে পারবেন। এই নিন্, ভাড়া নিয়ে রসিদ দিন আমাকে। রসিদটি পকেটে পুরে চলে এল ভূষণ। ডাক্তারবাবু সেদিন এক দূরের কলে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন—শক্ত রোগী, ফিরতে হয়তো দিন দুই দেরি হবে। তবু আমাদের রিহার্সাল বসল। ভূষণ আমাদের কারো কাছে কথাটি ভাঙলে না। চুপি চুপি ভাঙলে কেবল উদিৎ সিংয়ের কাছে। উদিৎ সিং নামে ডাক্তারবাবুর এক সিপাহী ছিল তখন। লিক্‌লিকে সরু চেহারা, কিন্তু খাপ-খোলা তরোয়াল একটি। সর্বদাই মারমুখী হ'য়ে থাকত। তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত সবাই। ডাক্তারবাবুর জমি বাসন ঘর দুয়ারের সেই ছিল রক্ষক। ডাক্তারবাবুকে ভক্তি করত দেবতার মতো। তার চোখের দৃষ্টিতে আগুন ধরে গেল, যেই সে শুনলে যে নতুন টিকিটকালেক্টার ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে অপমানসূচক কথা বলেছে। তারপর দিন হাটবার ছিল। ডাক্তার-খানার সামনেই হাট। তারপর দিন টিকিটকালেকটার এসেছে হাট

করতে। আর যাবে কোথা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর উদিৎ সিং, গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এল তাকে হাসপাতালের সামনে। বললে, "ডাক্তারবাবুর নামে কাল কি বলেছ হারামজাদা, শুয়ার কি বাচ্ছা, এখন তোমার কোন বাপ তোমাকে বাঁচাবে—"। জুতিয়ে লোকটাকে শুইয়ে ফেললে। নাক দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল। সে এক হৈ হৈ কাণ্ড। "ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি কল থেকে। এক ডাক্তারবাবু ছাড়া উদিৎ সিংকে রোখবার সামর্থ্য আর কারও ছিল না। উদিৎ সিং লোকটাকে জুতিয়ে গলা-ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। বললে, 'যাও শালা, অর ঘরমে যাকে হালুয়া খাও!' সে কিন্তু ঘরে গেল না, গেল থানায়। থানার দারোগা ছিলেন তখন হর্‌চন্দন সিং। ডাক্তারবাবুর পরম বন্ধু। একটা অজ্ঞাতকুলশীল লোক তাঁর চাকরের নামে নালিশ করতে এসেছে দেখে একটু অবাক হলেন তিনি। তাঁর এক হাবিলদারকে ডেকে বললেন, তুমি একটু খোঁজ করে' এসো তো, ব্যাপার কি। হাবিলদারের সঙ্গে উদিৎ সিংয়েরই দেখা হয়ে গেল। বন্ধুত্বও ছিল দু'জনের। তার কাছ থেকে সমস্ত ব্যাপার শুনে দারোগা হরচন্দন সিং উপরের ঠোঁটের উপর নীচের ঠোঁটটি চড়িয়ে দাড়ির ভিতর আঙুল চাপালেন খানিকক্ষণ। চমৎকার চাপ-দাড়ি ছিল তাঁর। তারপর হাবিলদারকে আড়ালে ডেকে বললেন, "এই লোকটিকে আমি হাসপাতালে পাঠাব মেডিকেল রিপোর্টের জন্য। তুমি কম্পাউণ্ডারবাবুকে বলে' এস সে যেন এর জামায় খানিকটা অ্যালকহল ঢেলে দেয়; আর আমাকে যেন চিঠি লিখে জানায় যে লোকটা মত্ত অবস্থায় হাটে এসেছিল প্রথমে, তার পর হল্লা করতে করতে হাসপাতালে এল, তাই উদিৎ সিং ওকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, আর সেই জন্যেই পড়ে গিয়ে নাকে লেগেছে ওর।" হাবিলদার চলে যাবার পর টিকিট-কালেক্টারকে বললেন, "আপনি আগে হাসপাতালে যান, সেখান থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসুন, তারপর আপনার ডায়েরি লিখব।" হাসপাতালে ফিরে এল

সে। হাসপাতালে কম্পাউণ্ডার তখন হাবুল মামা। ওই যে পাকা চাপ-দাড়ি, ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই তখন ছিল কম্পাউণ্ডার। সে লোকটার গা ড্রেস করবার ছুতোয় তার জামায় কাপড়ে বেশ করে' অ্যালকহল ঢেলে দিলে, আর দারোগা সাহেব যেমন লিখতে বলেছিল তেমনি লিখে দিলে। সেই রিপোর্টটি নিয়ে যেতেই দারোগা সাহেব হুকুম দিলেন—একে অ্যারেস্ট করে' 'ঠান্ টি' ঘরে রেখে দাও। আমি এন্‌কোয়ারি করে' দেখি আগে কি হয়েছে। কম্পাউণ্ডারবাবু যা লিখেছেন তাতো ভয়ানক। 'ঠান্‌টি' ঘর মানে ঠাণ্ডা ঘর, যে ঘরে ঢুকলে মাথা ঠাণ্ডা হয়, অর্থাৎ গারদ। হাবিলদার সঙ্গে সঙ্গে তাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে তালা মেরে দিলে। কিছুক্ষণ পরেই কান্নাকাটি পড়ে' গেল ছোকরার বাড়িতে। তার কচি বউ কাঁদতে কাঁদতে এসে হাজির হল ডাক্তারবাবুর অন্দরমহলে একেবারে বৌদির কাছে। ডাক্তারবাবু তখনও ফেরেন নি। বৌদিও তখন ছেলেমানুষ। তিনি তাকে আশ্বাস দিলেন যে সব ঠিক হয়ে যাবে, তাকে খেতে দিলেন। মেয়েটি বসে রইল। ডাক্তারবাবু ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সব ঠিক হয়েও গেল। তিনি ফিরে এসেই ছোকরাকে হরচন্দনের কবল থেকে উদ্ধার করলেন। উদিৎ সিং আর ভূষণকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন আর একটা কাজও করলেন তিনি। ওই টিকিটকালেক্‌টার কোয়ার্টার পায় নি, আর একজনের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মানে, একেবারে আপন করে নিলেন তাকে। সে এখন কোথায় আছে জানি না, কিন্তু যদি বেঁচে থাকে আর খবর পায় যে ডাক্তরবাবুর সঙ্গিন অসুখ তাহলে ঠিক ছুটে আসবে, যেখানেই থাকুক। এই হচ্ছে এখানকার দস্তুর। ওই পোস্টমাস্টার টেলিগ্রাফটি আটকে রেখে বেদস্তুর কাজ করে' ফেলেছে। তুমি যদি ওকে বাঁচাতে পার বাঁচাও। কিন্তু রাধানাথ গোপ একটি জাঁতি-কল। ওর খপ্পরে পড়লে উদ্ধার পাওয়া শক্ত। তবে তুমি জামাই মানুষ, তোমার মান হয় তো রাখতে পারে। দেখ একবার বলে"

রমেশবাবু এ প্রসঙ্গে হয়তো আরও বক্তৃতা দিতেন কিন্তু পিছন হইতে নিখিলবাবুর ধমক খাইয়া থামিয়া গেলেন।

"রমেশ তুমি এখানে বেশ আড্ডায় জমে' গেছ দেখছি। আড্ডা পরে দিও, এখন পরিবেশনের ব্যবস্থাটা আগে ঠিক করে' ফেল দিকি। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই, কোন ব্যাচে কাকে নেবে লিষ্ট কর আগে—"

"আজ্ঞে সেইজন্যেই তো এদের কাছে এসেছি। এখানে চাঁই ক'জন আছে কি না। প্রিয়গোপাল, দেওনাথ, জিলন, ঘোটন, লোটন, রামপ্রসাদ—"

প্রিয়গোপাল বলিল, "হামাদের যা বলবেন তাই করব"

এ আলোচনাতেও বাধা পড়িল। হাসপাতাল হইতে একটা বুক-ফাটা আর্ত চীৎকার শোনা গেল। সকলেই সেদিকে ছুটিয়া গেলেন। দেখা গেল হাসপাতালের বারান্দায় বসিয়া একটি যুবতী কাঁদিতেছে, তাহার কোলে একটি শিশু। সে যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করা শক্ত। গতরাত্রে সে নাকি তাহার সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া ঘরে শুইয়াছিল, একটি শৃগাল কখন যে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটিকে মুখে করিয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছিল সে কিছুই জানিতে পারে নাই। একটু পরেই বাহিরে ছেলের কান্না শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, তখন বাহিরে গিয়া দেখে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। ছেলের হাতের খানিকটা চিবাইয়া দিয়াছে, ঘাড়েও দাঁত বসাইয়াছে। ছেলেটি তখনও বাঁচিয়াছিল। ডাক্তারবাবু তাহাকে পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন—বাঁচিবার আশা কম। খুব বেশী রক্তক্ষয় হইয়াছে। কৃষ্ণকান্ত একধারে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "বাঘ মানুষ খায় জানি, কিন্তু শেয়ালের এত বড় স্পর্ধা হবে তা ভাবতে পারিনি। আচ্ছা—"। তিনি আরও ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রোরুদ্যমানা জননীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। নিখিলবাবু দাঁড়ান নাই, তিনি কাছারির দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, তিনি সাধারণত জনতার ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলেন। রমেশবাবু

তখনও দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি শিউনাথকে বলিলেন, "ওহে, চল চল আর দেরি করা নয়। নিখিলবাবু চলে' গেছেন, হয় তো অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য—"

"আমাকে কি করতে হবে"

"পরামর্শ! তোমার মতো একটা মাথা সহায় থাকলে ভারী নিশ্চিন্ত হব আমি। নিখিলবাবু আমাকে পরিবেশনের ভারটা দিয়েছেন। নানা জাতের এতগুলি লোককে পরিবেশন করে' খাওয়ানো, বুঝতেই পারছ। ছ' ব্যাচ ছোকরা চাই. তুমি না সহায় হ'লে চলে ?"

বিনোদিত হইয়া শিউনাথ বলিল, "কিন্তু আমি মোটা মানুষ, আমি কি পরিবেশন করতে পারব ?"

"তোমাকে পরিবেশন করতে কে বলছে। তুমি পরামর্শ দাও, লোক জোগাড় করে' দাও। চল, প্রিয়গোপাল, লোটন. ঘোটন তোমারাও এস—"

রামপ্রসাদ বলিল, "ডাক্তারবাবুর অসুখ, অথচ বাড়িতে ধুম লেগে গেল দেখছি। অসুখের বাড়িতে সাধারণত কান্নাকাটি হয় এ ঠিক উল্টো হচ্ছে—"

"হবে না ? পুণ্যাত্মা লোক যে। এখন পৃথ্বীশ আর উশনা এসে পৌঁছলে বাঁচা যায়। প্রথম নাতবৌয়ের সাধে ওরা থাকবে না। এ কথা ভাবাই যায় না। এসে পড়বে ঠিক"

"সাধ কবে"

"আগামী শুক্রবার। চল, চল, নিখিলবাবু চটছেন এতক্ষণ"

সকলকে লইয়া রমেশবাবু কুঠির দিকে অগ্রসর হইলেন। জমিদারের কাছারি এখানে কুঠি নামে পরিচিত।

ভিতর হইতে গঙ্গা আসিয়া কৃষ্ণকান্তকে চুপি চুপি বলিল, "দিদি আপনাকে ডাকছেন—'

কৃষ্ণকান্ত অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হইলেন। বুঝিলেন অনেকক্ষণ অদর্শনের ফলে কিরণ চঞ্চল হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্ত সন্তর্পণে বাড়ির ভিতর ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে পাইলেন কিরণ ওদিকের বারান্দায় বসিয়া ফলের রস করিতেছে। কৃষ্ণকান্ত কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু কিরণ এমন ভাব দেখাইল যেন তাঁহাকে দেখিতেই পায় নাই। যেন তাহার সম্বন্ধে কোনও উদ্বেগও তাহার নাই।

"দূতের মুখে অন্য রকম খবর পেলাম"—মুচকি হাসিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, এইবার তুবড়ির মত ফাটিয়া পড়িল কিরণ।

"তোমাদের আক্কেলকে বলিহারি যাই। না হয় তোমরা এ বাড়ির জামাই-ই হয়েছ, কিন্তু গেরস্তর দুখের দিকে চাইবে না তা' বলে—"

"সর্বদাই তো চেয়ে আছি, এক দণ্ডও তো চোখ বুজি নি। চক্ষু কি আরও বিস্ফারিত করব ?"

"ক'টা বেজেছে জান"

"জানবার দরকার কি। আপিস তো নেই"

"তা' বলে সময়ে খাওয়া-দাওয়া করবে না ? বউদি কতক্ষণ বসে' থাকবে হাঁড়ি নিয়ে"

"ওতে বাধা দিও না। বউদির ওটা শখ। তা না হ'লে দুটো ঠাকুর আছে, পার্বতী আছে—"

"যাও না উনুন ধারে খানিকক্ষণ বসে' থাক না গিয়ে, তাহলে শখের মজাটা টের পাবে—"

"আমার শখের জন্যে আমিও মাচার উপর ঠায় বসে' থেকেছি রাতের পর রাত মশার কামড় সহ্য করে"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময় নেই আমার। রান্না হয়ে গেছে চান কর গে যাও। বাবা গোঁ ধরে' বসে' আছেন তোমাদের সঙ্গে খাবেন। তাঁর পিত্তি পড়ে' যাচ্ছে। তাই ফলের রস দিচ্ছি একটু। এত বেলা হ'ল ক্ষিদে পায়নি ?"

''ঘণ্টা তুই আগে যা খেয়েছি তা তো জানো। খান বারো লুচি, একবাটি আলুর দম, তুটো ডিম, তার উপর মিষ্টি। ক্ষিধে পায় কখনও ?"

দিন দিন নতুন হচ্ছ দেখছি। ওই ক'টা ফুলকো লুচি খেয়ে ক্ষিধে হয়নি তোমার ! মিথ্যুক কোথাকার"

সহাস্য সকোপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কিরণ পুনরায় ফলের রসে মন দিল।

"সদানন্দ আর রঙ্গনাথ কোথা, ওদের দিকেও একটু মনোযোগ দাও না, অতটা একচোখো হ'লে লোকে কি বলবে। তা ছাড়া এক সঙ্গেই তো খাব সব। ওরা কি 'রেডি'—"

''রেডি না ছাই। সদানন্দ এতক্ষণে তেল মাখতে বসেছে। রঙ্গনাথ সন্ধ্যা আর স্বাতী সেই যে বেড়াতে বেরিয়েছে এখনও ফেরেনি। সব বে-আক্কিলে তোমরা—"

"সোমনাথ কোথা"

"সে উষার ছেলেদের ঘুড়ি তৈরি করে দিচ্ছে ওদিকের বারান্দায়"

বিরুবাবুর বড় কন্যা স্বাতী ও বড় জামাই সোমনাথ আগের দিন সন্ধ্যায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। ছোট মেয়ে-জামাই এখনও আসে নাই। সে জন্য বিরুবাবু চিন্তিত আছেন, বারবার স্টেশনে যাতায়াত করিতেছেন।

"যাই, বাবাকে ফলের রসটা খাইয়ে আসি। সত্যি তোমার ক্ষিধে পায় নি ? যাই হোক, বউদিকে এবার রেহাই দাও তোমরা রান্নাঘর থেকে"

"একটা কথা বুঝছ না তুমি, বউদি রেহাই পেতে চান না। উনি রেঁধে আর পরিবেশন করে' সুখ পান আর হাতে স্বর্গ পান রান্না ভাল হয়েছে বললে। তা বলব"

কিরণ তাহার দিকে একটা হাস্যোজ্জ্বল তির্যক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বাবাকে ফলের রস খাওয়াইতে গেল। কৃষ্ণকান্ত গেলেন দক্ষিণ বারান্দায় সোমনাথের কাছে।

সূর্যসুন্দর সত্যই অনেকটা ভাল বোধ করিতেছিলেন। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার মনে হইতেছিল তিনি যেন একটা নূতন ধরনের নব-জীবন লাভ করিতেছেন। তাঁহার মনে হইতেছে—যে ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এত অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি প্রিয়জনের সমাবেশ ঘটিয়াছে তাহাকে অসুখ না বলিয়া সুখ বলাই তো উচিত। কেবল একজনের অভাবে তাহার মনের ভিতরটা খচখচ করিতেছিল। পৃথ্বীশ আসিবে কি? তাহাকে কি কুমার খবর দিতে পারিয়াছে? অনেক দিন তো তাহার কোন খবর নাই। সেই চিঠিটির কথা তাঁহার বারবার মনে পড়িতেছিল, গৃহত্যাগ করিবার পূর্বে যে চিঠিটি সে লিখিয়া গিয়াছিল। সে লিখিয়াছিল—"মা-ই সংসারে আমার একমাত্র বন্ধন ছিলেন। তিনি চলিয়া গিয়াছেন, আমিও বন্ধনমুক্ত হইয়াছি। তাই আমি এবার ঈপ্সিত পথে চলিলাম। আপনার সেবা করিবার জন্য দাদা, উশনা, কুমার রহিল। আমি দূর হইতে আপনার সংবাদ রাখিব এবং প্রয়োজন বুঝিলে ফিরিয়া আসিব। আমার জন্য আপনি চিন্তা করিবেন না। গৃহস্থ হইবার যোগ্যতা আমার নাই, আর ঘোর স্বার্থপর না হইলে গৃহস্থ হওয়া যায় না, তাই আমি সন্ন্যাস জীবন যাপন করিব ঠিক করিয়াছি। বাড়ির কোন সাহায্য আমি লইব না। আমি প্রায় নিঃস্ব হইয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইলাম। কেবল যে বেহালাটি আপনি আমাকে দিয়াছিলেন সেইটি লইয়া যাইতেছি।"...সাত বৎসর হইল পৃথ্বীশ চলিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে সে কুমারকে চিঠি লেখে। সে সব চিঠি কুমার তাঁহাকে দেখাইয়াছে। চিঠিতে কোনও ঠিকানা থাকে না। পোস্টাফিসের ছাপ হইতে একবার হরিদ্বারের নাম পড়া গিয়াছিল, আর একবার কটকের নাম। তবে অল্প কিছুদিন আগে সে

কুমারকে পোস্টবক্সের একটা ঠিকানা জানাইয়াছে। লিখিয়াছে, যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তাহা হইলে ওই ঠিকানায় পত্র দিলে সে পাইবে। পোস্ট বক্স বম্বেতে। কুমার সেই ঠিকানাতেই টেলিগ্রাফ করিয়াছে, চিঠিও দিয়াছে। কিন্তু কই পৃথ্বীশ এখনও তো আসিল না, কোন জবাবও আসে নাই। স্ত্রীর মৃত্যুর কথাটাও তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীশ অজ্ঞান হইয়া যায়। বারো ঘণ্টার পর যখন তাহার জ্ঞান হয়, তাহার পর হইতে তিনদিন সে ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল, তাহার পর সাতদিন নির্বাক হইয়াছিল। শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া যাইবার পাঁচদিন পরে হঠাৎ সে গৃহ ত্যাগ করে। সূর্যসুন্দর যথেষ্ট খোঁজ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। মানুষের সবই সহিয়া যায়। এতবড় মর্মান্তিক ব্যাপারটাও সূর্যসুন্দরের সহিয়া গিয়াছিল। মানুষের মন’ বড় বিচিত্র। কল্পনার সহায়তায় তিনি ইহার একটা নিগূঢ় তাৎপর্যও বাহির করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সান্ত্বনা লাভও করিয়াছিলেন। ক্রমশ তাঁহার মনে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে তাঁহার বাবাই পৃথ্বীশরূপে পুনরায় তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। পৃথ্বীশের মুখের আদলটা না কি তাঁহার বাবার মুখের মতো, বুকটাও ঠিক তেমনি লাল। বাবার মতোই তাহার সঙ্গীতানুরাগ এবং সংসারে অনাসক্তি। অনুপস্থিত পৃথ্বীশকে কেন্দ্র করিয়া মনে মনে তিনি একটা অদ্ভুত স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিলেন। ইদানীং আর একটা কথা মনে হওয়াতে তিনি পৃথ্বীশকে ফিরাইয়া আনিবার বিশেষ চেষ্টা আর করেন নাই। বোম্বের ঠিকানাটা পাইবার পর কুমার তাঁহাকে বলিয়াছিল— “ঠিকানা তো একটা পাওয়া গেল, এবার আমি না হয় বম্বে গিয়ে মেজদাকে ধরে’ নিয়ে আসি। আমি গেলে ঠিক আনতে পারব।” সূর্যসুন্দর কিন্তু তাহাকে যাইতে দেন নাই। মুখে বলিয়াছিলেন বটে, “না থাক। কোথা ঘুরে ঘুরে বেড়াবি ওর

পিছনে। জোর করে' কি কাউকে ধরে' রাখা যায়? ও যদি আসে, আপনিই আসবে"—কিন্তু মনে মনে তাঁহার অন্য প্রকার যুক্তি ছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, "বাবা আমার জন্যই শেষ জীবনে নিজের খেয়াল খুশীর পথ পরিত্যাগ করিয়া সংসারের ঘানি টানিয়াছিলেন। তিনি পৃথ্বীশরূপে আবার যদি আমার কাছে আসিয়াই থাকেন তাহা হইলে আবার তাঁহাকে জোর করিয়া সংসারে টানিয়া আনা কি উচিত হইবে? চলুন না তিনি নিজের পথে, নিজের খেয়ালে···"

তিনি চোখ বুজিয়া এই সবই ভাবিতেছিলেন। বাবার মুখটাই আবার তাঁহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার আকর্ণ বিশ্রান্ত ঈষৎ রক্তাভ চোখের দিকে তিনি চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মনে হইতেছিল একটা চাপা হাসি যেন তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"না, এবার আর তোমায় কষ্ট দেব না"—হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন।

উর্মিলা মাথার শিয়রে আনত মস্তকে নীরবে বসিয়াছিল, ঘরে আর কেহ ছিল না।

"বাবা, আমাকে কিছু বলবেন?"

"না"

সূর্যসুন্দর আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর চোখ তুলিয়া বলিলেন "সন্ধ্যা ঊষা কোথা"

"মেজদি বাথরুমে। ছোটদি আর ছোট জামাইবাবু বেড়াতে বেরিয়েছেন সোমনাথকে নিয়ে"

"কোথা গেছে—"

"বাহিতলায়"

খবরটি শুনিয়া সূর্যসুন্দর প্রীত হইলেন। বাগানে কেহ গেলে তিনি বড় খুশী হন। বাহি নদীর ধারে তাঁহার একটি প্রকাণ্ড

আম বাগান আছে। প্রায় চল্লিশ বিঘার বাগান। ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কাজ। এই প্রসঙ্গে বন্ধু নীলকমলকে আর ভোজু নাপিতকে মনে পড়িল। বাগানটির সহিত ইহাদেরও স্মৃতি জড়িত আছে।

নীলকমলের বাড়ি ছিল মালদহ জেলার এক গ্রামে। সূর্যসুন্দর তাহাদের বাড়ির গৃহচিকিৎসক ছিলেন। নীলকমল বহুদিন হইতে সূর্যসুন্দরকে অনুরোধ করিতেছিলেন, "আপনি যদি বলেন, আপনাকে কিছু ভালো আমের কলম পাঠিয়ে দিই। আপনার ওই জমিটায় চমৎকার বাগান হবে"। তিনি দুইবার অনেক কলম পাঠাইয়াও ছিলেন, কিন্তু সময়াভাব বশত সূর্যসুন্দর সেগুলি রোপণ করতে পারেন নাই। দুইবারই প্রায় শতাধিক কলম টবেই শুকাইয়া গিয়াছিল। নীলকমল তখন অনুভব করিলেন এই পন্থায় চলিলে গাছই মরিবে, বাগান হইবে না। তখন তিনি সূর্যসুন্দরকে পত্র লিখিলেন, "ডাক্তারবাবুর, এবার কলমের গাছ লইয়া আমি নিজে যাইব এবং আপনার বাড়িতে গিয়া কিছুদিন থাকিব। আমার জন্য বাহিরের একটি ঘর এবং চাকর মজুত রাখিবেন"। বহু আমের কলম লইয়া নীলকমল একদিন আসিয়া হাজির হইলেন এবং সূর্যসুন্দরের বাড়িতে প্রায় ছয়মাস থাকিয়া বাগানটি সম্পূর্ণ করিয়া গেলেন! তিনি না আসিলে বাহিতলার আমবাগানটি হইত না। এই প্রসঙ্গে ভোজু নাপিতের কথাও তাঁহার মনে পড়িল। ওই চল্লিশ বিঘা জমির মাঝখানে এক বিঘা জমি ছিল ভোজু নাপিতের। সূর্যসুন্দর ভোজু নাপিতের ওই এক বিঘার পরিবর্তে তাহাকে অন্যত্র পাঁচ বিঘা জমি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু ভোজু তাহাতে রাজি হয় নাই। অন্যত্র এক বিঘা জমি লইয়াই সে তাঁহার ওই জমিটুকু দিয়াছিল। টাকা-কড়ির জোরে এসব হয় না, হয় প্রেমের জোরে। সূর্যসুন্দর নিজের জীবনে বারম্বার এ সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন।

"বাগানে গেছে ওরা ? বেশ হয়েছে। কুমার কোথা, সে থাকলে গাছগুলা চিনেয়ে দিতে পারত"

"উনি একটা নৌকো করে' বেরিয়েছেন পাখী শিকার করতে। চরে আজকাল খুব হাঁস বসছে তো"

"ও, তা বেশ করেছে। যদি কিছু মেরে আনতে পারে, জামাইরা এসেছে খাবে আনন্দ করে' "

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"

ফলের রস লইয়া কিরণ প্রবেশ করিল।

"রসটা খাও বাবা। লেবুগুলো ভালো আনে নি, সব শুকনো শুকনো—"

সূর্যসুন্দর অন্য জগতে ছিলেন, লেবুর বিষয়ে কোন মন্তব্য করিলেন না। হঠাৎ বলিলেন "তুই জানিস কি, আমার বাবার বড় গেলাস আছে একটা, কাঠের সিন্দুকটায় আছে বোধহয়, খুঁজে দেখ তো"

"ঠাকুরদার গেলাস ?"

"হ্যাঁ, দেখিস নি সেটা ?"

কিরণের মনে পড়িতেছিল না দেখিয়াছে কিনা। কিন্তু তাহা স্বীকার করিবার পাত্র সে নয়। খানিকক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ দেখেছি, মনে পড়েছে, খুব ছেলেবেলায় দেখেছি। কেন, কি হবে সে গেলাস নিয়ে—"

"সেটা বার কর। দেখব একবার"

"আচ্ছা, উর্মিলা, জানো কোথায় আছে সেটা ?"

"না, আমি তো দেখি নি। দিদি জানেন বোধহয়। পুরানো সব বাসন উনিই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিলেন"

"আচ্ছা, ফলের রসটা খেয়ে নাও এখন আমি দেখছি কোথা আছে সেটা—"

সে সন্তর্পণে সূর্যসুন্দরকে ফলের রস খাওয়াইতে লাগিল। কিরণের মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইয়াছিল। বাবা হঠাৎ ঠাকুরদার কথা ভাবিতেছেন কেন! অসুখের সময় মৃতের কথা মনে করা তো ভালো লক্ষণ নয়।

রস খাওয়া শেষ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "চম্পা কোথা?"

"সে ওই পিছনের ঘরে, গগনের ফরমাসে তোমার জন্যে স্টোভে কি একটা খাবার করছে"

"কত আর খাব আমি। কি খাবার—"

আপেল সেদ্ধ করে' কি যেন করছে দু'জনে মিলে। আপেল স্টাফিং না, কি যেন বললে। আমিও ওসব শিখেছিলুম এককালে, এখন ভুলে গেছি। তোমার জামাইটির খাওয়ার শখ বলে' তো কিছু নেই—যা সামনে ধরে' দাও গপ গপ করে' খেয়ে ফেলবে!"

"দুজনে মিলে করছে? গগনও আছে না কি"

"গগনই তো ফরফট্‌টি তুলেছে। সকাল থেকে তিনজনে স্টোভ আর আপেল আনিয়েছে কাটিহার থেকে"

"আর একজন কে"

"ওই মিস্ বোস। ও তো ছায়ায় মতো সর্বদা ঘুরছে চম্পার সঙ্গে। খুব সেবা করে কিন্তু। ও সঙ্গে না এলে এই ভীড়ের বাড়িতে এত রকম হ'য়ে উঠত না। এখন ভালয় ভালয় সাধের ব্যাপারটা মিটলে বাঁচা যায়"

"নিখিলবাবু যখন ভার নিয়েছেন তখন সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের বাড়ির সব ভোজ কাজ তো উনিই করিয়েছেন"

"তুমুল আয়োজন হচ্ছে শুনছি—"

"হ্যাঁ, আমিও তাই শুনছি। সুবাতালী, ওঝাজি, চমকলাল, গোবিন্দ মণ্ডল, নিখিলবাবু এরা সবাই যখন একজোট হয়েছে তখন ব্যাপারই করে' ছাড়বে"

ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার চুল কুরিয়া দিতেছিল।

সে স্মিতমুখে বলিল, "ভালই তো হচ্ছে। আমাদের প্রথম বউ—"

সাধের প্রসঙ্গে কাল হইতেই যে সমস্যাটা কিরণের মনে জাগিয়াছিল তাহা এইবার সে ব্যক্ত করিল।

"সাধে একটা কিছু তো দিতে হবে। এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না, কি যে করব তাই ভাবছি। ঊর্মিলা তুই কি দিবি ?"

"আমার নতুন একটা বেনারসী শাড়ি কেনা হয়েছিল, এখনও পরিনি সেটা, সেইটে দিয়ে দেব ভাবছি। মভ কলার, ওকে সুন্দর মানাবে—"

"আমি কি করি বল তো। আমি একটি সোনার হার দিতে চাই, কিন্তু এখানে তো তৈরি হার পাওয়া যাবে না"

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "শিবু স্যাকরাকে বললে সে হয়তো করে দিতে পারে।"

"চার পাঁচ দিনের ভিতর কি পারবে ?"

"তা পারবে না কেন। কুমারকে বল্ তাকে ডেকে পাঠাক, আমাদের বাড়িতে বসেই করুক না। ঊর্মিলার একটা কি গয়না তো করেছিল"

ঊর্মিলা বলিল, "আমার বাজু করেছিলেন উনি ওকে দিয়ে। বেশ সুন্দর গড়েছিল। এই যে দেখুন না—"

ঊর্মিলা হাত তুলিয়া বাজু দেখাইল, তাহার পর খুলিয়া দিল।

কিরণ উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিয়া মন্তব্য করিল, "পালিশ তত ভাল নয়"

গগন শশব্যস্ত হইয়া প্রবেশ করিল।

"পিসিমা, বাড়িতে 'নাট্‌মেগ্‌' আছে ?"

"জানি না তো। কি করবি"

"দাত্নর জন্যে যে আপেল স্টাফিংটা করছি তাতে 'নাটমেগ' দরকার। দেখি, মাকে জিগ্যেস করি—"

গগন পুনরায় ব্যস্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, সূর্যসুন্দর ডাকিলেন।

"শোন। চম্পা নাকি ভালো গীটার বাজায় শুনলুম—"

"গীটার, বেয়ালা তুইই বাজায়—"

"সঙ্গে এনেছে যন্ত্রগুলো"

হঁ্যা—"

"তাই শোনাক না। খাবার-টাবার করে' কি হবে"

"খেতে খেতে গীটার শুনতে আরও ভালো লাগবে। যদি ঠিক মতো হয়, দেখো কি গ্র্যাণ্ড খেতে"

গগন নাট-মেগের খোঁজে চলিয়া গেল।

কিরণ বলিল, "চমৎকার ছেলে তুটি দাদার। তুটি হীরের টুকরো যেন"

"মেয়ে তুটিও ভাল। বাঁচিয়ে রাখুন ভগবান। হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল"

"বউটি খুঁত খুঁত করছে তোমার খেতে বেলা হচ্ছে বলে। তুমি বলছ সকলের সঙ্গে খাবে, কিন্তু তোমার জামাইদের তো কারো এখনও চান পর্যন্ত হয়নি। কুমার শিকার থেকে ফেরেনি। দাদা পীর-পাহাড়ে গিয়ে বসে' আছে। সন্ধ্যারা বাগানে গেছে। ওদের সঙ্গে খেতে গেলে তুটো বেজে যাবে তোমার"

সূর্যসুন্দর হাসিয়া বলিলেন, "তুটোই না হয় হ'ল, ক্ষতি কি তাতে। সকাল থেকে তো তিনবার খেলাম। আর কতটুকুই বা খাব আমি—"

পার্বতী এককাপ্ ওভাল্‌টিন লইয়া প্রবেশ করিল।

"দাতু, মা বললেন এটাও খেয়ে নিতে"

"কি বিপদ। কতবার খাওয়াবি তোরা—"

"মা বললেন খেতে অনেক বেলা হবে, এটা খেয়ে নিন"

ছোটছেলের মত জেদ করিয়া সূর্যসুন্দর বলিলেন, "না, না, এখন আর খেতে পারব না। এক্ষুণি তো ফলের রস খেলাম"

পার্বতী ওভাল্‌টিনের কাপটা পাশের তেপায়ার উপর রাখিয়া ঢাকা দিল, তাহার পর রাগতমুখে গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

একটু পরেই বারান্দায় তাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

"মা, দাদু খাচ্ছেন না। যা বাড়বাড়ি শুরু করেছেন তা আর বলবার নয়। তুমি সামলাও এসে। আমার কথা শুনছেন না"

"অতি দজ্জাল মেয়েটা"—কিরণ হাসিয়া সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, ওকে দেখে আমার উদিৎ সিংয়ের কথা মনে হচ্ছে। উদিত সিংকে মনে পড়ে তোর ?"

"না"

"খুব ছোট ছিলি তুই তখন। ওরই মতো ছিপছিপে আর ফরসা ছিল উদিৎ সিং। কিন্তু কি প্রতাপ ছিল তার। বামুন দিদিকে মনে আছে ?"

"একটু একটু আছে। কুঁজো হ'য়ে লাঠি নিয়ে হাঁটত, না ?"

"হ্যাঁ, শেষটা কুঁজো হয়ে গিয়েছিল। সে-ও খুব প্রতাপী ছিল। আমার এক বন্ধু ওকে বলত কুকী"

"কুকী মানে ?"

"মেয়ে-রাঁধুনী। কুক—কুকী। রাখালকে একদিন খুন্‌তি নিয়ে তাড়া করেছিল"

"কেন"

"জুতো পরে' রান্নাঘরে উঁকি দিয়েছিল বলে'। রাখালকে বলত পোড়ামুহা। খুব কালো ছিল তো রাখাল"

পরসুন্দরী প্রবেশ করিলেন। মাথায় আধ-ঘোমটা দেওয়া।

যদিও বর্ষিয়সী হইয়াছেন, তবু শ্বশুরের সামনে এখনও তিনি ঘোমটা দিয়ে আসেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা, ওভালটিনটা খেয়ে নিন। সকলের সঙ্গে খাবেন বলছেন, কিছু না খেলে পিত্তি পড়ে যাবে। ওটা খেয়ে ফেলুন, বেশী তো দিইনি"

"এইমাত্র ফলের রস খাওয়ালে যে কিরণ—"

"ফলের রসটা ভাতের সঙ্গে খেলে হ'ত। কতটুকু দিয়েছ"

কিরণ বলিল, "খুব কম। আধ কাপও নয়"

"তাহলে ওভালটিনটা খেয়ে নিন। ভাত না হয় কম খাবেন। গগন বলেছে ওভালটিনটা খাওয়া দরকার আপনার"

সূর্যসুন্দর অনুভব করিলেন খাইতেই হইবে। বাড়ির মধ্যে একমাত্র পুরসুন্দরীকেই তিনি ভয় করেন, তাহার উপর ইহা যখন গগনের প্রেসক্রপসন, তখন কোন প্রতিবাদই চলিবে না।

"ঠাকুরঝি, খাইয়ে দাও ওটা"

কিরণ সূর্যসুন্দরের গলায় ছোট লোম-ওয়ালা তোয়ালেটা জড়াইয়া দিয়া ফিডিং কাপে করিয়া 'ওভালটিন' খাওয়াইতে লাগিল।

এক চুমুক দিয়াই সূর্যসুন্দরের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া

"বাঃ, খুব সুন্দর তো এটা খেতে"

পুরসুন্দরী মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গগন খুব ভালবাসে। বারো টিন কিনে এনেছে আপনার জন্যে"

যতক্ষণ না ওভালটিন খাওয়ানো শেষ হইল ততক্ষণ পুরসুন্দরী আধঘোমটা টানিয়া প্রহরীর মতো এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। খাওয়া শেষ হইলে ঊর্মিলা উঠিয়া নীরবে ফিডিং কাপটি ধুইয়া যথাস্থানে রাখিয়া দিল। তাহার পর মাথার শিয়রে বসিয়া চুলের ভিতর ধীরে ধীরে আঙুল চালাইতে লাগিল।

একটু পরে প্রবেশ করিল গঙ্গা একটা কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া। ধোপার বাড়ির কাপড়, তাগাদায় কাচিতে দেওয়া হইয়াছিল।

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গঙ্গা, তোকেই খুঁজছিলাম। বাজার থেকে চট্ করে' গিয়ে কিছু জইত্রী কিনে আন ত। গগন চাইছে। সাইকেলে করে' যা বাবা, ও কি একটা রান্না করছে বাবার জন্যে"

"ও, আচ্ছা—"

গঙ্গা কিরণের দিকে চাহিয়া বলিল, "রতনা ধোপার কাছ থেকে তোমার তাগাদার কাপড়গুলো নিয়ে এলাম। ওদের বাড়িতে বিয়ে লাগছে, না নিয়ে এলে ওই দামী কাপড়গুলো পরতো সবাই মিলে। মিলিয়ে দেখে রেখে দাও এক্ষুণি। পরে আবার বোলো না যেন এটা নেই, সেটা নেই"

বলিয়াই সে জইত্রী আনিবার জন্য বাহির হইয়া গেল।

পুরসুন্দরীও রান্নাঘরে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু যাওয়া হইল না।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "বউমা শোন। আমার বাবার গ্লাসটা কোথা আছে বল তো"

"বড় কাঠের সিন্দুকে আছে সেটা"

"কাউকে দিয়ে বার করাও তো, দেখব একবার। এখুনি বার করতে বল"

"আচ্ছা"

পুরসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর পার্বতী পুনরায় প্রবেশ করিল।

সূর্যসুন্দরের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল, "আমার কথা শোনা হল না। মায়ের কথা শোনা হল। আমি যেন কেউ নই। আচ্ছা"—মাথা ঝাঁকাইয়া সে আবার বাহির হইয়া গেল।

আমবাগানে তিনটি ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া সন্ধ্যা, স্বাতী এবং রঙ্গনাথ বেশ জমাইয়া আড্ডা দিতেছিল। বাগানের চাকরটি তাহাদের মাঝখানে একটি ছোট টেবিলও পাতিয়া দিয়াছিল। স্বাতী সন্ধ্যার চেয়ে বছর চারেকের ছোট হইলে কি হয়, দুজনে বন্ধুত্ব খুব। বিবাহের পর বয়সের এ পার্থক্যটুকুও ঘুচিয়া গিয়াছে। মেয়েদের সাধারণত ইহাই হয়। তাহাদের মধ্যে পিসি-ভাইঝির দূরত্ব আর ছিল না। স্বাতীর রং খুব ধপধপে ফরসা, চোখ দুটি ছোট ছোট, মুখের উপর ঈষৎ তির্যকভাবে বসানো, মুখের ভাবটা একটু মঙ্গোলীয় ধরনের। খুব পাতলা ঠোঁট, চিবুকের মাঝখানে ছোট্ট একটি কালো তিল।

স্বাতী বলিতেছিল, "টেলিগ্রাম পেয়ে কি তাড়াহুড়ো করে' যে আমরা এসেছি ছোট পিসি—তা বলবার নয়। ভয় হচ্ছিল দাদুকে এসে দেখতে পাব কিনা। ওঁর ছুটি পেতে দু'দিন দেরি হ'য়ে গেল তো। কিন্তু এসে মনে হচ্ছে আমরা যেন দাদুর অসুখের জন্যে আসি নি। এসেছি বউদির সাধ খেতে। দাদুকে তো খুব হাসি-খুশী দেখলুম, মনে হচ্ছে অসুখই হয়নি"

"বাবা বরাবরই ওই রকম, অসুখ হ'লে কাউকে বুঝতে দেন না যে অসুখ হয়েছে। কিন্তু বাবার মনে সুখ নেই বুঝতে পারছি"

"কেন"

"মেজদার জন্যে। মনে মনে উনি মেজদার জন্যেই প্রতীক্ষা করছেন। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরে মেজদার নাম ধরে' ডাকছিলেন"

"সত্যি মেজকাকা যে কোথায় আছেন, কে জানে"

রঙ্গনাথ হঠাৎ বলিলেন, "তোমার শাড়ির আঁচলটা নতুন ধরনের দেখছি। হায়দ্রাবাদি বুঝি—"

"হ্যাঁ। হায়দ্রাবাদ থেকেই আনিয়েছি। আপনি বেশ পাড় চিনতে পারেন তো—"

রঙ্গনাথ সন্ধ্যার দিকে একবার চকিত-দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "আমার ধারণা যাজ্ঞ্যবল্ককেও মৈত্রেয়ীর জন্যে পাড়ের খবর রাখতে হ'ত, যদিও উপনিষদে এ কথা লেখা নেই—"

সন্ধ্যার মুখে হাসি চিকমিক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিল না।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আপনি তাহলে কি করে' জানলেন এ কথা"

"ক্ষিধে পেলে যাজ্ঞ্যবল্ক খেতেন এ কথাও উপনিষদে লেখা নেই, কিন্তু আমি জানি খেতেন"

সন্ধ্যা বলিল, "উনি আমার দৃষদ্বতীতে কাপড়ের পাড় সম্বন্ধে সুন্দর প্রবন্ধ লিখেছিলেন একটা"

"আচ্ছা, ছোট পিসি, দৃষদ্বতী মানে কি! অমন কটমট নাম রেখেছ কেন কাগজের"

সন্ধ্যা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি বল—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "কি দরকার ওসব ইতিহাস শুনে।"

"না বলুন। অনেকে জিগ্যেস করে—"

"তবে শোন। দৃষদ্বতী নদীর নাম। সেকালে আর্যরা যখন ব্রহ্মাবর্তে এসেছিলেন তখন দুটি নদীকে তারা দু-রকম মর্যাদা দিয়েছিলেন। একটি সরস্বতী, আর একটি দৃষদ্বতী। সরস্বতী ছিল অন্তঃসলিলা, বাইরে থেকে দেখতে শুকনো, কিন্তু বালি একটু খুঁড়লেই স্বচ্ছ পরিষ্কার জল বেরুতো। ওই নদীতে ছোট বড় গর্ত খুঁড়ে জল সংগ্রহ করত সবাই। গর্তগুলোকে তাঁরা বলতেন সরসী, মানে ছোট ছোট পুকুর। যে নদী সরসী তার নাম দিলেন তাঁরা সরস্বতী। আর্যেরা জ্ঞানের প্রতীক হিসাবেও পূজা করতেন ওই নদীকে। পরে যিনি জ্ঞানের দেবতা হলেন

তাঁরও সম্ভবত ওই নদী থেকেই নামকরণ হল সরস্বতী। দ্বিতীয় নদীটি ছিল অন্য রকম। ছোট বড় অনেক পাথর অতিক্রম করে বইত সে নদী, যেন অনেক বাধা বিঘ্নও তাকে দমাতে পারে নি। ইজিপ্টে নীল নদের ক্যাটারাক্‌টগুলো অনেকটা ওই রকম। পাথরের সংস্কৃত হচ্ছে দৃষৎ, তাই তাঁরা সে নদীর নাম দিয়েছিলেন দৃষদ্বতী। সরস্বতী যেমন ছিল জ্ঞানের প্রতীক, দৃষদ্বতী তেমনি ছিল বীরত্বের প্রতীক। সরস্বতীকে পূজো করতেন ব্রাহ্মণেরা, আর দৃষদ্বতীকে ক্ষত্রিয়েরা। তাই সন্ধ্যা ওর কাগজের নাম রেখেছে দৃষদ্বতী”

“কিন্তু ওতে তো যুদ্ধের বা বীরত্বের কিছু থাকে না। ওতে মেয়েদের সম্বন্ধেই তো গল্প প্রবন্ধ থাকে দেখেছি”

“তোমার ছোটপিসির ধারণা আমাদের সমাজে মেয়েদের খবর মানেই যুদ্ধের খবর। মেয়েরা পরাধীন, মেয়েরা নির্যাতিত, তাই মেয়েরা বিদ্রোহ করছে। তাদের মুক্তির জন্যে যা কিছু করা হয় তাই যুদ্ধ। ও কাগজের গল্প কবিতা প্রবন্ধ সব ওয়ার-বুলেটিন”

রঙ্গনাথ গম্ভীর ভাবেই বলিয়া যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টিতে হাসির আভা উঁকি দিতেছিল। স্বাতী বোকা মেয়ে নয়, কিন্তু সে বোকা সাজিবার ভান করিত। সে সব বুঝিতেছিল কিন্তু ভান করিতেছিল যেন কিছুই বোঝে নাই।

“এ যুদ্ধে শত্রুপক্ষ কারা”

“আমরা, পুরুষরা”

নীরব হাসিতে স্বাতীর মুখখানি ভরিয়া গেল, ছোট চোখ দু'টি বুজিয়া আসিল।

“কিন্তু শত্রুর প্রতি আপনাদের ব্যবহার তো অদ্ভুত। শুধু খাওয়াচ্ছেন না, ভাল ভাল গয়না দিচ্ছেন, সব রকমে প্রশ্রয় দিচ্ছেন”

“আমাদের মধ্যে যারা বিবেকী তারাই দিচ্ছে, অনুতপ্ত হয়ে

খেসারত দিচ্ছে। কিম্বা এ-ও হ'তে পারে অনেকে হয় তো ঘুস দিয়ে শত্রুকে বশ কররার চেষ্টা করছে"

সন্ধ্যা সূর্যসুন্দরের জন্য উলের দস্তানা বুনিতেছিল। কোন মন্তব্য না করিয়া সে নীরবে বুনিয়া যাইতেছিল। একটি হাসির আভা তাহার সুন্দর কালো মুখখানিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল শুধু। সে মাঝে মাঝে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে রঙ্গনাথকে দেখিতেছিল, কিন্তু সেই দৃষ্টিতে দেখিতেছিল—যে দৃষ্টিতে মা তাহার দুরন্ত সন্তানকে নিরীক্ষণ করে।

"আচ্ছা পিসেমশাই—"

"একবার তো মানা করে' দিয়েছি আমাকে পিসেমশাই বলবে না। পিসেমশাই শুনলেই আমার চোখের সামনে আমার নিজের এক দূর সম্পর্কের পিসেমশাইয়ের ছবি ফুটে ওঠে। রোগা কালো বেঁটে কুঁজো, গুলিখোর। সুতরাং আমি কারো পিসেমশাই হতে চাই না।"

"কি বলে' ডাকব তাহলে—"

"দাদা বললে ক্ষতি কি—"

"তোমরা পিতৃতুল্য মাস্টারকে দাদা বল, হবু-স্বামীকেও বিয়ের আগে দাদা বল, পিসেমশাইকে দাদা বললে কিছু বেমানান হবে না। শুনেছি সংস্কৃত তাত শব্দ থেকে বাংলা দাদা কথাটা হয়েছে—"

"তা হোক। দাদা বলে' ডাকা চলবে না। মা ভয়ানক রেগে যাবে তাহলে"

"বেশ, তাহলে শুধু 'পি' বোলো—"

রঙ্গনাথ একবার সন্ধ্যার দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার মুখে কিন্তু কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল না। সে নতনেত্রে নীরবে হাসিমুখে বসিয়া দস্তানাই বুনিতে লাগিল।

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা পিসেমশাই, মিস বোসের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার ?"

"না। তবে মেয়েটি ভালো বলেই মনে হয়"

"আলাপ হয়নি, তবে কি করে' বুঝলেন"

"গায়ে পড়ে' আলাপ করবার চেষ্টা করে না দেখে। তোমার ছোটপিসির ওর সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা"

"তাই নাকি ছোটপিসি, আমারও খুব ভালো লেগেছে মেয়েটিকে—"

একথাটা স্বাতী মিথ্যা বলিল। মিস্ বসুকে মোটেই তাহার ভালো লাগে নাই, বরং তাহার মনে হইতেছিল দাদা এই অজ্ঞাত কুলশীলাকে কোথা হইতে লইয়া আসিল, তাহার ফিটফাট ধরনধারণ তাহার সুন্দর মুখশ্রী দেখিয়া তাহার বরং একটু ঈর্ষাই হইয়াছিল। তাহার জন্য আলাদা বাথরুম, কাটিহার হইতে তাহার জন্য কমোড, আলাদা একটা মেথরাণী—এসব তাহার মোটেই ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু এর সোজসুজি মনোভাব ব্যক্ত করিবার মেয়ে সে নয়। প্রশ্নের টোপ ফেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিল মিস্ বসুকে কাহার কেমন লাগিয়াছে।

সন্ধ্যা সংক্ষেপে বলিল, "ভালোই মেয়েটি"

"ও, তাই বুঝি। খুব কাজের ?"

"না, ভালো মানে মডার্ন। আধুনিক—"

"ও"

রঙ্গনাথ উঠিয়া পড়িলেন এবং ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাগানের গাছগুলি দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের কিছু জমিদারি আছে, কিন্তু কিছু বাগানও আছে। কিন্তু তিনি নিজে মনোমত আর একটি বাগান করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। সাহিত্যে যে সব দেশী বিদেশী গাছের নাম তিনি পড়িয়াছেন, সেইগুলি একটি বাগানে রোপণ করিবার ইচ্ছা তাঁহার। নানা পুস্তক হইতে নানারকম বৃক্ষ ও লতার নাম তিনি টুকিয়া রাখিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে অনেক পুস্তকও তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু অনেক বৈজ্ঞানিক তথ্য

এখনও জোগাড় হয় নাই, শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালকদের সঙ্গে এ বিষয়ে তাঁহার পত্রালাপ চলিতেছে। নিজে তিনি সেখানে কয়েকবার গিয়াছেনও। তাই বাগান দেখলেই তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন এবং নিজের কল্পনায় তা দেন।

সন্ধ্যা বুনিতে বুনিতে হঠাৎ স্বাতীকে প্রশ্ন করিল—"তুই হিন্দু-কোডবিলটা পড়েছিস ?"

"ওই খবরের কাগজে একটু আধটু চোখ বুলিয়ে দেখেছি। আমার তত ভালো লাগেনি"

"ভালো লাগেনি কেন"

স্বাতী জানে ছোটপিসির পাল্লা বড় শক্ত পাল্লা। কুট কুট করিয়া প্রশ্ন করিবে, আস্তে আস্তে কুরিয়া কুরিয়া তোমার মনের কথাগুলি টানিয়া টানিয়া বাহির করিবে, তাহার পরই ঝপ্ করিয়া চাপিয়া ধরিবে যুক্তির জাঁতিকলে। ও ফাঁদে স্বাতী পা দিবে না।

"কেন, তা-ও কি বলতে পারি। ও নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই নি"

"ঘামানো উচিত। আমাদেরই জন্যে ওটা হচ্ছে, আমরা যদি মাথা না ঘামাই তাহলে কে ঘামাবে"

স্বাতী অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে বাঁচিয়া গেল সে।

"কে আসছে বল তো ছোটপিসি—"

সন্ধ্যা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল ন্যুব্জদেহ একটি বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়া দিয়া তাহাদের দিকেই আসিতেছে। গায়ে একটা আড়-ময়লা আল-খাল্লা গোছের জামা, এক মুখ খোঁচা সাদা দাড়ি, মনে হয় যেন দশবারো দিন কামানো হয় নাই। পায়ের জুতোটাও ছেঁড়া। কিছুদূর আসিয়াই দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর বাগানের মালীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "হে শাস্তা, দোঠো বাঘান্টিয়ো দাত.মন্ তোড়ি দে তো বেটা। অভি তক্ মু নেই ধোলোছি—"

শান্তা সসম্ভ্রমে দাঁতন আনিতে ছুটিল।

বৃদ্ধ একমুখ হাসিয়া আগাইয়া আসিল সন্ধ্যার দিকে। তাহার পানের দাগ-লাগা অপরিষ্কার দন্তগুলি দেখিয়া সন্ধ্যা ঘৃণায় মনে মনে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল, কিন্তু মুখভাবে তাহা সে প্রকাশ করিল না, বরং হাসিমুখেই চাহিয়া রহিল আগন্তুকের দিকে। ক্ষীণভাবে ইহাও তাহার মনে হইতে লাগিল মুখটা যেন চেনা-চেনা। বৃদ্ধ কিছুদূর আসিয়া দন্ত বিকশিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়াই রহিল। সন্ধ্যার সহসা মনে হইল তাহার ওই ফোলা ফোলা হাস্য-দীপ্ত চোখের দৃষ্টি হইতে যেন স্নেহের ঝরনা নামিতেছে। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া সে কথা বলিল।

"কে তুই, কত বড় হ'য়ে গেছিস, চিনিতে পারি না"

"আমি সন্ধ্যা—"

"আরে, আরে তুই সন্ধ্যা। সেই এত টুকুন 'সন্ধ্যা-মুনি রাত-জাগুনি' এত বড় হয়েছিস তুই? বাহবা বাহবা—বাঃ"

মহানন্দে বৃদ্ধ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। শান্তা ইতিমধ্যে তুইটি "বাঘান্‌ঢির" (বাঘ-ভেরেণ্ডা) দাঁতন আনিয়াছিল। বৃদ্ধ সে তুইটি লইয়া বলিল, "আমি মুখটা আগে ধুয়ে ফেলি। তারপর তোদের সঙ্গে কথা বলব। আঁধার থাকতেই কিষণপুর থেকে হেঁটে বেরিয়েছি। সোজা আগে তোমাদের বাড়ি গিয়ে ডাক্তারবাবুর খবরটা নিলাম। শুনলাম ভালো আছেন। তারপর এখানে মুখ ধুতে এলাম! এখানে যখনই আসি তখনই বাঘান্‌ঢির দাঁতন দিয়ে মুখটা ধুয়ে ফেলি। এ বাঘান্‌ঢি আমিই লাগিয়েছিলাম এখানে। ওতে ভাল বেড়াও হয়, দাঁতনও হয়। শান্তা দো বালতি পানি উঠা হিঁ তো বেটা—"

একটু দূরে কূপ ছিল। শান্তার সহিত বৃদ্ধ সেই দিকেই গেলেন। বৃদ্ধকে তুই বালতি জল তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিতেই সন্ধ্যা চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "শান্তা, উনি কে বলতো—"

"কবিরাজ জি"

তখন সন্ধ্যার মনে পড়িল পেট-পচা কবিরাজকে। তাহার ছেলেবেলায় ইনি প্রায়ই আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। খাদ্য-রসিক, খুব খাইতে পারিতেন, কিন্তু হজম হইত না। উদরাময়ে ভুগিতেন। নিজেই বলিতেন, "আমার পেটের ভিতরটা পচে' গেছে" —আর হা হা করিয়া হাসিতেন। সেইজন্য বাড়িতে ইঁহার নাম হইয়া গিয়াছিল পেট-পচা কব্‌রেজ। সন্ধ্যার ইহাও মনে পড়িল, মা ইঁহাকে খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। কবিরাজ মহাশয় স্বাতীরও জন্ম দেখিয়াছিলেন, কিন্তু স্বাতীকে তাহার তেমন মনে ছিল না। স্বাতী কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের গল্প শুনিয়াছিল অনেক।

চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ছোটপিসি, এই পেট-পচা কবরেজ, না ?"

"হ্যাঁ, বেশ মজার লোক"

সন্ধ্যা পুনরায় দস্তানা-বোনায় মন ছিল। হিন্দুকোড বিলের কথা আর উঠিল না, স্বাতী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নানারকম বিকট শব্দ করিতে করিতে মুখ-প্রক্ষালন করিলেন। তাহার পর কটি-দেশে আবদ্ধ গামছাটি খুলিয়া মুখ মুছিলেন। তাঁহার কোমরে একটি বটুয়াও বাঁধা ছিল। বটুয়া হইতে চার-আনা পয়সা বাহির করিয়া শান্তাকে বলিলেন, "যা তো বেটা, বিছুয়াকা দোকানোঁ সে কুছ দহি-চুড়া লে আ…দোটো শাল পাত্তা ভি।" শান্তা চলিয়া গেলে সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভুক্ লেগেছে বেটি। কিছু খেয়ে লি। এই শালা পেটই তো জ্বালিয়ে মারলে হামাকে", তাহার পর সংশোধন করিয়া বলিলেন, "হামাকে কেন, সকলকেই"

কবিরাজ মহাশয়ের ভাষা একটু অদ্ভুত ধরনের। কখনও বেশ শুদ্ধ বাংলা বলেন, কখনও আবার হিন্দির বুকনি মিশিয়া যায়। তাঁহার কথা শুনিয়া সন্ধ্যা-স্বাতী মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না, না, হাসির কথা নয়, খাঁটি কথা। পোয়েটরা সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র, গাছ-পাতা, ফুল-ফল-জীব-জন্তুর বর্ণনা করে' বলেন—আহা ভগবানের সৃষ্টি কি আশ্চর্য, 'এই বিশ্ব-মাঝে যেখানে যা সাজে তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ', কিন্তু আসল জিনিসটির নাম তাঁরা করেন না, ভগবানের সেরা সৃষ্টি কি জান ? পেট ! পেট ! পরিমাণে মাত্র এক বিঘৎ। কিন্তু ওইটেই সব চেয়ে আশ্চর্য সৃষ্টি। ওই তুনিয়ার মালিক। তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর ওকে খাজনা দিতে হয়। ও গহ্বর খালি রাখবার উপায় নেই। পেটই আমাদের কান ধরে' ছুট্ করাচ্ছে চারিদিকে। আমার মতো বুড়োও আমদাবাদ থেকে পাট্নী, পাটনী থেকে মাদারিচক, মাদারিচক থেকে নবাবগঞ্জ, নবাবগঞ্জ থেকে মনিহারি, মনিহারি থেকে দিরা ছুটে বেড়াচ্ছে ওরই তাগাদায়। কাজিগাঁয়ে, বিষুণমুদির কাছে ওষুধের দাম বাকি পড়ে'ছিল ছ'মাস। অনেক তাগাদার পর আজ বেটা মাত্র চার আনা দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সেটি পেটায় নম হয়ে গেল—"

কবিরাজ মহাশয় দাঁতগুলি বাহির করিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা বলিল, "আপনি এখানে খাচ্ছেন কেন, বাড়িতেই চলুন না, সেখানেই খাবেন"

"আরে তা' তো খাবই। খবর নিয়ে এসেছি, রান্নার দেরি আছে এখনও। বড় বহু-মা নিজে রান্নাঘরে আছেন, তার মানে ভালো ভালো রান্না হচ্ছে। সে সব পরে খাব। কিন্তু এদিকে পেট যে মানছে না, তাই একটু দহি-চুড়া 'ঘুস' দিচ্ছি বেটাকে—"

"জল খাবারও বাড়িতে খেলেই পারতেন—"

"তা পারতাম। তোমাদের বাড়ি তো আমারই বাড়ি। কুমারকে দেখতে পেলাম না। গঙ্গা শালা ঘুর ঘুর করে' মুরব্বিয়ানা করছে দেখলাম। ওটাকে বড় ভয় করি। ঠিক ভয় নয়, ঘৃণা করি। মুখের উপর অপমান করে' দেয়। কুমার একটা কুকুরকে রাজা করে'

রেখেছে—শ্বা যদি ক্রিয়তে রাজা—সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে না ? এ হয়েছে তাই। ওকে দেখলেই আমি সরে' পড়ি! নিজের মান নিজের কাছে।''

স্বাতী বলিয়া উঠিল, ''না, না, সে কি! গঙ্গা-দা কি আপনাকে অপমান করতে সাহস করবে ?''

কবিরাজ মহাশয় ঘাড় ফিরাইয়া স্বাতীর মুখের দিকে চোখ মিট্‌-মিট্ করিয়া হাসিমুখে চাহিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। তাহার পর সন্ধ্যার দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলেন—"ইনি কে ? চিনছি না—"

"দাদার বড় মেয়ে, স্বাতী"

"ও, আচ্ছা! বিরুবাবুর মেয়ে! আরে তবে তো আমার নাত্‌নী। আমার বুড়িয়ার সৌতীন।"

কবিরাজ আবার খিক খিক করিয়া হাসিতে লাগিলেন। স্বাতীও হাসিতে লাগিল। কবিরাজ গঙ্গার প্রসঙ্গই তুলিলেন আবার।

''তোমার গঙ্গা-দা একটি গাধ্‌হা। কথায় কথায় চাঁট ছোড়ে। একদিনের কথা শুন। প্রায় একবছর আগেকার কথা। ডাক্তারবাবু তখন এখানে ছিলেন না। তিনি বিরুবাবুর কাছে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কুমার ছিল না! বেলা তখন দেড়টা কি দুটো হবে, আমি এসে পৌঁছে গেলাম কাঁটাক্রোশ থেকে হাঁটতে হাঁটতে। খুব খিদে লেগেছিল। বাড়ির বাইরে কাউকে দেখলাম না। কুমারের কুকুরগুলো বসে' ছিল বারান্দায় আমাকে দেখে ভুক্‌তে লাগল। বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গঙ্গা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ডাক্তারবাবু কোথা। সে বললে, দিল্লী গেছেন, বড়দার কাছে। 'কুমার কোথা' ? 'মাঠে গেছে'। তখন তাকেই বললাম, 'বড় ভুক্ লেগেছে ভাই। কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর'। এর উত্তরে বললে কি জান ? 'এটা কি হোটেল যখন তখন খাবার পাওয়া যাবে ?' চণ্ডালটার কথা শুনে আমি তো অবাক। বললাম, 'এটা হোটেল নয় তা জানি, হোটেলেও যখন তখন খাবার পাওয়া যায় না তা-ও

জানি। কিন্তু এটা যে ডাক্তারবাবুর বাড়ি, আমার বাড়ি। তুমি ভিতরে গিয়ে খবর দাও যে কবিরাজজি এসেছেন'। গাধ্‌হাটা বললে, 'বউমা এই একটু আগে ঘুমিয়েছে, তাকে আমি জাগাতে পারব না। আপনি বসুন'। সঙ্গে সঙ্গে জুতোটি খেলেন বাছাধন। কপাটের আড়াল থেকে কুমারের বউয়ের গলা শোনা গেল। আমাদের কথা তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। গঙ্গাকে লক্ষ্য করে' বললেন, 'কবিরাজ মশাইকে বসতে বল। আমি এখুনি খাবার দিচ্ছি ওঁকে।' গঙ্গা গজগজ করতে করতে চলে' গেল ভিতরে। একটু পরেই ফিরে এসে বললে, 'আসুন'। গিয়ে দেখি বউমা কার্পেটের আসন পেতে দিয়েছেন। আর খেতে দিয়েছেন চক্‌চকে কাঁসার বাটিতে ঘন দুধ, ভাল চুড়া, মর্তমান কলা, খেজুরের গুড়, আর নারকেলের সন্দেশ। তখনই বুঝলাম—কুমারের বউ মানবী নয়, দেবী। ওর শাশুড়িও দেবী ছিলেন। সে গল্পও শোনাব তোমাদের। খাওয়া শেষ করে' পান চিবুতে চিবুতে বাইরে এসে গঙ্গাকে বললাম, 'কিরে, দেখলি? তা তোর দোষ নেই বেটা। তুই ছোট বংশের ছেলে, তুই এসবের মর্ম কি করে' বুঝতে পারবি। মাথাতে ঢুকবে না তোর। তবে একটা কথা শুনে রাখ, এটা হোটেল নয়, ডাক্তারবাবুর বাড়ি।' তারপর থেকে কিন্তু এই গঙ্গাটাকে দেখলেই আমি সরে' পড়ি—"

কবিরাজ মহাশয় হাসিমুখে একবার সন্ধ্যার দিকে, আর একবার স্বাতীর দিকে চাহিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "কুমারের কিন্তু ও খুব হিতৈষী। আর সেইজন্যেই আমার কাছে ওর সাতখুন মাপ।"

স্বাতী প্রশ্ন করিল, "ঠাকুমার কি গল্প বলবেন বলছিলেন"

"তোমার ঠাকুমা লছ্‌মী ছিলেন। ওঁর জন্যেই তোমার ঠাকুরদার এত সুনাম, এত খাতির, এত উন্নতি। ওঁর চেয়ে ধনী লোক অনেক আছেন এদেশে, কিন্তু ওঁর চেয়ে বেশী খাতির আর কারও নেই।

সব তোমার ঠাকুমার জন্যে। উনি ছিলেন আমাদের সকলের মা, সাক্ষাৎ ভগবতী।"

কবিরাজ মহাশয় হাত দুইটি জোড় করিয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ।

"কি গল্প বলছিলেন যে—"

"তোমার ঠাকুমার সম্বন্ধে গল্প কি একটা? অনেক গল্প। তবে এখন যেটা মনে পড়ছে, শোন। অনেকদিন আগেকার কথা। সেদিনও ডাক্তারবাবু বাড়িতে ছিলেন না। দূরে কোনও কলে গিয়েছিলেন, প্রায়ই যেতেন। তখন বৈশাখ মাস, ঝাঁ ঝাঁ করছে রোদ। লু বইছে। এই গাঁয়েরই গোপীরাম মাড়োয়ারির স্ত্রীর 'পরসোত' (সূতিকা) হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করছিলাম, ডাক্তারবাবুই রোগীটি জোগাড় করে' দিয়েছিলেন আমাকে। সেদিন সেই রোগীর খবর নেবার জন্যে কাজিগাঁ থেকে হেঁটে আসছি আমি। অনেকদিন খবর পাইনি, ওষুধের দামও বাকি ছিল কিছু, যদি কিছু পাওয়া যায় এই আশায় দুপুর রোদ মাথায় করে' এলাম। আমার তো সর্বদাই— অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ—অবস্থা। এসে শুনলাম, রোগীটি একেবারে ভালো হয়ে গেছে, মানে ভব-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে—"

কথাটা বলিয়া কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত দিয়া আবার খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

তাহার পর বলিলেন, "বেটা একটি ছিদেম দিলে না আমাকে। তখন কি আর করি। হাঁটতে হাঁটতে তোমাদের বাড়ির দিকেই আসতে লাগলাম। খিদে পেয়েছিল খুব। সকাল থেকে কিছু খাইনি। তোমাদের বাড়ির সামনে যেখানে হাট বসে সেখানে এসে উঠেছি, এমন সময় কম্পাউণ্ডারবাবুর সঙ্গে দেখা। তাঁর মুখে শুনলাম, ডাক্তারবাবু বাড়ি নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ক'টা বেজেছে? তিনি বললেন, দেড়টা। বলে' তিনি চলে' গেলেন। আমি হাটের উপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখান থেকে তোমাদের বাড়িটা দেখা

যায়। দেখলাম বাড়ির দুয়ার জানালা সব বন্ধ। বন্ধ থাকাটাই স্বাভাবিক, রোদে-পুড়ে যাচ্ছে চারিদিক, তার উপরে পছিয়া হাওয়া। আমি ভাবলাম এরকম সময়ে গিয়ে হাজির হওয়াটা ঠিক হবে না। ফিরলাম। ঠিক করলাম ওই বিছুয়ার দোকানেই ধারে কিছু খেয়ে নিয়ে সেখানেই বিশ্রাম করব একটু, তারপর রোদ পড়লে বিকেলে বাড়ি ফিরে যাব। কিছুদূর এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনতে পেলাম, কবিরাজজি, কবিরাজজি। পিছু ফিরে দেখি তোমাদের চাকর ঘিন্নুয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কাছে এসে বললে, আপ চলিয়ে, মাঈজি আপকো বোলাতী হেঁ। মাঈজি? কোন মাঈজি? সে বললে, আমাদের মাঈজী। ডাক্তারবাবুর স্ত্রী ডাকছেন? তিনি আমাকে দেখলেনই বা কি করে'। অবাক হলাম একটু। তারপর তার পিছু পিছু এলাম তোমাদের বাড়িতে। তোমার ঠাকুমা দরজার আড়াল থেকে বললেন, আপনি হাটের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের বাড়িক দিকে চেয়ে, আবার চলে' যাচ্ছেন কেন। যা রোদ। খাওয়া দাওয়া হয়েছে আপনার? সত্য কথাই বললাম, না খাওয়া হয়নি। তোমার ঠাকুমা বললেন, তাহলে স্নান করে' এখানেই চাট্টি খেয়ে নিন। ভাত তরকারি সব আছে। আমার খাওয়া হয়নি এখনও। আমার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়েছিল সেদিন। বুঝলে? আমি রাজপুত, আমার প্রাণ পাষাণ, কিন্তু সেদিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। অনেকদিন আগে ভূপেন বোসের লেখা হিন্দু ফ্যামিলি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়েছিলাম, সে লেখা কণ্ঠস্থ আছে আমার। তার একজায়গায় আছে—"With Hindu life is bound up its traditional duty of hospitality. It is the duty of a house-holder to offer a meal to any stranger who may come before midday and ask for one, the mistress of the house does not sit down to her meal until every member is fed, and, as some-

times her food is left, she does not take her meal until well after midday, lest a hungry stranger should come and claim one...."। এই আদর্শ তোমার ঠাকুমার মধ্যে দেখেছিলাম সেদিন। এর চেয়েও বড় আদর্শ। কারণ আমাকে দূর থেকে দেখে আমার মনের ভাব বুঝে চাকর পাঠিয়ে ডেকে এনেছিলেন, রাস্তা থেকে ডেকে এনে খাইয়েছিলেন—"

কবিরাজ মহাশয় নীরবে হেঁটমুণ্ডে বসিয়া রহিলেন খানিকক্ষণ। মনে হইল যেন প্রণাম করিতেছেন। তাহার পর হঠাৎ মুখ তুলিয়া সন্ধ্যাকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মায়ের নাম কি ছিল বল তো"

"রাজলক্ষ্মী—"

"বাঃ বাঃ বাঃ—সার্থক নাম। সত্যিই তিনি ডাক্তারবাবুকে রাজা করে' দিয়ে গেছেন। সত্যিই এ অঞ্চলের রাজা উনি—আনক্রাউনড্ কিং—"

রঙ্গনাথ বাগান পরিক্রমা শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয়ের পিছন দিকে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এই অদ্ভুত আগন্তুকটিকে লক্ষ্য করিতেছিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাহাকে দেখিতে পান নাই, কিন্তু হঠাৎ তিনি অনুভব করিলেন তাঁহার পিছন দিকে কে যেন আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তিনি ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন এবং ঘুরিয়া বসিলেন।

"কে আপনি—"

স্বাতী বলিল, "আমার ছোট পিসেমশায়—"

কবিরাজ মহাশয় সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"যাক্, দর্শন হয়ে গেল। সন্ধ্যার বিয়ের সময় আমি ছিলাম না, দেশে গিয়েছিলাম। কাছাকাছি হ'লে চলে' আসতাম। কিন্তু রাজপুতানা থেকে আসা যায় না। নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম, কিন্তু আসতে পারলাম না। বসুন—"

শান্তা কবিরাজ মহাশয়ের জন্য দহি-চুড়া-গুড় এবং দুইটি শাল পাতা লইয়া হাজির হইল। কবিরাজ অবিলম্বে উঠিয়া একটু দূরে কূপের নিকট চলিয়া গেলেন এবং কূপের নিকটই উবু হইয়া বসিয়া মাটিতে পাতা দুটি পাতিয়া ফেলিলেন। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার আহার সমাধা হইয়া গেল। তাঁহার একটু সময় লাগিল মুখ ধুইতে। বেশ ভালো করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতে লাগিলেন তিনি।

রঙ্গনাথ নীরবে দেখিতেছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে সন্ধ্যাকে বলিলেন, "এদের এই অনাড়ম্বর সরল জীবন যাত্রাতে সভ্যতা, না সভ্যতার অভাব, কি আছে তা ঠিক করা শক্ত।"

সন্ধ্যা বলিল, "কবরেজ মশাই গরীব, কিন্তু অসভ্য নন। বেশ শিক্ষিত এবং সভ্য"

"আমার কথাটা ধরতে পারলে না তুমি। গরীব হলেও এই টেবিলটার উপর পাতা দুটো পেতে চেয়ারে বসে' খেতে পারতেন। আমাদের সামনে খেতে আপত্তি থাকলে, টেবিল-চেয়ার ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ারও বাধা ছিল না—"

"উনি বরাবরই ওই রকম, এ দেশের ধারাই ওই। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন প্রতি বছর ফসল কাটা হয়ে যাবার পর মাঠে জনমজুরদের খাওয়ানো হ'ত। আয়োজন যৎসামান্য। কেবল থাকত প্রচুর দই, চিঁড়ে আর গুড়। ওরা নিজেরাই কলা-পাতা কেটে আনত, আর কয়েকটা মাটির বড় বড় ঢেলার উপর সেটা পেতে বড় একটা গামলার মতো করে' নিত। তাতে ঢালা হ'ত দই, তার উপর চিঁড়ে আর গুড়। মহানন্দে খেত সবাই—"

এ আলোচনা আর বেশী দূর অগ্রসর হইল না। মুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া কবিরাজ মহাশয় ফিরিয়া আসিলেন। বেশী চেয়ার ছিল না, রঙ্গনাথ দাঁড়াইয়া উঠিলেন।

'তুমি বস, তুমি বস, আমি মাটিতেই বসছি—"

"আপনি এই চেয়ারটায় বস্থন"

স্বাতী উঠিয়া দাঁড়াইল।

"তা বসতে পারি। তোমার চেয়ারে বসবার হক আমার আছে। ছোট গিন্নী তো—"

সন্ধ্যা বলিল, "ওর চেয়েও ছোট আছে আর একজন। চিত্রা—"

"সে-ও এসেছে ?"

"আসে নি। আসবে—"

"আস্থক, দেখি তাকে পসন্দ হয় কিনা। একে খুব পসন্দ হয়েছে। আপাতত এই ছোট-গিন্নী থাক—"

মুচকি হাসিয়া স্বাতী ঘরটার দিকে ছুটিয়া গেল, আরও চেয়ার আছে কিনা দেখিবার জন্য। চেয়ার ছিল না, ছিল একটা কাঠের বেঞ্চি। শাস্তার সাহায্যে সেইটাই সে বাহির করিয়া আনিল।

সকলে উপবেশন করিলে রঙ্গনাথ কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনার দেশ বুঝি রাজপুতানায়—"

"হ্যাঁ, আমাদের ঠাকুরদা অন্তত তাই বলতেন। আমরা তিনপুরুষ কিন্তু এই দেশেই বাস করছি। তবে দরকার হলে মাঝে মাঝে দেশে যাই। গ্রামে ভাঙা বাড়িটা আছে এখনও, তবে আর থাকবে না। বাড়ি না সারালে থাকে না, আর সারাতে হ'লে পয়সা চাই, সে পয়সা আমার কোথা—"

"দেশে আত্মীয়-স্বজন আছে ?"

"প্রচুর। বাড়ির কপাট জানলা সব খুলে নিয়েছে। এবার গিয়ে দেখলাম ইটগুলোও নিয়ে যাচ্ছে—"

সকলের মুখেই হাসি ফুটিল। রঙ্গনাথ উপলব্ধি করিলেন কবিরাজ স্থরসিক ব্যক্তি।

"দেশে গিয়েছিলেন কেন ?"

"বক্তৃতা করতে —"

"কিসের বক্তৃতা"

"রাজপুতদের এক সভা হয়েছিল । আজকাল সবাই তো নিজের ঢোল পিটাতে ব্যস্ত, রাজপুতরাও ব্যস্ত হয়েছিল। অনেক রাজপুত জমা হয়েছিল সেখানে, আমারও ডাক পড়েছিল"

"কি বললে সবাই"

"কি আর বলবে, নিজেদের ঢাক পেটালে খালি। আমরা হ্যান্ আমরা ত্যান্—এই সব আর কি। টডের রাজস্থান আওড়ালে কেউ কেউ—"

"আপনি কি বললেন—"

কবিরাজ মহাশয় মুখে হাত চাপা দিয়া খিক্ খিক্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"আমি যা বললাম ; তাতে চটে' গেল সবাই"

"কেন, কি বলেছিলেন—"

বলেছিলাম "আমরা নিজেদের যতই বড়াই করি না কেন, সত্যি কথা হচ্ছে রাজপুতরা অতি নির্বোধ জাতি। উদাহরণও দিয়েছিলাম অনেক। রামচন্দ্রই ধরুন। তাকে কি কেউ বুদ্ধিমান বলবে! সৎমার উস্কানিতে বাবা বললে বনে যাও, অমনি সে বনে চলে গেল। তা-ও গেলি গেলি বউটাকে সঙ্গে নিয়ে গেলি কেন। বউ নিয়ে কেউ কখনও বনে যায়? বনে গিয়েও সে যা করলে তা কোনও বুদ্ধিমান লোক করত না। বউ বললে আমাকে সোনার হরিণ ধরে এনে দাও। অমনি ছুটল হরিণের পিছু পিছু। সোনার জীবন্ত হরিণ হওয়া যে সোনার পাথর বাটির মতোই অসম্ভব—তা সে ভেবে দেখলে না একবার। ছুটল হরিণ ধরতে। তার আগে লক্ষ্মণের ব্যবহারটাও বিবেচনা কর। সূর্পনখা ব্যভিচারিণী তা মানলুম, তাকে দূর করে' তাড়িয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যেত, তার নাক কান কাটতে গেলি কেন, এটা কি কোন ভদ্রলোকের কাজ? এই সবের ফলেই সীতাহরণ আর লঙ্কাকাণ্ড। এ সব বুদ্ধির পরিচয় নয়। তারপর মহাভারতের গল্পটা ভাবুন। যুধিষ্ঠিরকে কি বুদ্ধিমান লোক

বলবেন আপনি ? ও তো একটা জরদ্‌গব। ধর্মপুত্র মানে কি বোকা ? ব্রাহ্মণ বশিষ্ট ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের চেয়ে ঢের বেশী বুদ্ধিমান। ভীষ্মের চরিত্রে একটু তবু নুন ঝাল আছে, কিন্তু কেমন যেন এক-বগ্‌গা গোছের। তোর বাপ দুশ্চরিত্র বলে' তুই আজীবন কৌমার্যব্রত পালন করবি কেন। এর কোন মানে হয়। তারপর কুরু-পাণ্ডবদের কাণ্ডটা দেখুন। তোদের মধ্যে আপোষে ভায়ে-ভায়ে ঝগড়া হয়েছে মানলুম, বিষয়-সম্পত্তি নিয়েও হামেসাই হয়ে থাকে। তাই বলে' ঘরের বউকে সভার মাঝখানে টেনে এনে উলঙ্গ করবি ? আর তাই নিয়ে হাসাহাসি করবি ? এ যে ছোট লোকেরাও করে না। কর্ণ দুর্যোধন ওরা কি মানুষ, লম্পট সব। আর ওই অর্জুন লোকটি যেখানে গেছে একটি করে বিয়ে করেছে। ভীম সেন রাক্ষসী হিড়িম্বাকেও ছাড়ে নি। দুঃশাসন, অশ্বত্থামা তো পিশাচ, ছোট শিশুকে পর্যন্ত হত্যা করেছিল অশ্বত্থমা। তারপর ইতিহাসের এলাকায় আসুন ! ওই যে পদ্মিনীর গল্প, ও শুনে আপনারা বাহবা বাহবা করেন। আমি তো ওর মধ্যে চূড়ান্ত নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না। আলাউদ্দিন যখন পদ্মিনীকে দেখতে চাইল তখন তার স্বামী ভীম সিং উত্তর দিলেন—আমাদের স্ত্রীলোকেরা অসূর্যম্পশ্যা, কারো সামনে বার হয় না। খাশা কথা। কিন্তু আলাউদ্দিন কত বুদ্ধিমান দেখুন, সে বলে পাঠালে আমার সামনে বের হবার দরকার নেই আয়নায় তার প্রতিচ্ছবি দেখলেই আমি সন্তুষ্ট হব। ভীম সিং অমনি রাজি হয়ে গেল। বুঝুন। সামনে দেখা আর আয়নায় দেখা তফাতটা কি, দেখে তো নিলে। ফল যা হয়েছিল তাতো জানেনই আপনারা। বোকা, বোকা, সব বোকা। ইতিহাসে একরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে—সামনে গরুর পাল নিয়ে যুদ্ধ করতে যাচ্ছে, ভাবছে গরু তাদের দেবতা বলে' সকলেরই দেবতা ! আজকালকার যুগে আসুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজপুত মানে দারোয়ান, কিম্বা কনেষ্টবল। হোৎকা চেহারা, ইয়া গোঁফ,

মগজে এক ছটাক বুদ্ধি নেই। মুনিব হুকুম দিলেই মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। জমিদারে জমিদারে ঝগড়া হচ্ছে, আর ওরা মারপিট করে' জেল খেটে মরছে। রাজপুতের ইতিহাস মানে নির্বুদ্ধিতার ইতিহাস। ওরা কখনও মুসলমানদের সঙ্গে পারে।"

কবিরাজ মহাশয় বক্তৃতা শেষ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা বলিল, "কিন্তু যাই বলুন, রাজপুতদের ইতিহাস আমাদের দেশের গৌরবময় ইতিহাস"

"ঠিক বলেছ। গৌ মানে এখানে গরু। ওদের গর্জনে হুঙ্কারে আমি তো গরুদের হাম্বারব ছাড়া আর কিছু শুনতে পাই না।"

"রাণা প্রতাপকে শ্রদ্ধা হয় না আপনার?"

"শ্রদ্ধা হয়, কিন্তু ওকে বুদ্ধিমান বলতে পারি না। আকবরের সঙ্গে ওর ভাব করা উচিত ছিল। আরে, আগে বাঁচতে হবে তো। আত্মরক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। মানসিংহ ওর চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান ছিল। কিন্তু—"

কিন্তু এ আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইল না। কুমারকে দূরে দেখা গেল, তাহার কাঁধে বন্দুক! তাহার পিছনে বাইক ঠেলিতে ঠেলিতে আসিতেছিল স্টেশনমাস্টারের ছেলে সুকুমার এবং চাকর ল্যাংড়া। ল্যাংড়ার দুই হাতে অনেকগুলি মরা হাঁস বদ্ধ-পদ অবস্থায় ঝুলিতেছে।

কবিরাজ মহাশয় সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

"তুমি শিকার করলে? বাঃ, অনেক পেয়েছ দেখছি"

"দুটো ফায়ার করেছিলাম। জলে পড়ে গেল কয়েকটা, তোলাই গেল না"

"আজ রাত্রে তাহলে থেকে যাই, কি বল"

কুমার সুকুমারের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই গোটা চারেক নিয়ে যা। চারটেতে কুলুবে তো?"

"ছুটোতে যথেষ্ট হবে। মা ওসব খায় না, বাবাও মন্ত্র নিয়েছেন—খাবেন কি না জানি না। আর তো বাড়িতে কেউ নেই। ছুটোই নিচ্ছি আমি—"

"বেশ"

সুকুমার গোটা দুই বড় বড় বেলে হাঁস বাইকের হাতলের দুইধারে বাঁধিয়া লইল।

"আমি চলি তাহলে"

"আচ্ছা"

সুকুমার টপ করিয়া নিজের নূতন বাইক্‌টাতে চড়িয়া বসিল। এই শিকার-উপলক্ষে নিজের বাইক্‌টাতে যে বারবার চড়িবার সুযোগ পাইয়াছে, ইহাতেই সে খুশী। এখানে বাইক চড়িবার সুযোগই নাই, বাজারে বা পোস্টাফিসে কতবার আর যাওয়া যায়। আজ সে অনেক সুযোগ পাইয়াছে। অধিকাংশ সময়ই বাইক্‌টা ঠেলিয়া তাহাকে কুমারের পিছু পিছু চলিতে হইয়াছে তাহা সত্য, কিন্তু প্রয়োজনের সময় সে বাইক্‌টাকে কাজে লাগাইতে পারিয়াছে তো। বালুয়াচকে যখন হাঁস পাওয়া গেল না তখন বাইকে চড়িয়া সে-ই গঙ্গার ধারে গিয়া খবর আনিল যে কাজিগ্রামের বাঁকটায় অনেক হাঁস আছে, সেখানে বসিবার বেশ ভালো একটা আড়ালও আছে। বাইক করিয়া এ খবর না আনিলে কুমারবাবু বালুয়াচক্‌ হইতেই ফিরিয়া আসিতেন।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "তুমিই রাঁধবে নাকি"

"হ্যাঁ"

"বাঃ, তাহলে তো গ্র্যাণ্ড হবে। কিন্তু একটু অনুরোধ আছে কুমারবাবু"

"কি"

"খুব বেশী লঙ্কা দিও না। আমি অর্শের রুগী তো। আর বেশী লঙ্কা খাওয়া'টা তোমাদের পক্ষেও ভালো না"

"বেশ, তাই হবে"

কুমার তখন ল্যাংড়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুই হাঁসগুলো ছাড়িয়ে কুটে এখানে ঠিক করে' রাখ। এখন ওগুলোকে ওই কেরোসিন কাঠের সিন্ধুকটার ভিতর ঢুকিয়ে রেখে দে। তারপর বাড়ি থেকে বাসনপত্তর, মশলা, পেঁয়াজ, রসুন আর তোলা উনুনটা নিয়ে আয়। সব ঠিক হ'য়ে গেলে তারপর উনুনের আঁচটা দিয়ে দিস্"

ল্যাংড়া এসব কাজ করিয়া অভ্যস্ত, সে কাজে লাগিয়া গেল।

কবিরাজ মহাশয় প্রশ্ন করিলেন "মাংস কি এখানে রাঁধবে নাকি"

"বাড়িতে যে কাকাবাবু রয়েছেন। বৌদি এসব হাঙ্গাম বাড়িতে করতেই দেবেননা। এমনি হাঁসটাস মারাতে ওর মনে মনে আপত্তি যথেষ্ট। এখানেই বেশ হবে"

"বেশী ঝালটি কিন্তু দিওনা বাপু—"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "ডাক্‌রোস্টই তো ভালো সবচেয়ে"

"সে আর একদিন খাওয়াবো আপনাকে। আজ কারি হোক"

"কি কি হাঁস পেয়েছেন। চখা তো রয়েছে দেখছি। ওগুলো কি—"

"বেশীরভাগই টিল। আর ওই বড়টা Spoonbile। এদেশে বলে পস্‌নি ঠোরা"

সন্ধ্যা নাকটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আঁশটে গন্ধ হবে না তো"

"না। ঠেসে পেঁয়াজ রসুন দেব"

সন্ধ্যা দূরে চাহিয়া বলিল, "মেজদি আসছে। এবার বকুনি খাবার জন্যে প্রস্তুত হও"

সকলে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল উষা আসিতেছে। তাহার গায়ের লাল র‍্যাপারটা প্রতিফলিত সূর্য কিরণে আগুনের মতো

দেখাইতেছিল। দূর হইতে তাহাকে মূর্তিমতী রোষবহ্নির মতোই দেখাইতেছিল, কিন্তু নিকটে আসিতে দেখা গেল সে হাসিতেছে। কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া সে আর একটু হাসিল এবং আগাইয়া আসিয়া প্রণাম করিল।

"আরে আরে আমাকে প্রণাম করছিস কি! তুই ব্রাহ্মণের মেয়ে, ব্রাহ্মণের বউ, আমি ছত্রি"

"বাঃ, আপনি যে কাকাবাবু—"

"এই কাণ্ড দেখ"

তাহার পর উষা রঙ্গনাথের দিকে চাহিয়া বলিল, "খাবে না? ক'টা বেজেছে জান?"

"তা তো জানিনা, ঘড়ি কাছে নেই"

সন্ধ্যার হাতে সুদৃশ্য একটি রিষ্ট-ওয়াচ ছিল। সেদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "দেড়টা"

"এতক্ষণ বসে গল্প করছিলি, তোর হুঁস থাকা উচিত ছিল"

"কবরেজ কাকা এসে পড়লেন যে"

উষা হাসিমুখে কবিরাজ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব গল্প জমিয়েছিলেন বুঝি। আহা, আমি শুনতে পেলুম না। কিন্তু চল সব, আর দেরি নয়। রান্না হ'য়ে গেছে, বাবা তোমাদের সকলকে নিয়ে খাবেন বলে' অপেক্ষা করছেন। ওগুলো কি—"

ঘরের বারান্দার উপর স্তূপীকৃত হাঁসগুলি এইবার সে দেখিতে পাইল।

সন্ধ্যা মুচকি হাসিয়া বলিল, "ছোটদা মেরে এনেছে"

"ও বাবা, এত বেলায় অত তত্ত্ব এখন করবে কে"

"আমি এখানেই রান্না করব"

"তুমি তো শুধু খুন্তি নাড়বে। মশলাপত্তর হাঁড়িকুড়ি ঘি তেল মশলা সব বয়ে বয়ে আনতে হবে। কে করবে অত কাণ্ড!"

কুমার বলিল, "তুই ভাবচিস কেন, ল্যাংড়া করবে সব"

"আমি তোমার সঙ্গেই থাকব ছোটকাকা"—স্বাতী হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

উষা ল্যাংড়ার নিকট আগাইয়া গেল এবং তাহাকে আদেশ করিল, "দেখ মেটেগুলো সব আলাদা করে' রাখিস। আলাদা চচ্চড়ি হবে"

কবিরাজ মহাশয় স্মিতমুখে ইহাদের দিকে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা সরিতেছিল না, মুগ্ধ অভিভূত হইয়া তিনি কেবল দেখিতেছিলেন ইহাদের, লোকে যেমন ভালো ফুলের বাগান দেখে।

ল্যাংড়ার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া উষা বলিল, "চল, চল, আর দেরি নয়। বাবা অপেক্ষা করছেন তোমাদের জন্য। গগনের বউ গীটার বাজিয়ে শোনাবে বাবাকে। কাকাবাবু চলুন, গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে। কাকীমা কেমন আছেন। ভালো আছেন তো—"

"খুব প্রবলভাবে ভালো আছেন। বয়স তিনকুড়ি পার হয়েছে, কিন্তু বুড়ি হয়নি। এখনও শুকনো চিঁড়ে চিবিয়ে খায়। যখন কথা বলে মনে হয় কামান গর্জন করছে। তার ভয়েই তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই—"

"খুব বকেন বুঝি আপনাকে"

"আমি ছাড়া আর কাকে বকবে। আর তো কেউ নেই"

কবিরাজ হাসিমুখে উষার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উষার সহসা মনে পড়িল কবিরাজ-কাকার দুটি মেয়ে ছিল। সব মারা গিয়াছে। চুপ করিয়া রহিল সে।

কবিরাজ বলিলেন, "আমি যখন থাকি না তখন ভগবানকে বকে। বকে আর কাঁদে। চোখে ঘুম নেই। রাত্রেও বকে। তাকে কিছুতেই বোঝাতে পারিনা ভগবানের কান নেই, আর মৃত্যু পৃথিবীর নিয়ম। সবাই মরবে। আগে আর পিছে। বলি কিন্তু বোঝে না"

হঠাৎ এই শোকাকুল পরিস্থিতির চেহারা বদল হইয়া গেল পোস্টমাস্টারবাবুর আবির্ভাবে। তিনি একটি টেলিগ্রাম লইয়া আসিয়াছেন।

"পিওনটা ফেরেনি এখনও। তাই আমিই নিয়ে এলাম"

কুমার সানন্দে অনুভব করিল রাধানাথবাবুর ঔষধ ধরিয়াছে।

টেলিগ্রাম খুলিয়া কুমার বলিল, "সেজদা কাল আসছে"

উষা সানন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল।

"সেজবৌদিও আসছে তো"

"হ্যাঁ। লিখেছেন—Reaching with family"

"বাবা শুনে খুব খুশী হবেন। উনি ভাবছেন। মেজদার কোন খবর নেই?"

"এখনও পাইনি তো—"

"কি যে কাণ্ড মেজদার—"

কবিরাজ মহাশয় সান্ত্বনা দিলেন।

"দেখ সবই যদি একরকম হ'ত তাহলে একরঙা হয়ে যেত তুনিয়াটা। ভগবান তু'টি মুখ একরকম করেননি। হাতের পাঁচটি আঙুল পাঁচরকম। পৃথুবাবু নতুন সুর বাজিয়েছেন একটা। যখন শুনব তখন ভালোই লাগবে মনে হয়—"

রঙ্গনাথ পকেট হইতে একটা খাতা বাহির করিয়া তাহাতে লিখিতেছিলেন। বেড়াইতে বেড়াইতে যে সব কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল তাহাই টুকিয়া রাখিতেছিলেন। এরকম খাপছাড়া ডায়েরি লেখা তাঁহার স্বভাব।

স্বাতী সহসা চেঁচাইয়া উঠিল, "ছোট পিসি, তোমার পিঠের উপর প্রকাণ্ড একটা পোকা বসেছে—"

সন্ধ্যা নিজের মনে দস্তানা বুনিতেছিল, আর ভাবিতেছিল দিদি আসিয়াই কবিরাজ-কাকাকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে তো করে নাই। অন্যায় হইল কি? সকলকে প্রণাম করা কি উচিত? কেবল

প্রণম্যদের প্রণাম করাই ঠিক। কিন্তু সত্যই কি কেহ প্রণম্য আছে—এই সব কথা ভাবিতেছিল সে। ভাবিতেছিল ইহা লইয়া একটা প্রবন্ধ লিখিবে। স্বাতীর কথায় সে লাফাইয়া উঠিল না। মৃদুকণ্ঠে কেবল বলিল, "ফেলে দে না—"

"ও বাবা, ওর গায়ে আমি হাত দিতে পারব না। প্রকাণ্ড বড়—"

উষা বলিল, "গঙ্গা ফড়িং। গঙ্গায় কত জল জিগ্যেস করলেই পা তুলে দেখাবেন গঙ্গায় কত জল—ওই দেখ পা তুলছে। বাঃ সুন্দর সবুজ ফড়িংটি তো। এত বড় প্রায় দেখা যায় না। যাক আমি ফেলে দিচ্ছি—"

রঙ্গনাথ মৃদু হাসিয়া সন্ধ্যার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাঘের কবলে পড়েছিলে—"

"তার মানে ?"

"পোকার জগতে গঙ্গা ফড়িং হচ্ছে বাঘ"

দূরে দেখা গেল শান্তা আসিতেছে।

"ওই শান্তা আবার আসছে। চল, চল, বৌদি রাগ করছেন

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইলেন।

কুমার পোস্টমাস্টারবাবুর দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনি পাখীর মাংস খান তো"

"খাই—"

"তাহলে আজ রাত্রে আমাদের বাড়িতে খাবেন ? হাঁস শিকার করেছি আজ—"

"হ্যাঁ, বন্দুকের আওয়াজ পেয়েছিলাম একটু আগে"

"রাত্রি দশটা নাগাদ আসবেন"

"আচ্ছা"

পোস্টমাস্টার অন্তরের অন্তস্তলে যাহা অনুভব করিলেন তাহা

ইতিপূর্বে আর কখনও করেন নাই। তাঁহার অদ্ভুত একটা আনন্দ হইতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর স্বাতী শশব্যস্ত হইয়া মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। দেখা গেল বাগানের বাহিরেই যে মাঠটা আছে সোমনাথ সেখানে এক দুই তিককে লইয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। এক লাটাই ধরিয়া আছে, চমৎকার একটি লাল ঘুড়ি আকাশে উড়িতেছে।

উষা বলিল, "ওদের নিয়ে এমনিই তো আমি নাকানিচোবানি খাচ্ছি, এর উপর তুমিও যদি ওদের সঙ্গে যোগ দাও, তাহলে তো আমি আর পেরে উঠব না, হাল ছেড়ে দিতে হবে আমাকে। চান টান হয়ে গেছে তোমার ?"

সোমনাথ হাসিয়া বলিল, "ভোরেই তো চান করেছি"

"চল এখন খাবে চল। এই ঘুড়ি লাটাই থাক, এখন খাবি ল—"

এক ভুরু কুঁচকাইয়া বলিল, "বাঃ, একটু আগেই তো লুচি তরকারি পেট ভরে খেয়েছি। আমার এখন খিদে পায় নি"

দুই বলিল, "আমারও পায় নি"

তিন বলিল, "আমালও"

তিনের বয়স যদিও ছয়, কিন্তু তাহার আধো-আধো কথা এখনও আছে, এখনও সে পরিষ্কারভাবে 'র' উচ্চারণ করিতে পারে না।

উষা ধমকাইয়া উঠিল।

"তোমাদের তো কোন সময়েই খিদে পায় না, ঘাড় ধ'রে খাইয়ে দিতে হয়। চল, যা পার খেয়ে নেবে। বউদি কতক্ষণ বসে থাকবে তোমাদের জন্য"

সুতা গুটাইতে গিয়া একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। বাবলা গাছে ঘুড়িটা আটকাইয়া শেষ পর্যন্ত ছিঁড়িয়া গেল।

"ওই যাঃ—এ কি হ'ল"

এক প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

"ও ঠিক করে' দেব আমি। তাছাড়া গঙ্গাকে আরও চারটে ঘুড়ি, দুটো লাটাই, আর অনেক সুতো আনতে দিয়েছি আমি। চল না, খেয়ে দেয়ে আবার ওড়ানো যাবে—"

ছেঁড়া ঘুড়িটা গুটাইয়া সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল আবার।

সূর্যসুন্দরের ঘরেই খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ঘরটি প্রকাণ্ড হলের মতো। সকলেরই বেশ কুলাইয়া গেল। সূর্যসুন্দরের বিছানার পাশে যে তেপায়াটা ছিল তাহার উপর প্রকাণ্ড একটি কাঁসার গ্লাসে ডালসুদ্ধ এক ঝাঁক রক্তজবা শোভা পাইতেছিল। পুরসুন্দরী গ্লাসটি কাঠের সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্যসুন্দরের বাবার গ্লাস, ওই গ্লাসেই তিনি প্রত্যহ নাকি জল পান করিতেন। অত বড় গ্লাস আজকাল দেখা যায় না, যেমন বড় তেমনি ভারী। খালি গ্লাসটাই কিরণ সহজে একহাতে তুলিতে পারে নাই। জলভরতি এই গ্লাস ঠাকুরদা প্রত্যহ এক হাতে অবলীলাক্রমে তুলিতেন, এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিল। সূর্যসুন্দর গ্লাসটিতে জল ভরাইয়া তাহাতে কিছু জবাফুল সাজাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন। জবাফুল তাঁহার বাবার খুব প্রিয় ছিল, প্রত্যহ জবাফুল দিয়া কালীপূজা করিতেন তিনি। শেষ-জীবনে নিজের বাসার আঙিনায় দুইটি জবার গাছও তিনি পুতিয়াছিলেন। এই গাছ দুইটির এবং তাঁহার পোষা হরিণটির সেবা করা তাঁহার নিত্যকর্মের মধ্যে ছিল। পোষা হরিণের শিং দুইটিও সূর্যসুন্দর সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। সেটি সামনের দেওয়ালেই টাঙানো ছিল। তাহাদের ঘিরিয়াও একটি জবাফুলের মালাটি গাঁথিয়াছিল। আজ সহসা তিনি যেন একটু বেশী কল্পনা-প্রবণ হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাবার স্মৃতি-চিহ্নগুলিকে সাজাইয়া একটু যেন বেশী তৃপ্তি পাইতেছিলেন। এই সবের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর শুধু বাবাকেই নয়, পৃথ্বীশকেও যেন স্পর্শ করিতে চাহিতে ছিল। তিনি তাঁহার মনের ভাব অবশ্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি জানেন

কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলে এ সবের মাধুর্য নষ্ট হইয়া যায়। আপনার মনেই মশগুল হইয়া বসিয়াছিলেন তিনি। পত্নী রাজলক্ষ্মীর অয়েলপেন্টিংখানাও সামনের দেওয়ালেই বিলম্বিত ছিল। উর্মিলা তাহাতেও একটা কুন্দফুলের মালা টাঙাইয়া দিয়াছিল। ...একটা কাঁসার গ্লাস, এক জোড়া হরিণের শিং, আর রাজলক্ষ্মীর ছবিটিকে কেন্দ্র করিয়া তিনি যে জগত মনে মনে সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছিলেন তাহা ঠিক স্বপ্নও নহে, উভয়ের সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত জগত। তিনি কল্পনা করিতেছিলেন এই যে আজ তিনি ছেলেমেয়ে নাতি-নাতিনী-নাতবৌ লইয়া খাইতে বসিয়াছেন ইহাতে তাঁহার বাবা এবং রাজলক্ষ্মী অদৃশ্যভাবে উপস্থিত আছেন। পৃথ্বীশও। তিনি ডাক্তার, এই সেদিন পর্যন্ত প্র্যাক্টিস করিয়াছেন। মানুষের স্থূল শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার ছিল। কিন্তু স্থূল শরীরের কারবার করিতেই এমন সব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যাহার তাৎপর্য অ্যানাটমি, ফিজিওলজি বা প্যাথোলজির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না, সূক্ষ্মপথে রহস্য লোকে উত্তীর্ণ হইয়া তাহার মর্ম বোঝা যায়। পরলোক বলিয়া যে কিছু একটা আছে তাহার আভাস একাধিকার তিনি ইহজীবনেই পাইয়াছেন। সেদিন বিশেষ করিয়া চৌধুরীজির কথাটা তাঁহার মনে পড়িতেছিল। বছর দশেক আগে চৌধুরীজির মৃত্যু হইয়াছে। তিনিই তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন, চৌধুরীজির শেষ চিকিৎসাও তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুর প্রায় বারোঘণ্টা পূর্বে চৌধুরীজি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। শেষে কাহাকেও আর চিনিতেছিলেন না। বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছিলেন বুঝা যাইতেছিল না। সূর্যসুন্দর সন্ধ্যা হইতেই তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলেন এবং ঘড়ি ধরিয়া ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া খাওয়াইতে হইতেছিল, ঔষধের সবটা পেটেও যাইতেছিল না, কস বাহির হইয়া পড়িয়া যাইতেছিল।

চৌধুরীজির বড় ছেলে ফাগুবাবু রাত্রি দশটা নাগাদ শুইতে গেলেন। তাঁহারও জ্বর হইয়াছিল। সূর্যসুন্দরই জোর করিয়া তাঁহাকে শুইতে পাঠাইলেন। যখন ঘটনাটি ঘটিল তখন রাত্রি একটা! সূর্যসুন্দরেরও একটু ঢুল আসিয়াছিল। হঠাৎ একটা চীৎকারে তাঁহার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। শুনিতে পাইলেন—নিশীথ নীরবতাকে বিদীর্ণ করিয়া নীচে যেন কে ডাকিতেছে—ছক্কু, ছক্কু, চল আমি এসেছি। ডাকটি শুনিবামাত্র চৌধুরীজি তড়াক করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। সূর্যসুন্দর দেখিলেন, তাঁহার আচ্ছন্নভাব নাই—চোখের দৃষ্টি প্রশ্নাকুল।

"ছক্কু ছক্কু বলে কে ডাকলে না?"

"হ্যাঁ"

"শুনেছেন আপনি?"

চৌধুরীজিকে বেশ উত্তেজিত বোধ হইল।

"শুনেছি। কেউ বোধহয় চাকর-টাকরকে ডাকছে। ছক্কু বলে' আপনাদের কোন চাকর আছে কি? যাইহোক আপনি উঠেছেন যখন—তখন এই ওষুধটা খেয়ে নিন"

"না, আমি আর ওষুধ খাব না। বাবুলাল আমাকে ডাকতে এসেছে, আমারই ডাক নাম ছক্কু"

সূর্যসুন্দর একথা জানিতেন না।

"বাবুলাল কে?"

"আমার বাল্যবন্ধু। অনেকদিন আগে মারা গেছে। কথা ছিল, আমাদের দু'জনের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে অপরের মৃত্যু-কালে ডাকতে আসবে। বাবুলাল ডাকতে এসেছে। আমি চললাম—"

চৌধুরীজি বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। এই ঘটনাটা মনে পড়িবার পর তাঁহার বাল্যবন্ধু মন্মথকে মনে পড়িল। সে-ও তো অনেকদিন আগে মারা গিয়াছে।

সে কি তাঁহার মৃত্যুকালে ডাকিতে আসিবে? কোনও কথা হয় নাই তো।

কিরণ আসিয়া প্রবেশ করিল।

"চম্পাকে আগেই খাইয়ে দিলুম। গগনের জেদ! গগন বলছে তোমরা যখন খাবে তখন চম্পা এই কোণের ঘরে বসে' গীটার বাজাবে। তুমি গীটার শুনতে চেয়েছ না কি"

"হ্যাঁ"

"বৌদি কিন্তু খুব চটে গেছে। বলছে শ্বশুর-শাশুড়ী স্বামী-দেওর কেউ খায়নি ও আগে খাবে কেন"

"তাতে কি হয়েছে। শাশুড়ীর ধারা ধরেছে দেখছি বড় বউ। ও পোয়াতি মানুষ, ওকে আগেই খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল। ডেকে দাও আমি বলে' দিচ্ছি"

"ডাকতে হবে না, আমি বসিয়ে দিয়েছি। খাবে তো ভারি। আমি ঊর্মিলাকেও বসিয়ে দিয়েছি, ও তো আপনাকে খাওয়াবে"

কিরণ আবার চলিয়া গেল।

ঠিক পাশের ঘরেই চম্পা গীটার বাজাইতেছিল।

সুরের এমন একটা অদ্ভুত পরিবেশ হইয়াছিল যে কিছুই যেন বে-মানান মনে হইতেছিল না। মলিন জামাকাপড়-পরা খোঁচা-খোঁচা-গোঁফ-দাড়ি কবিরাজ মহাশয় ফিটফাট সদানন্দের পাশে বসিয়া খাইতেছিলেন, গগন একটা ডগমগে রঙের সিল্কের ঢিলা পাজামা পরিয়া খাইতে বসিয়াছিল, রঙ্গনাথ কাঁটা চামচ দিয়া খাইতেছিলেন। কিরণ ঊষা আর সন্ধ্যা পাশাপাশি বসিয়াছিল এবং নিম্নকণ্ঠে গল্প করিতেছিল, বিরুবাবু খাইতে খাইতেও ছোট একটা বই বাঁ হাতে

ধরিয়া পড়িতেছিলেন—ইজিপ্টের সম্বন্ধে বই, সন্ধ্যা-বেলা নাতিদের গল্প বলিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহারই উপকরণ সংগ্রহ করিতেছিলেন। চন্দ্রসুন্দর সকলের নিকট হইতে একটু দূরত্ব রক্ষা করিয়া আলাদা একধারে বসিয়া নিরামিষ সাত্ত্বিক ভোজন করিতেছেন, হাবুল মামা একটা রঙীন লুঙ্গীন পরিয়া একটি কাষ্ঠাসনের উপর উবু হইয়া বসিয়া খাইতেছিলেন, আর পাঁচজনের মতো সুখাসনে বসিয়া তিনি সুখ পান না। তাঁহার খাইবার ধরনটিও একটু অভিনব, খাবারগুলি যেন মুখের মধ্যে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া দিতেছিলেন। সূর্যসুন্দর বিছানার উপর বসিয়াই খাইতেছিলেন। তাঁহার সামনে এবং দুই পাশে ছোট ছোট টেবিল, পিছনে ঠেস দিবার জন্য ব্যাক্‌রেস্ট। উর্মিলা গলায় একটা রঙীন তোয়ালে বাঁধিয়া দিয়াছিল, কোলের উপর আর একটি বড় তোয়ালে পাতা ছিল, খাবার পড়িয়া যাহাতে কাপড়-চোপড় বা বিছানা নষ্ট না হয় উর্মিলা সে বিষয়ে সতর্ক হইয়াছিল। উর্মিলাই চামচে করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াও দিতেছিল। এইরূপ নানারকম বিসদৃশ দৃশ্যের সমন্বয় হইয়াছিল ঘরটিতে। কিন্তু গীটারের সুরের আবহাওয়ায় সব যেন মানাইয়া গিয়াছিল।

সূর্যসুন্দর প্রতিটি তরকারি তারিফ করিয়া খাইতেছিলেন। তিনি সেকালের লোক, তাঁহার মতে কোনও শিল্প-কর্মের সম্যক প্রশংসা না করিলে শিল্পীর অপমান করা হয়। খাবার খাইয়া, গান শুনিয়া বা যে কোন শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিয়া প্রশংসা না করাটা তাঁহার মতে শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। তিনি এটাও লক্ষ্য করিয়াছেন আজকাল অনেকেই এ বিষয়ে কৃপণ-স্বভাবের, প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিতে পারে না, মুচকি হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে। অনেক সময় হাসেও না, গোমড়া-মুখ করিয়া সুখাদ্য খায় অথবা গানবাজনা শোনে। তিনি এ জাতের লোক নন, তাই রান্নার অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। সুক্‌তোটা বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। পুরসুন্দরী স্বহস্তে এটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই ব্যঞ্জনটির প্রতি

শ্বশুরের বিশেষ পক্ষপাতিত্বের কথা তিনি জানিতেন। প্রশংসা শুনিয়া আর একটু আনিয়া দিলেন। কোনও রান্নার প্রশংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহা আর একবার আনিয়া না দিলে মনে মনে তিনি অসন্তুষ্ট হ'ন, এটাও তাঁহার মতে অভদ্রতা।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিয়ছিলেন কবিরাজ মহাশয়। তাঁহাকে প্রতিটি পদ কখনও দুইবার, কখনও কখনও তিনবারও দিতে হইতেছিল। পার্বতী একা তাঁহাকেই পরিবেশন করিতেছিলেন।

পুরসুন্দরী পরিবেশন করিতেছিলেন সূর্যসুন্দর এবং চন্দ্রসুন্দরকে। কেবল নিরামিষ রান্না লইয়াই ছিলেন তিনি।

"দিগন্ত এই ফ্রাউ চারটে নিয়ে যা আমার কাছ থেকে—"

গগন দিগন্তর দিকে চাহিয়া আদেশের সুরে বলিয়া উঠিল।

পার্বতী বলিল, "তুমি খাও না, ফ্রাই তো রয়েছে অনেক—"

গগন এ কথার উত্তর না দিয়া পুনরায় দিগন্তকে লক্ষ্য করিয়া ডাক দিল—

"নিয়ে যা এগুলো—"

দিগন্ত কৃষ্ণকান্তের পাশে বসিয়া খাইতেছিল, সে উঠিয়া গিয়া গগনের নিকট হইতে প্লেটটা লইয়া আসিল।

সন্ধ্যা মন্তব্য করিল, "নিজে ডাক্তার হ'য়ে কি করে' যে এঁটো তুই অপরকে খাওয়াস।"

গগন একথারও কোন জবাব দিল না, তাহার চোখের দৃষ্টি হাস্যদীপ্ত হইয়া উঠিল শুধু। ব্যাপারটার তাৎপর্য কেবল বুঝিলেন পরসুন্দরী। নিজের খাবারের কিছু অংশ দিগন্তকে দিতে না পারিলে গগনের যেন খাইয়া তৃপ্তিই হয় না। ছেলে-বেলা হইতে ওই স্বভাব। পেয়ারায় এক কামড় দিয়া বাকিটা সে দিগন্তকে বরাবর খাওয়াইয়াছে।

পার্বতী ছাড়িবার মেয়ে নয়।

"ফ্রাই ভালো হয়নি সেকথা মুখ ফুটে বললেই হয়। দিগন্তকে দিয়ে দেবার দরকার কি"

গগন সংক্ষেপে বলিল, "ফ্রাই ওয়াণ্ডারফুল হয়েছে"

"তবে দিয়ে দিলে কেন, আরও এনে দেব ?"

"দে যখন ছাড়বি না"

পার্বতী ফ্রাই আনিতে যাইতেছিল। কিরণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া বলিল, "তোমার জামাইবাবুদের ভালো করে' জিগ্যেস কর—আর কি চাই। তোমার বড় জামাইবাবুটি বেশ খাইয়ে লোক—"

"আচ্ছা—"

পার্বতী প্রচুর ফ্রাই আনিয়া আবার সকলকে দিতে লাগিল।

চন্দ্রসুন্দর একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। পুরসুন্দরী পবিত্রভাবে আলাদা রান্নাঘরে তাঁহার জন্য নিরামিষ রান্না করিয়াছেন ইহা তিনি জানেন, নিরামিষ তরিতরকারিও নানারকম হইয়াছে, সে বিষয়েও খুঁত ধরিবার কিছু নাই, তবু কিন্তু চন্দ্রসুন্দর যেন স্বস্তি পাইতেছিলেন না। তাঁহার সামনে বসিয়া ছেলে-মেয়ে-জামাই একসঙ্গে খাইতেছে, ইহা তাঁহার আন্তরিক অনুমোদন লাভ করিতে পারে নাই, ইহার মধ্যে তিনি বৈদেশিক উচ্ছৃঙ্খলতার আভাস পাইতেছিলেন। পরনে ঢিলা পাইজামা, রঙ্গনাথের কাঁটা চামচ দিয়া খাওয়া, চম্পার গীটার বাজান—কোনটাই তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার উপায় নাই, কারণ দাদাই এ সব প্রশ্রয় দিয়াছেন। দাদার ছেলে-মেয়ে-জামাইদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যা-বৈভব প্রভৃতির বিরুদ্ধে আপাতত কিছুই বলিবার নাই, কিন্তু তাহাদের বিদেশী চাল-চলন মোটেই তাঁহার ভালো লাগিতেছিল না। তিনি

মনে মনে এই ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন—মজা বুঝিলেন পরে, অতি বাড় ভালো নয়। এ কথাও তাঁহার মনে হইতেছিল সবই অদৃষ্টের খেলা, তা না হইলে তাঁহার অমন ভালো ছেলে, যাহারা দুইবেলা সন্ধ্যাহ্নিক না করিয়া জল খায় না, তাহাদের এ দুর্দশা কেন। পার্বতী যখন প্রচুর চিংড়ি মাছের ফ্রাই আনিয়া পরিবেশন করিতেছিল তখন সহসা চন্দ্রসুন্দর যেন অনুভব করিলেন তাঁহার গলার ভিতরটা কুটকুট করিতেছে। জিবের পাশটাও। মনে পড়িল বাড়ির পাঁদাড় হইতে কুমার প্রচুর ওল খুঁড়িয়া বাহির করিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাবিলেন বৌমা ঠিক সেই ওল এই পাঁচ-মিশেলি ছঁ্যাচড়ার মধ্যে দিয়াছে। সহসা তাঁহার গলাটা খুব বেশী কুটকুট করিতে লাগিল। তিনি এক টুকরো লেবুতে নুন মাখাইয়া চুষিতে লাগিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি হইতে একটা নিরুপায় ক্ষোভ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল ছেলে-মেয়ে জামাইদের জন্য পোলাও কোর্মা কাবাবের আয়োজন করিয়া বড় বউ তাঁহার জন্য কেবল কতকগুলা শাক পাতা আর ওল সিদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। মুখে কিন্তু কিছুই বলিলেন না, কেবল সশব্দে লেবুটা চুষিতে লাগিলেন।

ব্যাপারটা পুরসুন্দরীর দৃষ্টি এড়াইল না। বাম হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা ঈষৎ টানিয়া তিনি মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"কাকাবাবু, খাচ্ছেন না যে। আর একটু ডাল এনে দেব?"

"বুনো ওল না শুকিয়েই তরকারিতে দিয়েছ মা. গলা কুট কুট করছে—"

"ওল তো রান্না হয়নি আজ"

"গলা কিন্তু কুট কুট করছে"

চন্দ্রসুন্দর মুখটা উঁচু করিয়া বাঁ হাত দিয়া গলা চুলকাইতে লাগিলেন। ইহাতে একটু রসভঙ্গের মতো হইল।

সূর্যসুন্দর বলিলেন, "তুই বোধহয় লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছিস। দুটো রসগোল্লা খেয়ে ফেল"

পুরসুন্দরী বলিলেন, "গরম গরম লুচি ভেজেছি। পায়েস দিয়ে তাই না হয় খান। ওসব খেতে হবে না, এই বাটিতেই হাতটা ধুয়ে ফেলুন—"

তাহাই হইল। চন্দ্রসুন্দর অসহায়ের মতো মুখ করিয়া পায়েস দিয়া গরম লুচি খাইতে লাগিলেন।

পাশের ঘরে চম্পা গীটারে 'ধন ধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটা বাজাইতেছিল। গগন নিমীলিত নয়নে কাটলেট চিবাইতে চিবাইতে মনে মনে গাহিতেছিল 'ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ'…।

সূর্যসুন্দর নিজের অজ্ঞাতসারেই সুস্থ পায়ের পাতাটা নাড়িয়া তাল দিতেছিলেন।

ইহা যে অসুখের বাড়ি তাহা মনেই হইতেছিল না। মনে হইতেছিল এক অভিজাত খাম-খেয়ালী বৃদ্ধকে ঘিরিয়া উৎসব চলিতেছে।

কৃষ্ণকান্ত মৃদুকণ্ঠে রঙ্গনাথকে প্রশ্ন করিলেন, "আচ্ছা, শাক ভাজাকে যদি ফ্রাই বলা যায়, তাহলে কি খুব ভুল হবে"

"হওয়াতো উচিত নয়। হঠাৎ এ কথা মনে হ'ল কেন"

"চলতি কায়দা অনুসারে তাহলে পার্বতীকে ফরমাস করি"

"করুন"

"পার্বতী আমার জন্যে একটু পালং ফ্রাই নিয়ে এসো তো"

"সে আবার কি!"

রঙ্গনাথ বলিলেন, "পালংশাক ভাজা চাইছেন"

"চিংড়ির ফ্রাই খেয়ে শাক ভাজা খাবেন?"

"খাব। রসুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে চমৎকার হয়েছে ওটা"

কিরণ নিম্নকণ্ঠে মন্তব্য করিল—"সবই অদ্ভুত"

উষা সহসা উঠিয়া এক-দুই-তিনের কাছে গেল। তাহার মনে হইল তাহারা খাইতেছে না।

"আয় খাইয়ে দি তোদের। পাগল করে দিবি দেখছি আমাকে। খাচ্চিস না ঘাঁটচিস কেবল। সরে' আয়—"

স্বাতী সোমনাথকে শুনাইয়া উষার কানে কানে বলিল, "প্রতিটি তরকারি আজ ঝালে পুড়িয়েছে পার্বতী। কি করে' যে খাই—"

আসলে প্রতিটি তরকারি তাহার খুব ভাল লাগিতেছিল কিন্তু তাহার শ্বশুর-বাড়িতে একেবারে আঝালা রান্না হয়, ভণ্ডামি করিয়া সোমনাথকে তাই সে জানাইয়া দিল যে ঝালে-পোড়া তরকারি তাহার পক্ষেও সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে।

সোমনাথ বলিল—"আমার তো চমৎকার লাগছে"

উষা স্বাতীর পাতের দিকে চাহিদা বলিল, "তোর পাতে তো কিছু পড়ে নেই"

স্বাতী মুচকি হাসিয়া বলিল, "উঃ, যা করে' খেয়েছি, পাছে পার্বতী কিছু মনে করে"

হঠাৎ প্লেট হাতে করিয়া মিস্ বোস (ওরফে অনু) আসিয়া প্রবেশ করিল।

"বাঃ, আমাকে আলাদা করে' তাঁবুতে খেতে দিয়েছেন কেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে খাব—"

স্বাতীর পাশেই সে বসিয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর স্নেহভরে তাহার দিকে চাহিলেন।

কুমারের খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, সে অনেকক্ষণ হইতেই উঠিবার জন্য উসখুস করিতেছিল। সে বলিল, "আমি এবার উঠি তিনটে বেজে গেছে। আপনারা খান। আমি বাগানে গিয়ে হাঁসগুলোর ব্যবস্থা করি গিয়ে—"

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হাঁ উঠে পড় তুমি কুমারবাবু। ও ব্যাপারটা বেশ ঝঞ্ঝাটের, সময় লাগবে"

কুমার উঠিয়া পড়িল এবং একটু পরে একটা পেট্রোম্যাক্‌স্ আলো লইয়া চলিয়া গেল।

সূর্যসুন্দর হঠাৎ বলিলেন, "চম্পাও এই ঘরে এসেই বাজাক না। ওঘরে বেচারি একা একা থাকবে কেন, এইখানেই আসুক"

পুরসুন্দরীর ইহাতে আপত্তি ছিল, চন্দ্রসুন্দরের তো ছিলই।

পুরসুন্দরী শ্বশুরের কথার প্রতিবাদ করিতে পারিল না, কেবল বাঁ হাত দিয়া মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এখানে বসবার জায়গা কোথা"

সূর্যসুন্দর গগনের দিকে চাহিলেন।

গগন সোৎসাহে দিগন্তকে আদেশ করিল—"ওই কোণের দিকে বড় মোড়াটা পেতে দে না—তা হলে হবে"

দিগন্ত এঁটো হাতেই উঠিয়া একটা বড় বেতের মোড়া খালি কোণটায় পাতিয়া দিল। তাহার পর পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "বৌদি, দাদু তোমাকে এইখানেই আসতে বলছেন। মোড়া পেতে দিয়েছি, এস"

গীটারটি হাতে লইয়া চম্পা আনত মস্তকে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

কমলা রঙের ঢাকাই শাড়িটিতে সুন্দর মানাইয়াছিল তাহাকে।

গগন তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "নতুন একটা কিছু ধর। দাদু, কি বাজাবে"

সূর্যসুন্দর উদ্ভাসিত মুখে চম্পার দিকে চাহিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন রাজলক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে তাঁহার নাত-বৌটিকে দেখিতেছে।

"ফরমাসটা তুমিই কর—"

"না তুমি কর—"

"মম যৌবন নিকুঞ্জে গাহে পাখী—এ গানটা বাজাতে পারে"

চম্পা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল পারে।

"তবে ওইটেই হোক, গগনের ওটটেই তো মনের কথা—"

চম্পার মস্তক আর একটু নত হইয়া গেল।

একটু পরেই গীটারে গানটা বাজিতে লাগিল।

এই সব কাণ্ড দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মৃত্যু-পথ-যাত্রীর নিকট বসিয়া ব্রাহ্মণ-বংশের কুলবধূ গীটার বাজাইয়া গুরুজনদের সম্মুখে বাইজিদের মতো লালসার গান গাহিতেছে ইহা অপেক্ষা বেশী শোচনীয় ঘটনা আর কি হইতে পারে। মনে মনে তিনি 'ছি ছি ছি' করিতেছিলেন—কিন্তু বাহিরে প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না, স্বয়ং সূর্যসুন্দরের হুকুম। তখন তিনি পুরসুন্দরীর দিকে চাহিয়া ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বড় বৌ তোমার পায়েসটাও একটু ধরে গেছে মনে হচ্ছে—"

"তাই না কি, অত বুঝতে পারি নি তো—"

হাবুল মামা নিষ্পলক-নেত্রে চন্দ্রসুন্দরের দিকে চাহিয়াছিলেন।

চোখোচোখি হইতেই বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া মুচকি হাসিলেন একটু। তাহার পর চাহিলেন শূন্য পায়েসের বাটিটার দিকে, আরার বার দুই নিশ্বাস টানিয়া আবার একটু মুচকি হাসিলেন।

গীটারে বাজিতে লাগিল—

সখি জাগো—
মেলি রাগ-অলস আঁখি
অনুরাগ-অলস আঁখি
মম অন্তরে থাকি থাকি
সখি জাগো—।

সূর্যসুন্দর বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিলেন। রাজলক্ষ্মীর ছবিটার দিকে তিনি চাহিতেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে মনে দেখিতে-ছিলেন যে লজ্জিতা বধূটিকে তাহার নামও রাজলক্ষ্মী ছিল, কিন্তু

সে এই ছবির রাজলক্ষ্মী নয়। তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া আসিয়াছিল।

১৪

আহারান্তে হাবুলমামা কবিরাজি ঔষধ 'চূরণ' খাইবার জন্য চন্দ্রসুন্দরের তাঁবুতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরসুন্দরী একটি শ্বেত পাথরের ছোট বাটিতে চন্দ্রসুন্দরের জন্য পান ছেঁচিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রসুন্দর তাহাই চিবাইতেছিলেন। হাবুল-মামার মুখের পান নাই দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

"পান খাও নি?"

"আগে 'চুরণ'টা খেয়ে নি, তারপর খাব। একটু গুরুভোজন হয়েছে আজ। অনেকদিন এসব খাওয়া অভ্যেস তো নেই। তুমিও নানা বায়নাক্কা করলে বটে, কিন্তু মন্দ খাওনি"

"এ সব ম্লেচ্ছ ব্যাপারের মধ্যে খেয়ে তৃপ্তি হয় না মামা। ওই ফ্রাই না কি, এমন বিশ্রী বোট্‌কা গন্ধ ছাড়ছিল, পেঁয়াজের কাঁচা রস দিয়েছে না কি দিয়েছে ভগবানই জানেন"

হাবুল-মামা বার দুই জোরে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি খড়্গাপুরে কত দিন ছিলে—"

"বছর দুই। কেন বল তো—"

"আমি যে কোয়ার্টারে গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করেছিলাম সেই কোয়ার্টারেই বরাবর ছিলে?"

"হ্যাঁ কোয়ার্টারটি তো ভালই ছিল"

"কি করে' ছিলে তাই ভাবছি"

"কেন। কোন কষ্ট ছিল না, দক্ষিণ পুব পশ্চিম তিন-দিকই খোলা—"

"কিন্তু তোমার বাড়ির লাগোয়া থাকতেন এক মৌলভী সাহেব। তাঁর বাড়ির পেঁয়াজ ভাজার শব্দ পর্যন্ত তোমার ঘরে বসে' শোনা যেত। গন্ধ তো পাওয়া যেতই। তাঁর মুর্গি তোমার উঠোনে বারান্দায় রোজ উড়ে আসত এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ওখানে তু'বচ্ছর কাটালে কি করে!"

"পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে ছিলুম। কি করব বল। দারিদ্র্যো দোষো গুণরাশি-নাশী!"

হাবুল-মামা মুচকি হাসিলেন এবং চূরণটি মুখে ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চন্দ্রসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চলিয়া গেলেন। গেলেন কম্পাউণ্ডারবাবুর কাছে।

গগন চুপি চুপি আসিয়া দাতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপেল স্টাফিং কেমন খেলে দাতু? ভাল লাগল?"

"চমৎকার। আগে কখনও খাইনি"

"তোমাকে এবার একটা পর্তুগীজ তরকারি খাওয়াব"

"কি"

"টম্‌ফ্র্যাডু—"

"সে আবার কি। মাংস, না মাছ?"

"লাউ। ছোটকাকার অনেক লাউ হয়েছে দেখছি। কাল করাব চম্পাকে দিয়ে"

"বেশী খাটিও না ওকে—"

"দিন-রাত তো বসেই আছে। বাজনা কেমন শুনলে—"

"খাসা"

"গানও মন্দ গায় না। সন্ধ্যের পর গাইতে বোলো, গাইবে"

ঊর্মিলা আসিয়া পড়াতে এসব গোপন আলোচনা বন্ধ করিয়া দিতে হইল। গগন ছোট-কাকীর দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গিয়াই তাহার দেখা হইয়া গেল দিগন্তের সঙ্গে।

"দিগন্ত, ননীকে একটা টেলিগ্রাম করে দে তো। ইংরেজি বাংলা কয়েক রকম পাকপ্রণালী যেন পাঠিয়ে দেয় কিনে। আপেল স্টাফিং খুব ভালো লেগেছে দাদুর। দাদুকে রোজ একটা করে' নতুন রান্না করে খাওয়াক না চম্পা। এখনি টেলিগ্রামটা করে' দে। আরজেন্ট টেলিগ্রাম করিস। আমার স্যুটকেসে টাকা আছে, তোর বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নে—"

"টাকা আছে আমার কাছে"

"তাহলে যা। একটা চিঠিও লিখে দিস"

"আচ্ছা—"

বৃহস্পতি ওরফে বিরুবাবু আহারাদির পর নিজের ঘরে ইজি-চেয়ারে বসিয়া ইজিপ্টের বইটিই পড়িতেছিলেন। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক তিনি, স্বল্পাহারীও। অনেকরকম রান্না হইয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি নিজে বেশী কিছু খান নাই। দুই আঙুলে করিয়া তুলিয়া তুলিয়া সব জিনিসই একটু আধটু চাখিয়াছিলেন। চাখিতে চাখিতেই তাঁহার পেট ভরিয়া গিয়াছে। ভাত যৎসামান্য খাইয়াছেন, ডালই একটু বেশী প্রিয় তাঁহার, প্রায় আধ বাটিটাক্ চুমুক দিয়া খাইয়াছেন সেটা। আপেল স্টাফিংটার তাঁহার মন্দ লাগে নাই। চম্পার রান্নার হাত আছে। চম্পার গানবাজনাও খুব ভালো লাগিয়াছে তাঁহার। কিন্তু মুখভাবে সেটা প্রকাশ করেন নাই। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মনে মনে উপভোগ করিয়াছেন তাহা। বাবা যে ইহাতে আনন্দ পাইয়াছেন ইহাতেই বেশী খুশী তিনি। কিন্তু এ

খুশীভাবটাও তিনি চাপিয়া রাখিয়াছেন, প্রকাশ করেন নাই, সাধারণত করেন না। এক-দুই-তিনকে কি গল্প বলিবেন তাহা তিনি ঠিক করিয়া ফেলিয়াছেন। ফারাও খুফুর পুত্র খুফুকে যে যাদুকরের গল্পটা বলিয়াছিলেন সেই গল্পটাই তিনি উহাদের শুনাইবেন। সেসকল তাহাদের ভালো লাগিবে। যাদুকর দেশী হাঁসের মুণ্ড কাটিয়া তাহা আবার জুড়িয়া দিয়াছিলেন।···সহসা অন্য একটা কথা মনে হওয়াতে তাঁহার ভ্রূকুঞ্চিত হইয়া গেল। তাঁহাদের বাড়ির কাছে একটা পীর-পাহাড় আছে। তাহার তলায় কোন ঐতিহাসিক-রহস্য আত্মগোপন করিয়া নাই তো! হারাপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো তো ওইরূপ পাহাড়ের মতোই ছিল। স্বর্গীয় রাখাল বাঁড়ুয্যে কল্পনার জোরে সেই সব পাহাড়ের তলায় অতীতের ইতিহাস দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই পাহাড়টা খুঁড়াইয়া দেখিলে ক্ষতি কি। তাহা কি সম্ভব? গভর্নমেণ্টকে বলিলে শুনিবে কি? শুনিবে না, পীরপাহাড়কে খুঁড়িতে সাহসই করিবে না। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গাই বাধিয়া যাইবে হয় তো। মনে পড়িল নকুলদা যখন এক স্টোন-কণ্ট্রাক্টার মাড়োয়ারির নিকট চাকুরি করিতেন তখন এই পাহাড়ের তলায় না কি কয়েক ঘড়া মোহার পাইয়াছিলেন। কাহাকেও সেকথা বলেন নাই অবশ্য, খুব চাপা প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু ওই পাহাড়-খোঁড়ার পর হইতেই তাঁহার অবস্থা ফিরিয়া যায়।···বৃহস্পতি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। পাহাড় খুঁড়িবার সময় দু'-একটা পাথরে কি যেন লেখাও ছিল, কারুকার্যও ছিল। ভাবিতে ভাবিতে অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। বাবার জন্য যে দুশ্চিন্তা তাঁহাকে পীড়িত করিতেছিল, সে দুশ্চিন্তার মেঘ আগেই কাটিয়া গিয়াছিল, তাই তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া নিজের খেয়ালে নিজের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ভাগ্যে কয়েকখানা বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম।

উষা নিজের ঘরে বিছানায় বসিয়া সদানন্দের পা টিপিয়া দিতেছিল। আহারাদির পর সদানন্দের দিবানিদ্রা দেওয়ার অভ্যাস আছে। নিদ্রার পূর্বে পা-টেপানোটাও তাঁহার একটা বদ-অভ্যাসের মধ্যে। পূর্বে চাকর দিয়া টিপাইতেন, কিন্তু এখন উষা নিজেই টিপিয়া দেয়। চাকরদের হাতের ছোঁয়াচে চর্ম-রোগ হইতে পারে এই ধারণা যেদিন হইতে তাহার মাথায় ঢুকিয়াছে সেদিন হইতে সে সদানন্দের পায়ে কোনও চাকরকে হাত দিতে দেয় না। এমন কি তাঁহার কাপড় চোপড়ও নিজেই কাচিয়া দেয়। প্রায় প্রকাশ্য-ভাবেই সে সদানন্দের সেবা করিতেছিল, ঘরের কপাটটা ভেজানো ছিল শুধু। স্বামীর পদ-সেবা করিতেছে তাহাতে লজ্জার কি আছে। সন্ধ্যাটারই বরং লজ্জা-সরম নাই, দুপুরে স্বামীকে লইয়া ঘরে খিল দিয়াছে। উষা পান চিবাইতেছিল, ঠোঁট দুটি লাল, মাথার চুল আলুলায়িত, একটা সুন্দর কেশ-তৈলের সৌরভে ঘরের বাতাস আমোদিত, চোখের দৃষ্টি আনন্দে সোহাগে টলমল করিতেছে। পা টিপিতে টিপিতে সে স্বামীকে ভর্ৎসনা করিতেছিল। ইদানীং কিছু-দিন হইতে সে স্বামীর সহিত যে আলাপই করুক না কেন, তাহাতে ভর্ৎসনার সুর ফুটিয়া ওঠে।

"তুমি এসে থেকে তো বাবার কাছে একবারও বসলে না। বাইরে বাইরে খালি বাজে গল্প করে' বেড়াচ্ছ। কাছে বসলে বাবা কত খুশী হ'ন। কি যে মুখ-চোরা স্বভাব তোমার—"

"কেষ্ট-দা'ও তো যান নি"

"কেষ্ট-দার কথা ছেড়ে দাও। বুনো লোক। জানোয়ারদের সঙ্গই ওঁর ভালো লাগে"

"রঙ্গনাথ গিয়েছিল কি—"

"গিয়েছিল একবার সকালের দিকে, তুমি তখন চান করছিলে। গিয়ে বসে' বাবার পায়ে হাত বুলিয়ে দিলে, এদিকে বেশ দোফাপা-দুরস্ত আছে তো। দাদার জামাইটিও বেশ হয়েছে।

ঘুরছে ফিরছে বাবার কাছে গিয়ে বসছে। তুমিই খালি এড়িয়ে চলছ—”

“গুরুজনদের সামনে গিয়ে কেমন যেন স্বস্তি পাই না। কি গল্প করব ওঁর সঙ্গে—”

“যে কোনও বিষয়ে গল্প করতে পার। বাবার সঙ্গে যে কোনও বিষয়ে গল্প করা যায়। সোমনাথ তার ওপরওলা কি এক সাহেবের সম্বন্ধে গল্প করছিল। রঙ্গনাথ গাছপালা নিয়ে কি সব বলছিল, কে একজন বুড়ো মুসলমান এসেছিল সে তো সমস্তক্ষণ আখ আর গুড়ের গল্পই করলে। বাবা সবার সঙ্গেই বেশ সায় দিয়ে দিয়ে গল্প করলেন—”

“আমি বাবার সঙ্গে কি নিয়ে গল্প করব তাতো মাথাতেই আসছে না”

“বই টই নিয়ে বলো না কিছু। বাবা এককালে খুব বই পড়তেন। বাংলা ভাষায় যত বই বেরুত সব বাবা কিনতেন, কি প্রকাণ্ড লাইব্রেরি ছিল আমাদের। এ গ্রামের সব বাঙালী আমাদের বাড়ি থেকে বই নিয়ে পড়ত। সেই জন্যেই সব হারিয়ে গেছে। যে বই নিয়ে যায় সে তো আর ফিরিয়ে দেয় না, সে পাট নেই কারও—”

সদানন্দের ঘুম আসিতেছিল।

জড়িতকণ্ঠে বলিলেন, “বেশ, সন্ধ্যের পর বসব গিয়ে—”

“আর দেখ, এক-দুই-তিনকে তুমি একটু শাসন কোরো। বড্ড বেড়েছে ওরা—”

“আচ্ছা”

“আর দেখ, আমাদের চাকরটাকে কিছু টাকা দিয়ে কাটিহারে পাঠিয়ে দিই, কি বল, কিছু তরকারি, ফল, চা কফি হরলিক্‌স্ কোকো এইসব কিনে আনুক। কুমার বেচারা একা আর কত সামলাবে। দাদা অবশ্য এসেই ওকে কিছু টাকা দিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরও তো কর্তব্য আছে—”

"বেশ—"

সদানন্দের নাকটা হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল।

উষা তাহার দিকে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া তাহার পর মৃদু হাসিল। দ্বিতীয়বার নাক ডাকিতে সে ধীরে ধীরে তাহার গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। উষা দিবা-নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছে, কে যেন তাহাকে বলিয়া দিয়াছে দিনে ঘুমাইলে আরও মোটা হইয়া যাইবে।

এক-দুই-তিনকে লইয়া স্বাতী পেয়ারা গাছগুলির তলায় তলায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। গাছ-পাকা পেয়ারার উপর তাহার খুব লোভ। কুমার—স্বাতী-সোমনাথের জন্য একটি আলাদা তাঁবুর ব্যবস্থা করিয়াছিল দক্ষিণ দিকের মাঠে। সোমনাথ আহারান্তে সেই তাঁবুর ভিতর ঢুকিয়াছিল। সে মনে মনে প্রত্যাশা করিয়াছিল স্বাতীও আসিবে। আসিলে তাহাকে বিলাতী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছবি দেখাইবে সে। পত্রিকাটি সে স্টেশন স্টলে কিনিয়াছিল কিন্তু ট্রেনের ভীড়ে স্বাতীকে দেখাইতে পারে নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিবার পরও যখন স্বাতী আসিল না তখন সোমনাথ তাঁবু হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অবশেষে পেয়ারা গাছগুলির নীচে আসিয়া পড়িল।

"এ কি, এতো খাওয়ার পর আবার পেয়ারা খাবে না কি"

স্বাতী আসল কথাটি চাপিয়া গেল। ইহাই তাহার স্বভাব।

"দাদুর জন্যে খুঁজছি। দাদু পেয়ারা খুব ভালোবাসেন তো—"

দুই বলিয়া উঠিল—"একটু আগে যে পেয়ারাটা পেলাম সেটা তো আমরাই খেলাম ভাগ করে'। দাদুর জন্যে রাখলে না তো—"

"ও পেয়ারা কি দাদুকে দেওয়া যায়। পাকেই নি—"

এক বলিল, "না জামাইবাবু, সুন্দর ছিল পেয়ারাটা—"

"চুপ কর ফাজিল কোথাকার"—ধমকাইয়া উঠিল স্বাতী। তাহার পর ঘাড় বাঁকাইয়া মুচকি হাসিয়া সোমনাথকে বলিল—"ওই অনেক উঁচুতে চমৎকার পেয়ারা রয়েছে। পেড়ে দেবে ?"

প্রায় মগডালের কাছাকাছি একটা বড় পাকা পেয়ারা ছিল। সোমনাথ মালকোঁচা মারিয়া গাছে উঠিবার আয়োজন করিতে লাগিল। তরুণী স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করা যায় না।

কিরণও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াই কৃষ্ণকান্তকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহারও উদ্দেশ্য ছিল স্বামীকে ভর্ৎসনা করিয়া কিছু নীতি-উপদেশ দেওয়া! কিন্তু কৃষ্ণকান্তকে সে ধরিতেই পারিল না! কৃষ্ণকান্ত আহার শেষ করিয়াই নিজের বন্দুকটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোথা গিয়াছেন, কেহই বলিতে পারিল না। বন্দুকের খালি বাক্সটার দিকে চাহিয়া কিরণ খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর চিঠি লিখিতে বসিল। চিঠি লিখিল পুত্র ঘণ্টুকে।

"বাবা ঘণ্টু, তোমার দাদু অনেকটা ভালো আছেন। বিপদটা আপাতত কেটে গেছে মনে হচ্ছে। খবর পেয়ে সবাই এসেছে। বাড়ি এখন জমজমাট। ঊষা তার তিন ছেলে নিয়ে এসেছে। দাদার ছেলে-মেয়েরা এসেছে সবাই, গগনের বউদি তো এসেছেনই। সন্ধ্যা-রঙ্গনাথও এসেছে। সোমনাথ-স্বাতীও। সেজদাও সপরিবারে আসছেন, খবর এসেছে আজ। এ সময় তুমি না থাকাতে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি যেমন করে' পার ছুটি নিয়ে চলে' এস। সবাই নিজের নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এসেছে, আমার ছেলেটিই আমার কাছে নেই, একি ভালো লাগে কখনও? তুমি আমার চিঠি পাওয়া মাত্র ছুটির দরখাস্ত কোরো, যদি ইতিমধ্যে

না করে' থাকো। দরখাস্তে লিখে দিও না হয়—মায়ের খুব অসুখ করেছে—"

এই একটি কথাই সে নানা সুরে লিখিতে লাগিল।

পার্বতী পুরসুন্দরীকে লইয়া পড়িয়াছিল।

"নিয়ে আসি না একটু তেল। তুমি আপত্তি করছ কেন"

"না এখন তেল মাখাতে হবে না আমার পায়ে। বিছানার চাদরটা তেলে মাখামাখি হয়ে যাবে, আজই বার করেছি ওটা"

"হলেই বা, আরও তো চাদর আছে—"

"তুই গড়িয়ে নে না একটু, আমাকে নিয়ে পড়লি কেন—"

"ঘোরাঘুরি তোমার কম হচ্ছে না। হাঁটুর ব্যথাটি যদি বাড়ে তখন আমাকেই ভুগতে হবে যে। আমি উনুনে তেলের বাটিটা চড়িয়ে এসেছি, নিয়ে আসি"

পার্বতী দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

পুরসুন্দরী অর্ধ-স্ফুট-কণ্ঠে বলিলেন, "জ্বালিয়ে খেলে মেয়েটা—"

বৃহস্পতি কোণের দিকে একটা ইজি চেয়ারে বসিয়া পড়িতেছিলেন। বই হইতে মুখ না তুলিয়াই তিনি বলিলেন, "দিক না একটু তেল মালিশ করে'। ঠিকই তো বলছে ও, হাঁটুর ব্যথাটা বাড়লে মুশকিল হবে"—

পুরসুন্দরী বাদ-প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, অপ্রসন্নমুখে পাশ ফিরিয়া নীরবে শুইয়া রহিলেন।

টেলিগ্রাম করিবার জন্য দিগন্তর সহিত সন্ধ্যাও পোস্টাফিসে গিয়াছিল। উষা ঠিক খবরটি জানিত না। সন্ধ্যা রঙ্গনাথের সহিত নিজের ঘরে গিয়া খিল দিয়াছিল এইটুকুই উষা দেখিয়াছিল, কিন্তু একটু পরেই যে সন্ধ্যা অন্য দরজাটি দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল তাহা উষা দেখে নাই। সন্ধ্যার দিনের বেলা ঘুম আসে না।

দিনের বেলা সে পড়া-শোনা করে। কিন্তু রঙ্গনাথের দিনের বেলা না ঘুমাইলে চলে না। তাহার আর একটি বদ-অভ্যাস আছে। সন্ধ্যা পাশে না শুইলে তাহার ঘুমই আসে না। রঙ্গনাথ ঘুমাইয়া পড়িতেই সন্ধ্যা নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইল—দিগন্ত কোথা যেন যাইতেছে।

"কোথা যাচ্ছিস এ সময়ে—"

পোস্টাফিসে টেলিগ্রাফ করতে। দাদা বললে পাকপ্রণালী চাই দু'তিন রকম। আমার এক বন্ধুকে টেলিগ্রাম করে' দি, সে খুঁজে কিনে পাঠিয়ে দেবে—"

"পাক-প্রণালী? কি হবে?"

"দাদা বলছে দাছুকে নতুন নতুন তরকারি রান্না করে' খাওয়াবে রোজ।"

"আইডিয়াটা চমৎকার, না?"

কপাল হইতে চুলের গোছা সরাইয়া দিগন্ত সন্ধ্যার মুখের দিকে চাহিল। সন্ধ্যা দেখিল তাহার চোখের দৃষ্টি দাদার নূতন আইডিয়ার কিরণে ঝলমল করিতেছে। তাহার হঠাৎ খুব ভালো লাগিয়া গেল দিগন্তকে। নূতন আলোকে তাহাকে যেন দেখিতে পাইল।

"চল আমিও তোর সঙ্গে যাই, গ্রামের ভিতর যাইনি অনেক দিন। সেই ছেলেবেলায় যেতুম"

"চল"

পোস্টাফিসের কাছাকাছি আসিয়া সন্ধ্যা বলিল, "তুই টেলিগ্রাম কর, ততক্ষণ আমি কাশী সিংয়ের বাড়িটা ঘুরে আসি। ওরা কেউ আছে কিনা কে জানে—"

পোস্টাফিসের পিছনেই কাশী সিংয়ের বাড়ি। কাশী সিং এককালে এখানকার থানার হাবিলদার ছিল। আদি বাড়ি তাহার মুঙ্গের জেলায়। এইখানেই পুলিসের চাকরি হইতে অবসর গ্রহণ করে। সেই সময় সূর্যসুন্দর চেষ্টা করিয়া তাহাকে স্থানীয়

জমিদারে কাছারিতে উচ্চ-শ্রেণীর সিপাহীর পদে বহাল করাইয়া দিয়াছিলেন। জমিদারই তাহাকে গ্রামের মধ্যে কিছু জমি দান করেন। সেই জমির উপর কাশী সিং বাড়ি করিয়াছিলেন। সেই হইতেই কাশী সিংয়ের সহিত সূর্যসুন্দর পরিবারের হৃদ্যতা। কাশী সিংয়ের বউ প্রায়ই নানা রকম খাবার ঘরে প্রস্তুত করিয়া সূর্যসুন্দরের ছেলে-মেয়েদের জন্য লইয়া যাইত। চিঁড়া বা মুড়ির মোয়া, ঠেকুয়া, খাবুনি, ব্যাসনের সন্দেশ, ভাল-মাড়া প্রভৃতি একদিন উষা ও সন্ধ্যার হৃদয় হরণ করিয়াছিল। কাশী সিংয়েরও দুটি মেয়ে ছিল, বুধিয়া আর সীতিয়া। উষা আর সন্ধ্যার খেলার সঙ্গী ছিল তাহারা। কাশী সিং বহুদিন পূর্বেই মারা গিয়াছেন। কাশী সিংয়ের স্ত্রী বাঁচিয়া আছে এখনও।

সন্ধ্যা তাহার কাছে গিয়াই উপস্থিত হইল।

"চাচী চিনতে পার আমাকে—"

চাচী উঠানে নামিয়া আসিল এবং মুখ তুলিয়া কপালে বাঁ হাতটা রাখিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সন্ধ্যাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা দেখিল চাচীর চুলগুলি সব পাকিয়া গিয়াছে। দৃষ্টিশক্তিও ক্ষীণ। চাচীর শিরাবহুল জরা-কুঞ্চিত কপালের চামড়াটা আরও কুঞ্চিত হইয়া গেল। চাচী সন্ধ্যাকে চিনিতে পারিল না।

"চিনতে পারলে না তো, আমি সন্ধ্যা"—

চাচী বাঙালীদের সঙ্গে আধা-বাঙ্‌লা আধা-হিন্দীতে কথা বলে।

"আরে সন্ঝা-মাই। আমি শুনেছি তোরা এসেছিস। যেতে পারি নি, আঁখে আর ভালো সুঝে না। সীতিয়াকে রোজ যেতে বলি, সে-ও পারে না, তার কোমরে দরদ—

"সীতিয়া আছে না কি এখানে—"

"আছে। শুয়ে আছে ঘরে। এ সীতিয়া—দেখি দেখি কে আয়ল বা—"

সীতিয়া বাহির হইয়া আসিল কোমরে হাত দিয়া খোঁড়াইতে

খোঁড়াইতে, মুখে এক মুখ হাসি। সীতিয়াকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল সন্ধ্যা। এ কি চেহারা সীতিয়ার। এত মোটা হইয়াছে। সীতিয়া কথা বলিল পরিষ্কার বাংলাতে।

"কাকাবাবুর অসুখ করেছে, তোরা এসেছিস, সব আমি জানি, কিন্তু কি করব, চলতে পারছি না কোমরে এত ব্যথা"

"কি হয়েছে কোমরে"

"বাত"

"এত অল্প বয়সে বাত! ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

"দেখিয়েছি। হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবু একটা মালিসের ওষুধও দিয়েছেন। লাগাচ্ছি তো, কিন্তু কমছে না"

"তুই গগনকে দেখা। আমি ওকে পাঠিয়ে দিচ্ছি—"

"গগন কে"

"দাদার বড় ছেলে। সে ডাক্তার হয়েছে যে, শুনিস নি?"

এই সংবাদে কাশী সিংয়ের স্ত্রীর মিশি মাখানো দাঁতগুলি আনন্দে বাহির হইয়া পড়িল।

"খোঁকাবাবু ডাক্‌টর বন্ গৈশন! শিউজি বাঁচিয়ে রাখুন তাকে।"

পাঁচ ছয় বৎসরের একটি উলঙ্গ বালক লাফাইতে লাফাইতে বাহির হইতে ভিতরে ঢুকিল। তাহার প্রকাণ্ড টিকি, নাক-বোঝাই সর্দি। গায়ে একটা নীল সোয়েটার রহিয়াছে বটে, কিন্তু বাকী সমস্তটা উলঙ্গ। কোমরে একটা লাল ধুনসি, তাহাতে ছোট্ট একটা বুটিয়া ঝুলিতেছে।

"শিউযতন, গোড় লাগ। মৌসি—"

"তোর ছেলে?"

সীতিয়া হাসি মুখে ঘাড় নাড়িল।

"বড় দুষ্টু, দিন রাত রাস্তায় খেলছে"

শিউযতন কোন রকমে প্রণামটা সারিয়া আবার লাফাইতে লাফাইতে রাস্তায় বাহির হইয়া গেল।

"আয় ঘরে বসবি আয়—"

সন্ধ্যা অনুভব করিল, সীতিয়া আর বেশীক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না। তাহার সঙ্গে ঘরের ভিতরই ঢুকিল। গিয়া দেখিল সেখানেও একটি তিন চার মাসের ছেলে নিজের হাতের মুঠা দুইটি দেখিয়া দেখিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া খেলা করিতেছে। চমৎকার স্বাস্থ্যবান শিশু। তাহার গায়ে ফুলদার রঙীন রেজাই ঢাকা, মাথায় লাল টুপি। ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে কি করিয়া রেজাইটা লাথি মারিয়া সরাইয়া দিবে। চোখের কাজল সারা মুখে মাখিয়াছে। সন্ধ্যা নিজে যদিও নিঃসন্তান, কিন্তু শিশুদের সম্বন্ধে অনেক পড়াশোনা করিয়াছে সে। তাহার মনে হইল সীতিয়াকে এ বিষয়ে জ্ঞানদান করা তাহার কর্তব্য। সে বিছানার একধারে বাগাইয়া বসিল। চাচীও কয়েকটি লাড়ু লইয়া প্রবেশ করিল।

"খা—"

লাড়ুগুলি দিয়াই চলিয়া গেল চাচী। বারান্দায় গিয়া 'বরশী' হইতে আগুন লইয়া তামাক সাজিতে বসিল। চাচী তামাক খায়।

ছেলেবেলায় লাড়ু পাইলে সন্ধ্যা উল্লসিত হইয়া উঠিত, এখন ততটা হইল না। সে কিন্তু মুগ্ধ হইয়া গেল চাচী যে পাত্রটিতে লাড়ু আনিয়াছিল সেই পাত্রটি দেখিয়া! প্লেটের মতো, কিন্তু কাচের বা চীনেমাটির নয়, বেতের। তাহাতে নানা রকম রংও রহিয়াছে, চমৎকার দেখিতে। গৃহ-শিল্প সম্বন্ধেও অনেক পোড়াশোনা করিয়াছে সে। অনেক ভাবিয়াছেও।

সীতিয়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "এটা কোথা থেকে কিনেছিস্? বেশ"

"ভিখ্নার বউ তৈর করে' বিক্রি করে'

"কোথা থাকে সে"

"কাজি গাঁয়ে। তুই নিবি? এইটেই নিয়ে যা না"

"দে—"

বাল্যসঙ্গিনীর নিকট হইতে এই সামান্য উপহার পাইয়া সন্ধ্যা সহসা যেন অভিভূত হইয়া পড়িল।

"আমি কিন্তু ভিখ্‌নার বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই"

"আচ্ছা, খবর পাঠিয়ে দেব তাকে"

সন্ধ্যা নিমেষের মধ্যে ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিল কি করিবে। ভিখনার বউ বেতের বাসন তৈয়ারি করিতেছে, এই অবস্থায় তাহার একটি ফোটো তুলিবে সে। বাসন-গুলির ফোটো তুলিবে, দৃষদ্বতীতে এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধও লিখবে। তাহার পর সে নিজের গলা হইতে সোনার সরু হারটা খুলিয়া সীতিয়ার ছেলের গলায় পরাইয়া দিল।

"ওকি করলি"

"দিলুম তোর ছেলেকে। তোর বড় ছেলেকে একটা ফুল প্যাণ্টও করিয়ে দেব আমি। রমজানিয়া এসে মাপ নিয়ে যাবে—

সীতিয়া হাসিয়া বলিল, "রমজানিয়া অনেকদিন হ'ল মারা গেছে। তার ছেলে গোহর এখন দর্জির কাজ করে—"

"রমজানিয়া মারা গেছে? বেশ, গোহরকেই পাঠাব তাহলে—। বুধিয়ার খবর কি"

"বুধিয়া শ্বশুর বাড়িতে আছে"

"ভাল আছে বেশ?"

"খুব ভালো নেই। তার স্বামীটা বড় মারমুণ্ডা। তোর ছেলেমেয়ে কি"

"আমার এখনও হয় নি ভাই"

"কেন?"

"এমনি"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আমি পড়াশোনা নিয়ে থাকি। সমাজের নানারকম কাজকর্ম করারও ইচ্ছে আছে। কোলে কাঁখে ছেলেমেয়ে থকেলে ওসব হ'ত না"

"তা বটে। আমার মাত্র দুটো ছেলে, তাতেই পাগল করে' দিয়েছে আমাকে। কিন্তু ছেলে হওয়া বন্ধ করেছিস কি করে'। কোন ওষুধ খেয়েছিস?"

"না"

সন্ধ্যা জন্ম-নিরোধ সম্বন্ধেও প্রচুর পড়াশোনা করিয়াছে। স্থির করিল এ বিষয়েও পরে সে সীতিয়ার সহিত আলোচনা করিবে।

"লাড়ু খাচ্ছিস না যে—"

অনেক বেলায় খেয়েছি। সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে খাব—"

বারান্দায় চাচীর হুঁকার শব্দ শোনা গেল।

মিস অনুপমা বসুও নিজের কর্তব্য সমাপনান্তে নদীর ধারে গিয়া একটি বিস্তৃত পাথরের উপর বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। তাহার দৈনন্দিন কর্তব্য চম্পার মাকে চম্পার রিপোর্ট প্রত্যহ পাঠানো। ইউরিন কেমন, ব্লাডপ্রেসার কত, খাওয়ায় রুচি আছে কিনা, ভিটামিনগুলি প্রত্যহ খাইতেছে কিনা, এসব খবর প্রত্যহ না পাইলে চম্পার মা অনর্থ করিবেন, হয়তো চলিয়া আসিবেন। তাই এগুলি সে সযত্নে প্রত্যহ পাঠাইতেছে। গঙ্গার জলস্রোতের দিকে চাহিয়া তাহার হাবুলের কথা মনে পড়িতেছিল। গঙ্গার তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া বাবুলের চঞ্চল স্বভাবের কথাই মনে হইতেছিল তাহার। সে এখন কেমন আছে কে জানে। ভালই আছে সন্দেহ নাই, না থাকিলে খবর পাইত। তাহার বাবা নিশ্চয়ই খবর দিতেন।

তাহারই ছেলে বাবুল। কিন্তু যেহেতু বাবুলের বাবার সহিত তাহার সমাজিক আনুষ্ঠানিক বিবাহ হয় নাই তাই প্রকাশ্যভাবে সে নিজের মাতৃত্ব ঘোষণা করিতে পারে না। অনুপমার বাবা শঙ্কর-প্রসাদ নিষ্ঠাবান নীতিবাগীশ অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিবার জন্য কলেজে পাঠাইয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ে থাকিত।

সে লেখাপড়া ভালই শিখিয়াছিল, কিন্তু সে ডিগ্রীর সহিত একটি প্রণয়ীও জুটাইয়া আনিল। সুপর্ণ সিংহ নামটাই অনুপমার চিত্তকে প্রথমে আকর্ষণ করে। একটি নামের মধ্যে পক্ষীরাজ এবং পশুরাজের এমন সমন্বয় দুর্লভ বলিয়া মনে হইয়াছিল তাহার। লোকটির সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল জাগিল। প্রথমে দেখা হইয়াছিল কলেজেরই কমন রুমে। তখন বয়সটাই এমন যে সব কিছুই ভালো লাগে। দোকানে টাঙানো ছিট হইতে শুরু করিয়া বিশেষ ধরনের পশু-পাখী ফড়িং ফুল লতা-পাতা সব কিছুই মনকে মুগ্ধ করে। এক বন্য-বিধ্বস্ত অঞ্চলের জন্য কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিতে কলেজে আসিয়াছিলেন সিংহ মহাশয়। আলাপ করিয়া অনুপমা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমনি কথাবার্তা, সমাজ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিলাতী ডিগ্রী আছে। সমাজেরই সেবা করেন। নামটিও চমৎকার। যথাসময়ে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইয়াছিল। পিতা শঙ্করপ্রসাদ এসব কিছুই জানিতেন না। বাবুল যখন পেটে আসিল তখন অনু তাঁহাকে সব কথা জানাইতে বাধ্য হইল, কারণ নামের মর্যাদা রক্ষা করিয়া সুপর্ণ উড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে খবর পাওয়া গিয়াছিল তিনি নাকি একটি ধনী-কন্যার পাণি-পীড়ন করিতে উৎসুক হইয়া তাহারই পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। ধনী-কন্যাটি পিতার বিশাল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। তাহাকে গাঁথিতে পারিলে তাঁহার জীবন-স্বপ্ন (অর্থাৎ সমাজ-সেবা) সফল হইবে। কারণ সমাজ সেবা করিতে হইলে প্রচুর টাকা চাই। অনুপমা তাহাকে চিঠির পর চিঠি লিখিয়াও জবাব পায় নাই, কয়েকবার চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। কারণ সুপর্ণ সেই মেয়েটির পিছু পিছু কখনও বম্বাই, কখনও মসৌরি, কখনও রামগড়, কখনও বা কালিম্পং ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা অসম্ভব। ইদানীং ঠিকানাও পায় নাই।

শঙ্করপ্রসাদ অনুকে ভর্ৎসনা করেন নাই, বাড়ি হইতে দূর করিয়া দিয়া কোনও নাটকীয় কাণ্ডও করেন নাই। তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন—"তুমি লেখাপড়া শেখেছ। সব জেনে শুনে যে দায়িত্ব তুমি গ্রহণ করেছ, তার ভার তোমাকে বইতে হবে। সামাজিক লাঞ্ছনা আজকাল আর হয় না, তবে লোক-লজ্জা বলে' একটা জিনিস আছে এখনও। অমি যতদূর সাধ্য তোমাকে তার থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করব।" অনুপমার মাথায় সিঁদুর পরাইয়া তিনি তাহাকে ব্যাঙ্গালোরে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানকার হাসপাতালেই বাবুলের জন্ম হয়। বাবুল একটু বড় হইবার পর সে তাহাকে বাবার কাছে রাখিয়া ব্যাঙ্গালোর হাসপাতালেই নার্সের কাজ শেখে। তাহার পর সেখান হইতে মাদ্রাজে যায়। মাদ্রাজের এক মিশনরি সাহেবের সাহায্যে সে বিলাত পর্যন্ত যাইতে সমর্থ হইয়াছিল। নার্সিং এবং ছেলে-প্রসব-করানো বেশ ভালভাবেই শিক্ষা করিয়াছে। ভালই রোজকার হয়। বাবাকে কোন কোন মাসে দুইশত টাকা পর্যন্ত পাঠাইতে পারে। শঙ্করপ্রসাদ সমস্ত টাকা বাবুলের নামে ব্যাঙ্কে জমা করেন।...নদীর স্রোতের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুর মনে হইল, এখনও সে সুপর্ণ সিংহকে ভালবাসে। আগেও একথা মনে হইয়াছে। আবার হইল।

সূর্যসুন্দর নিমীলিত-নয়নে শুইয়া আবার সেই দিবাস্বপ্নটি দেখিতেছিলেন। নির্জন প্রান্তরের ভিতর দিয়া দিগন্ত-বিস্তারী পথ চলিয়া গিয়াছে। সেই পথে তিনি একা যাত্রী। তিনি যেন পশ্চিম দিগন্তের দিকে চলিয়াছেন। কেন চলিয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। সূর্য অস্ত গিয়াছে। পশ্চিম আকাশ বর্ণ-বিচিত্র। সেই বর্ণ-বিচিত্র ভেদ করিয়া কে যেন তাঁহার দিকে আসিতেছে। অনিবার্য অক্লান্ত গতিতে আসিতেছে। কিন্তু কে, ওকে—

"কে, ওকে—"

তন্দ্রার ঘোরে সূর্যসুন্দর কথা কহিয়া উঠিলেন।

"বাবা কিছু বলছেন ?"

উর্মিলা মাথার শিয়রে বসিয়াছিল, ঝুঁকিয়া প্রশ্ন করিল।

সূর্যসুন্দরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি চোখ খুলিয়া প্রথমে নেটের মশারিটা দেখিতে পাইলেন, তাহার পর উর্মিলার মুখটা। বুঝিতে পারিলেন, তিনি পথ চলিতেছেন না, বিছানাতেই শুইয়া আছেন। তাঁহার পুরাতন খাটের উপরই শুইয়া আছেন, তাঁহার পুরাতন শয়ন-গৃহে। মনে পড়িল এ রকম স্বপ্ন আর একবার দেখিয়াছিলেন।

"বাবা, কিছু বলছেন ?"

"না। কুমার কোথা"

"তিনি বাগানে গেছেন, পাখীর মাংস রান্না করছেন সেখানে"

"ও"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন।

একটু পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিলেন চন্দ্রসুন্দর। উর্মিলাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "সন্ধ্যের পর এই-খানে বসে' গীতা পড়ব। তুমি মা মেজেটা গঙ্গাজল দিয়ে একটু নিকিয়ে দিও, কেমন ? মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুনের রান্না এই-খানটায় বসে' খেয়েছ তো তোমরা, তার উপর বসে গীতা পড়াটা কি ঠিক হবে—"

ঠিক হইবে কি না এ প্রশ্নের উত্তর উর্মিলা দিল না।

কেবল বলিল, "আমি গঙ্গাজল দিয়ে এখুনি ধুয়ে দিচ্ছি মেজেটা"

কুমারের বাগানের ঘরটিতে মাংস চড়াইয়াছিল।

ঘরের বাহিরে ঘোর অন্ধকার। ঘোর শীতও। নানাস্বরে নানা-রকম নৈশ কীট পতঙ্গ চিৎকার করিতেছে, একটা পেচকের কর্কশ কণ্ঠও শুনা যাইতেছে মাঝে মাঝে। ঘরের ভিতর কয়লার উনুনের উপর প্রকাণ্ড মাংসের ডেক্‌চিতে মাংস ফুটিতেছে, মশলাভাজার গন্ধে চতুর্দিক আমোদিত। ল্যাংড়া চাকরটা ঘরের এককোণে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া বসিয়া আছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা বস্তা বুঝি কোণে ঠেসানো আছে। ইহারা মশারিতে অভ্যস্ত নহে, আপাদমস্তক চাদর ঢাকা দিয়া মশা হইতে আত্মরক্ষা করে, দম বন্ধ হয় না। মশা বেশি নাইও, কারণ কুমার চতুর্দিকে ফ্লিট্‌ ছিটাইয়াছিল। কুমারের পায়ের কাছে ছুঁচ্‌কি সামনের থাবার উপর মুখটি রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মাঝে মাঝে কুমারের মুখের দিকে চাহিতেছিল, মাঝে মাঝে কান খাড়া করিতেছিল, কিন্তু কোন শব্দ করিতেছিল না। ল্যাং-ল্যাং ঘুমাইতেছিল। ঘরের একধারে পেট্রো-ম্যাক্স জ্বলিতেছে। কুমার তাহার কাছেই একটি ক্যাম্প-চেয়ারে বসিয়া বাবার 'স্মৃতিকথা'য় মন দিয়াছে। তাহার পাশেই রহিয়াছে একটি গুলিভরা বন্দুক। গোটাদুই বড় বড় ব্যাঙ্‌ আসিয়া জুটিয়াছে, লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা ধরিয়া খাইতেছে। অনেক দূরে কোথায় যেন মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ শুনা যাইতেছে। থানার বর্তমান দারোগা সাহেব মাঝে-মাঝে কারণে-অকারণে বন্দুক-আওয়াজ করেন। তিনি বলেন—ঘরে আলো জ্বালিয়া রাখিবে এবং মাঝে মাঝে বন্দুক আওয়াজ করিবে। যাহার বন্দুক নাই সে শাঁখ বাজাইতে পারে, যাহার শাঁখ নাই সে গলা-খাঁকারি

দিক। তাই কুমারের মনে হইল দারোগা সাহেবই বোধহয় বন্দুক আওয়াজ করিতেছেন। কুমারের এসব দিকে কিন্তু ততটা মন ছিল না, সে নিবিষ্ট চিত্তে বাবার বাল্যজীবন কাহিনী পড়িতেছিল।

"যথা সময়ে আমি দীনু পণ্ডিতের পাঠশালায় ভরতি হইয়া গেলাম। ভরতির দিন দিদিমার আদেশে বাড়ির ক্ষ্যান্ত ঝি চাল ডাল তরিতরকারি ফল-মূল দিয়া সাজাইয়া একটি সিধা দীনু পণ্ডিতকে দিয়া আসিয়াছিল। সিধার সহিত একখানি নরুন-পাড় ধুতি এবং একটি লাল গামছাও ছিল। বলা বাহুল্য, ইহাতে দীনু পণ্ডিত খুবই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। দিদিমা মাঝে মাঝে দীনু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ খাওয়াইতেন। এই সব কারণেই সম্ভবত দীনু পণ্ডিত আমার উপর একটু প্রসন্ন ছিলেন। পাঠশালায় প্রথম দিন গিয়াই অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলাম। গিয়া দেখি নবীন চৌদ্দ-পোয়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুই বিস্তৃত হাতের উপর দুইখানি ইঁট। চৌদ্দ-পোয়া শাস্তিতে পা ফাঁক করিয়া দাঁড়াইত, দুই পায়ের মাঝখানে চৌদ্দ-পোয়া অর্থাৎ সাড়ে তিন হাত ব্যবধান থাকিত। নবীনের অবস্থা দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু দিদিমার কৌশলে আমি দীনু পণ্ডিতের কোপ-কবল হইতে কিছুটা রক্ষা পাইয়াছিলাম। আমি অবশ্য খুব নিরীহ ছেলে ছিলাম, পণ্ডিত মহাশয়ের ক্রোধাগ্নি জ্বালাইবার মতো ইন্ধন আমার ছিল না। সে ইন্ধন ছিল মন্মথর। বদমায়েসিতে তাহার জোড়া আমি হইতে পারি নাই, যদিও তাহার সহিত আমার বন্ধুত্ব খুব হইয়াছিল। মন্মথ পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে প্রায়ই শাস্তি পাইত। প্রায়ই তাহাকে 'ঘুঘু-ঘোড়া' হইয়া বসিতে হইত। মন্মথও প্রতিশোধ লইতে ছাড়িত না। সুযোগ পাইলেই অন্ধকারে পণ্ডিত মহাশয়ের বাসায় ঢিল ফেলিত। গোলক পণ্ডিতের নিকট আমি কিছু শিক্ষা করিয়া

আসিয়াছিলাম। শিশুবোধক, ধারাপাত শেষ হইয়াছিল। হাতের লেখাও অনেকটা মক্‌সো করিয়াছিলাম। কিন্তু দীনু পণ্ডিত গোড়া হইতে আবার সব শুরু করিলেন। দিদিমাকে গিয়া বলিলেন—"মা, ভাগ্যে আপনার নাতিটিকে এখানে এনেছিলেন। ওই অজ পাড়া-গাঁয়ে গোলক পণ্ডিতের কাছে থাকলে হয়েছিল আর কি। ও তো একটি গবাকান্ত হয়েছে।" দিদিমা বুদ্ধিমতী ছিলেন, গোলক পণ্ডিতের কাছে আমি কতটা বিদ্যার্জন করিয়াছি তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু তিনি দীনু পণ্ডিতের কথার প্রতিবাদ করিলেন না। বলিলেন, "এখন তোমার কাছে এনে দিয়েছি বাবা—তুমিই ওর ভার নাও, ওকে মানুষ করে তোল।" দীনু পণ্ডিত সাহ্লাদে বলিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, করব বই কি। গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করাই তো আমার কাজ। ওই যে রামবাবুর ছেলে ঘেঁাতা, যেমন বোকা তেমনি পাজি ছিল। কারো গাছে ফল থাকবার যো ছিল না ওর জ্বালায়। আম জাম পেয়ারা কুল প্রত্যেটি গাছ মুড়িয়ে খেত ছোকরা, আর বাকী সময়টা ছিপ নিয়ে বসে থাকত গঙ্গার ধারে। রামবাবু ওরে একদিন ধরে' এনে আমার হাতে সমর্পণ করে' দিলেন। ওকে নিয়ে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঢিট্ করেছিলাম। এখন রেলে টালি ক্লার্ক হয়েছে জানেন বোধ হয়।" দিদিমা বলিলেন, "হ্যাঁ, তোমার নাম ডাক তো খুব। সুযি্যর ভারটিও তুমি নাও বাবা। ওর মায়ের ওই একমাত্র ভরসা। বাপ তো থেকেও নেই—"

দিদিমার কণ্ঠস্বর সজল হইয়া আসিয়াছিল। দীনু পণ্ডিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে আমার ভার তিনি বহন করিবেন। সে প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করিয়াছিলেন। প্রবল প্রতাপে তিনি তো আমাকে শাসন করিতেনই—অবশ্য খুব একটা মারধোর করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে না—আমার হাতের লেখা অঙ্ক এবং ভাষা জ্ঞানও যাহাতে অনিন্দনীয় হয় সে বিষয়েও তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

পাঠশালাতেই আমি ধারাপাত, শুভঙ্করী এবং লোহারামের ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়াছিলাম।

এতদিন পরে আমার সেই পাঠশালার জীবনের কথা ভাবিতে গিয়া দুই তিনটি বন্ধুর কথাই কেবল মনে পড়িতেছে। মন্মথ, খোঁড়া অশ্বিনী এবং দিবাকরের কথা। ইহাদের প্রত্যেকেরই কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল এবং প্রত্যেকেই আমার পরবর্তী জীবনকেও কম প্রভাবিত করে নাই। মন্মথ ছিল বেশ মিশুক এবং সরল। চমৎকার গান গাহিতে পারিত। অভিনয়েও দক্ষতা ছিল। তখনকার দিনে যে সব যাত্রা হইত মন্মথ ছিল সে সবের উৎসাহী দর্শক। মামার এবং দিদিমার কড়া শাসনে আমার ভাগ্যে প্রায়ই যাত্রা দেখা ঘটিয়া উঠিত না। আমি যাত্রা-দেখার আনন্দটা উপভোগ করিতাম মন্মথর সহায়তায়। সে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যাত্রার গান বক্তৃতা আমাদের শুনাইত। তাহার গানের গলা অসাধারণ ছিল, যেমন চড়া, তেমনি মিষ্ট। বক্তৃতাও খুব ভালো করিত। তাহার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহই তাহাদের বাড়ি যাইতাম। মন্মথর মা শুভঙ্করী দেবী সত্যই একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করিতেন। বৈকালে যেদিন তাঁহার বাড়িতে না যাইতাম তিনি চিন্তিত হইয়া পড়িতেন, চাকর পাঠাইতেন আমার খবর লইবার জন্য। চাকরের সঙ্গে আবার আমাকে যাইতে হইত। গিয়া দেখিতাম আমার জন্য খাবার ঢাকা-দেওয়া রহিয়াছে। সেটি সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়া, তাহার পর চাকর সঙ্গে দিয়া আমাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিতেন। দিদিমার খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন তিনি। ইহার সুত্রপাত হয় আমার সাহেবগঞ্জে আসিবার কিছুদিন পরেই। কথায় কথায় একদিন বাহির হইয়া পড়ে তাঁহার বাপের বাড়ি একই গ্রামে। আমার মা যে স্বামী-পরীত্যক্তা ভাগ্যহীনা এবং আমি যে পিতৃহীন অনাথেরই মতো—একথা প্রায়ই আলোচনা করিতেন তাঁহারা। সম্ভবত এই সব কারণে এবং দিদিমার ইঙ্গিতে তিনি আমার

বৈকালিক আহারের ব্যবস্থাটা করিয়াছিলেন। মামার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া খুবই সাধারণ-রকমের ছিল। সকালে ব্যবস্থা ছিল মুড়ি কিম্বা বাসী রুটি এবং পাতলা গুড়। পাঠশালায় যাইবার সময় ভাত, কলাইয়ের ডাল এবং বাসী অম্বল ছাড়া আর কিছু থাকিত না। মাঝে মাঝে আলু ভাতে থাকিত। পাঠশালা যাইবার সময় তরকারি বা মাছ খাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। পাঠশালা হইতে ফিরিয়া ঠাণ্ডা তরকারি (ক্বচিৎ কোনদিন মাছ) দিয়া ঠাণ্ডা ডাল-ভাতই ছিল বরাদ্দ। আমি মন্মথর বাড়ি হইতে প্রত্যহই কিছু ভালোমন্দ খাবার খাইয়া আসিতাম ; কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন সন্দেশ, কোনদিন দুধের সর বা চাঁচি, যেদিন লুচি পরোটা থাকিত সেদিন তো হাতে স্বর্গ পাইতাম। মন্মথর বাড়ি হইতে ফিরিয়া মামার বাড়ির বরাদ্দ ডাল-ভাত-তরকারি এবং দিদিমার প্রসাদ খাইতাম। খাইবার খুব যে একটা ইচ্ছা থাকিত তাহা নয়, কিন্তু দিদিমার জেদে খাইতে হইত, মামীমা পাছে কিছু মনে করেন এ ভয়ও ছিল। সংসারে মামীমার আধিপত্য ক্রমশ বাড়িতেছিল, মা ক্রমশ যেন নিজেকে সংসার হইতে সরাইয়া লইতেছিলেন। তিনি যে বাড়িতে আছেন তাহা বোঝাই যাইত না। কখন খাইতেন, কখন শুইতেন, কিছুই টের পাইতাম না। কখনও তাঁহাকে বসিয়া গল্প করিতে দেখি নাই। সর্বদাই নীরবে কাজ করিতেন। কাজই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল। কুটনো-কোটা, বাটনা-বাটা রান্না করা সবই তিনি একা করিতেন। ক্ষ্যান্ত ঝি কেবল মাছ কুটিয়া দিত। রান্না আবার দুই-রকম ছিল। দিদিমার জন্য শুদ্ধাচারে আলোচালের ভাত রান্না করিতে হইত। আলাদা একটা রান্নাঘরই ছিল তাঁহার জন্য। দিদিমা তাঁহার পাত হইতে আমার জন্য প্রত্যহ কিছু আলো-চালের ভাত, মুগের ডাল রাখিয়া দিতেন। মা সংসারে সব কাজই, এত নীরবে এমন প্রচ্ছন্নভাবে করিতেন যে, তাঁহার অস্তিত্বই বুঝা যাইত না। তাঁহাকে কখনও ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সর্বদা একটি লাল পেড়ে আধময়লা শাড়ি পরিয়া থাকিতেন, মাথায় সিঁদুর পরিতেন বটে, কিন্তু কেশের প্রসাধন করিতে কখনও দেখি নাই। অনেক চুল ছিল তাঁহার, সেগুলি তাঁহার মাথার উপর স্তূপ হইয়া থাকিত। দিদিমা মাঝে মাঝে তাঁহার মাথায় হাত দিয়া দেখিতেন এবং চুলে জট পড়িয়া যাইতেছে বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেন শুনিতে পাইতাম।···এই সময় আর একটা ঘটনা ঘটাতে মা যেন আরও লজ্জিত, আরও ম্রিয়মান হইয়া গেলেন। একদিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম··—আমার একটি ভাই হইয়াছে। অবাক হইয়া গেলাম। হঠাৎ ভাই আসিল কোথা হইতে ? গোয়ালের পাশে যে ঘরটিতে গরুর খড় রাখা হইত সেখান হইতে খড় বাহির করিয়া কখন যে সেটা আঁতুড়-ঘরে পরিণত হইয়াছিল তাহাও বুঝিতে পারি নাই।

উঁকি দিয়া দেখিলাম সেই ঘরে মা একখানি ছেঁড়া কাপড় পরিয়া ছেঁড়া কম্বল ঢাকা দিয়া পার্শ্ব ফিরিয়া শুইয়া আছেন। পাশেই ছেঁড়া-নেকড়ায়-ঢাকা একটি ফুটফুটে শিশু। সে-ও ঘুমাইতেছে। ক্ষ্যান্ত ঝির ধমক খাইয়া দ্বারপ্রান্ত হইতে সরিয়া আসিলাম। একটি মোটা কালো মেয়ে একটি ভাঙা লোহার কড়াই করিয়া কিছু গনগনে কয়লার আগুন লইয়া প্রবেশ করিল। শুনিলাম সেই ধাত্রী, জাতে ডোম। সেই ছেলে প্রসব করয়াইয়াছে, সেই এখন মায়ের সহিত এই ঘরে থাকিবে, আমরা কেহ এ ঘরে ঢুকিতে পাইব না।

দিদিমার কাছে গেলাম। তিনিও সেই কথাই বলিলেন। চুপি চুপি প্রশ্ন করিলেন, "ভাইকে দেখেছিস ?"

"হ্যাঁ, দূর থেকে দেখেছি। খুব সুন্দর। ধপধপ করছে রং, এক মাথা কালো কোঁকড়ানো চুল—"

"হবেই তো। ও যে চাঁদ"—দিদিমা বলিলেন।

"চাঁদ ?"

"তুই সূয্যি, তোর ভাই চাঁদ হবে না ? খুব সুন্দর হয়েছে ?"

"খুব। চাঁদের চেয়েও ভালো"

"পোড়াকপাল আমার, এই সময়ই চোখের দৃষ্টিটা গেল। ওর মুখ আর দেখতে পাব না"

ইহার পর দিদিমা চুপ করিয়া গেলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি নীরবে রোদন করিতেছেন। তাঁহার তুই গাল বাহিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে। দিদিমা সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে দিদিমা আর এক কাণ্ড করিয়া বসিলেন। মা-ই প্রত্যহ দিদিমার চুল আঁচড়াইয়া পিছনে ছোট্ট একটি খোঁপা বাঁধিয়া দিতেন। মা আঁতুড়ে ঢোকার পর মামীমা একদিন চিরুণী লইয়া দিদিমার চুল আঁচড়াইতে বসিলেন। তুই একবার চিরুণী চালাইবার পরই দিদিমা থামাইয়া দিলেন তাঁহাকে।

"সর, তোকে আর চুল আঁচড়াতে হবে না। তুই ঠিক পারচিস না। আমি আর চুল রাখবই না। বিশুকে খবর পাঠা, আমার চুলগুলো ছোট ছোট করে' ছেঁটে দিক। এ আপদ আর রাখা কেন—"

পরদিন বিশু নাপিত আসিয়া দিদিমার মাথাটি ঠিক কদম ফুলের মতো করিয়া দিয়া গেল। দেখিতে অদ্ভুত হইল দিদিমাকে। ইহার দিন কয়েক পরে ঠাণ্ডা লাগিয়া দিদিমার একটু জ্বরভাব হইল। প্রবীণ ডাক্তার সুরথবাবু দেখিতে আসিলেন। তিনি বলিলেন—মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা লাগিয়াছে। তিনি মাথায় গরম টুপি, গায়ে গরম জামা এবং পায়ে মোজা পরিবার ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। ইহার পর দিদিমার চেহারা একেবারে বদলাইয়া গেল। গফুর দরজি তাঁহার জন্য যে জামা করিয়া আনিল তাহা মেয়েদের জামা নয়, ঢিলা-হাতা কোটের মতো পাঞ্জাবী, চায়না কোট তাহার নাম। দিদিমার রং খুব ধপধপে ফরসা ছিল, নাকটি ছিল টিয়া পাখীর ঠোঁটের মতো। তিনি যখন টোপরের মতো কালো মখমলের টুপি ও গরম পাঞ্জাবী পরিয়া বিছানায় বসিয়া থাকিতেন মনে হইত কোনও বৃদ্ধ ইহুদী বুঝি বসিয়া আছে। দিদিমা বলিয়া

তাঁহাকে চেনাই যাইত না। মামা খুব মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি দুইবেলা, সকালে-সন্ধ্যায়, দিদিমাকে আসিয়া প্রণাম তো করিতেনই, দূরে কোন 'কলে' যাইবার আগেও প্রণাম করিয়া যাইতেন। মায়ের এই নূতন বেশ তাঁহার খুব ভালো লাগিয়াছিল। তিনি মায়ের জন্য মুর্শিদাবাদ হইতে সবুজ-পাড়-দেওয়া বেগুনী-রঙের একটি চমৎকার বালাপোষও আনাইয়া দিয়াছিলেন। বালাপোষটি গায়ে দিলে দিদি-মাকে আরও সুন্দর দেখাইত। তাঁহার মুখভাব ক্রমশ শিশুর মুখের মতো হইয়া আসিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মাঝে মাঝে ইহাও মনে হইত যেন একটি শিশু কোনও মন্ত্রবলে হঠাৎ বড় হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছে…"

কুমার তন্ময় হইয়া পড়িতেছিল এবং কল্পনা করিবার চেষ্টা করিতেছিল বাবার দিদিমা সত্যই কেমন দেখিতে ছিলেন।

হঠাৎ ল্যাং-ল্যাং ভেউ-ভেঁউ করিয়া বাহিরে ছুটিয়া গেল। ছুঁচকিও তাহার অনুসরণ করিল। কুমার খাতা বন্ধ করিয়া দ্বারের দিকে চাহিল একবার, তাহার পর উঠিয়া পড়িল। ডেক্‌চির ঢাকনাটা খুলিয়া একবার দেখিল মাংসের ঝোল কতটা আছে। ঝোল তখনও ছিল। হাতার সাহায্যে একটুকরা মাংস বাহির করিয়া সে তখন একটা বাটিতে রাখিল, তাহাতে ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিয়া সেটাকে ঠাণ্ডা করিল, তাহার পর আঙুল দিয়া টানিয়া টানিয়া দেখিতে লাগিল মাংস সিদ্ধ হইয়াছে কি না। একটু বাকী আছে, মনে হইল জলটা মরিতে মরিতে হইয়া যাইবে।

"কুমারবাবু না কি। এখানে কি হচ্ছে—"

কৃষ্ণকান্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ল্যাংল্যাং এবং ছুঁচকি। দুইজনেরই মুখে অপ্রস্তুত ভাব। জামাইবাবুকে তাহারা চিনিতে পারে নাই—তাড়া করিয়া গিয়াছিল এজন্য দুইজনেই যেন খুব লজ্জিত। সেই ভাবটা কাটাইয়া উঠিবার জন্যই হোক বা একজন আর একজনকে দোষী প্রতিপন্ন করিবার জন্যই হোক তাহারা

পবস্পর পরস্পরের ঘাড় পা কান কামড়াকামড়ি করিয়া বপ্রক্রীড়ায় মাতিয়া উঠিল। কৃষ্ণকান্তের পোষাক অদ্ভুত। ব্রিচেস্ পরা সাহেবী পোষাক, হাতে বন্দুক, মাথায় টর্চ-বাঁধা। চক্ষু কর্ণ রোগের বিশেষজ্ঞেরা মাথায় যেমন টর্চ বাঁধেন অনেকটা তেমনি।

"কোথায় গিয়েছিলেন, দিদি খুঁজছিলেন আপনাকে"

"তোমার দিদি সারাজীবনই খুঁজছেন আমাকে। কখনও পাচ্ছেন, কখনও হারাচ্ছেন"

"এ বেশে কোথা গিয়েছিলেন ?"

"প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছিলাম—"

"প্রতিশোধ ? কিসের প্রতিশোধ"

"আজ সকালে হাসপাতালে দেখলাম একটি মানবশিশুকে শেয়ালে খেয়েছে। শৃগালের স্পর্ধা বরদাস্ত করা যায় না। গোটা কুড়ি শৃগাল সংহার করেছি"

"কোথায়—"

"পাশের বাগানটায় ! ওই বেতের জঙ্গলটার পাশে—"

"অতগুলো শেয়াল একসঙ্গে পেলেন কি করে'—"

"টোপ ফেলেছিলাম। একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে' মাথায় এই আলোটা জ্বেলে দিলুম। শেয়ালরা কৌতূহলী জীব, অস্থানে এমন জোর আলো দেখে দেখতে এল ব্যাপারটা কি। গুটিগুটি রেন্‌জের মধ্যেই এসে পড়ল, তারপর আর ফিরে গেল না"

"কুড়িটা মেরেছেন ?"

"কুড়িটা। তোমার কোনও জমিতে যদি সারের দরকার থাকে, ওগুলো পুতে দিতে পার সেখানে। শেয়ালের মাংস খাওয়া যায় না, বিশ্রী গন্ধ ওদের মাংসে, কুকুর-কুকুর গন্ধ। নিগ্রোরা বোধহয় খায়—"

একটা কেরোসিন বাক্সের উপর পেট্রোম্যাক্সটা জ্বলিতেছিল,

সেটা মাটিতে নামাইয়া দিয়া কৃষ্ণকান্ত বাক্সটার উপর উপবেশন করিলেন।

"আপনি এই ক্যাম্পচেয়ারটায় আরাম করে' বসুন না"

"না, রাজাকে অকারণে সিংহাসনচ্যুত করা আমার স্বভাব নয়। ভগবানের আদেশে আমি কেবল দুষ্কৃতদের শাসন করি—"

কুমার পুনরায় মাংসের দিকে মন দিয়াছিল। ঢাকনাটা তুলিয়া দেখিতেছিল। কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "গন্ধটা তেমন ভালো ছাড়ছে না"

"বুনো হাঁস?"

"হ্যাঁ"

"কি কি হাঁস"

"টিল, পোচার্ড, লালসর, স্পুনবিল, গীজও আছে একটা—"

"কতটা মাংস আছে—"

"তা সের পাঁচ ছয় হবে"

"ভাল সরষের তেল আছে এখানে?"

"আছে—"

"তাহলে এক কাজ কর। পোয়া দেড়েক সরষের তেল চড়িয়ে দাও একটা কড়াতে। কড়া এনেছ?"

"হ্যাঁ, ওই যে—"

"পেঁয়াজ রসুন আদা?"

"তা-ও আছে—"

"তাহলে গোটা তিনেক রসুন, পাঁচ-ছটা পেঁয়াজ আর ছটাক খানেক আদা কুঁচিয়ে তেলে ভেজে সবসুদ্ধ ঢেলে দাও ওটার ভিতরে। খানিকটা কাঁচা তেলও দাও তার উপর। পাখীর মাংস সরষের তেলেই জব্দ। তোমার দিদির কাছে শিখেছি এটা"

"জলটা মরুক আগে। ওরে ল্যাংড়া—"

"জি"

কোণের বস্তাটা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল।

"কড়াটা পরিষ্কার কর। আর তিনটে রসুন, ছ'টা পেঁয়াজ, আর খানিকটা আদা কোট্"

কৃষ্ণকান্ত মুগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাঃ বেশ চমৎকার কামুফ্লেজ করে' ছিল তো ল্যাংড়া"

ল্যাংড়া উঠিয়া আসিয়া আদেশ প্রতিপালনে মন দিল। ল্যাং-ল্যাং এবং ছুঁচকি তাহার আশেপাশে ঘুরঘুর করিতে লাগিল। ল্যাংড়া তাহাদের পরম বন্ধু, একটু আগেই পাখীর মাংস খাওয়াইয়াছে"

কুমার বলিল, "আপনার শিকারের গল্প অনেকদিন শুনিনি জামাইবাবু—"

"আজ ছুপুরে তো বলছিলাম রামপ্রসাদ, যোগেন আর প্রিয়গোপালদের—"

"এখন বলুন না একটা, শুনি। মাংসের জলটা মরুক ততক্ষণ—"

কৃষ্ণকান্ত উর্ধ্বমুখ হইয়া খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না এখন"

"আচ্ছা আপনার ভাইঝির শ্বশুর কালীবাবুকে নিয়ে কি কাণ্ড হয়েছিল বলুন তো। আবছা আবছা শুনেছিলাম"

"প্রতিশোধ নিয়েছিলাম"

"কি রকম —"

"মালতী আমার এক দূরসম্পর্কের দাদার মেয়ে। ছুমকায় যখন ছিলাম তখন মেয়েটা খুব ন্যাওটো ছিল আমার। বীরেনদা ছুমকায় থাকতেন তখন। কিছুদিন পরে আমি বদলি হয়ে গেলাম সেখান থেকে। কাউকে কিছু জিগ্যেস না করে' বীরেনদা হুম্ করে' মালতীর বিয়ে দিয়ে বসলেন ওই কালীবাবুর ইম্বেসিল (imbecile) ছেলেটার সঙ্গে। মূর্খ, থস্থসে মোটা, ছুটি গাল যেন ছু'টি বান্ রুটি। সম্বলের মধ্যে আছে শহরে গলির

শেষ প্রান্তে এক জরাজীর্ণ একতলা বাড়ি। বিয়ের সময় আমি যেতে পারিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে সম্ভবত ভালই হয়েছে। ভুলটি ভাঙল বছরখানেক পরে। মালতীর চিঠি পেলাম। লিখেছে তার উপর যে ধরনের অত্যাচার চলছে তা সহ্য করবার ক্ষমতা তার নেই। সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছে সে। নিজের বাবাকে চিঠি লিখে সে কোনও প্রতিকার পায় নি, তাই আমাকে লিখেছে। আমিও যদি এর কোনও প্রতিকার না করি তাহলে সে আত্মহত্যা করবে। টেলিগ্রাম করে' ছুটি নিলুম, তারপর গেলুম তার কাছে। কালীবাবু লোকটিকে সেই প্রথম দেখলাম। ভালুক আর বাঁদরের কম্‌বিনেশন। বেঁটে, রোগা, মুখময় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গোঁফদাড়ি, কুৎসিত দর্শন লোকটা। চোখে নীল চশমা। বাঁ হাতের শীর্ণ আঙুলগুলি সর্বদা চলাচল করছে। গোঁফদাড়ির মধ্যে কাঁকড়ার মতো। আমি গিয়ে মালতীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম। চুপ করে' রইল, তারপর দাড়ির জঙ্গলে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে বললে, "আপনাকে তো চিনি না। বীরেনবাবুর কোনও চিঠিও পাইনি। এ অবস্থায় ঘরের বউকে আপনার সামনে বার করি কি করে'।" বললাম, "আপনি মালতীকে গিয়ে বলুন যে তোমার কেষ্টকাকা এসেছে।" অনেক কচলাকচলি করে' তবে মালতীর সঙ্গে দেখা হ'ল। শুনলাম বুড়োর স্ত্রী নেই। একটি মাত্র শোবার ঘর। সেই ঘরে বুড়ো ছেলের সঙ্গে এক খাটে শোয়, মালতীকে শুতে হয় ঘরের বারান্দায়। সমস্ত রাত শীতে ঠকঠক করে' কাঁপে। সমস্ত দিন হাড়ভাঙা খাটুনি, বাড়িতে ঝি নেই, চাকর নেই, তার উপর রাত্রে ঘুমও নেই—বোঝ অবস্থাটা। কালীবাবুকে বললাম, আপনি এই বৈঠকখানার একধারে শুলেই তো পারেন। মেয়েটার শীতে ভারী কষ্ট হচ্ছে যে। দাড়িতে খানিকক্ষণ আঙুল চালিয়ে কালীবাবু বললেন, "আমার গৃহস্থালীর ব্যাপারে আপনি ওপর-পড়া হ'য়ে মাথা ঘামাচ্ছেন? হুঁ"—আবার খানিকক্ষণ থেমে—"আপনি দূরসম্পর্কের কাকা,

জোয়ান বয়স। আমার বউমাটিও সুন্দরী, যুবতী। আপনার সহানুভূতি হবারই কথা। হুঁ” —এই বলে' আবার দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল। আমি দেখলাম এক্ষেত্রে সোজা আঙুলে ঘি বেরুবে না, আঙুল বাঁকাতে হবে। মালতীকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললাম—“তোর জিনিসপত্তর গুছিয়ে রাখ, রাত্তির আড়াইটের ট্রেনে তোকে নিয়ে যাব। সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে দেখলাম জায়গাটা। দেখলাম ওদের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা সেকেলে শুক্‌নো ইঁদারা আছে। বেশ প্রকাণ্ড ইঁদারা। তারপর থানায় গেলাম। সেখানে ভাগ্যক্রমে দেখা হ'য়ে গেল পুরাতন বন্ধু সুরপৎ সিংয়ের সঙ্গে। একসঙ্গে পড়েছিলাম, একসঙ্গে শিকারও করেছি অনেকবার। সে তখন ওখানকার দারোগা। খুব সুবিধে হয়ে গেল। তারপর বাজারে গেলাম। বেশ মজবুত দেখে কিছু দড়ি আর একটা মুখোস কিনে নিয়ে এলাম, লুকিয়ে রেখে দিলুম সেগুলো ব্যাগের মধ্যে। সব ঠিক করে' আবার থানায় গেলাম। সুরপৎ সিংকে আমার প্ল্যানটি খুলে বললাম অকপটে। সে হাসল একটু। তারপর বলল, “ঠিক আছে। তবে দেখো, মরে' যায় না যেন।” বললাম, “না, মরবে না”। রাত বারোটা নাগাদ মুখোশ পরে' ওদের শোয়ার ঘরের বন্ধ দরজায় মারলাম লাথি, তারপর দিলুম একটা ধাক্কা। কপাট মজবুত ছিল না তেমন, ভেঙে গেল। ঘরে ঢুকে বাপ ব্যাটা দু'জনেরই মুখ কস্‌কসিয়ে বেঁধে ফেললাম তাদেরই কাপড় দিয়ে, তারপর পায়ে দড়ি বেঁধে দুজনকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সেই শুক্‌নো ইঁদারাটার ভিতর নামিয়ে দিলুম !”

কুমার স্মিতমুখে বলিয়া উঠিল, “বলেন কি ! চীৎকার করলে না তারা”

“তারস্বরে। তাদের সঙ্গে আমিও চেঁচাতে লাগলুম। কিন্তু লোকজন উঠতে উঠতে আমি তাদের ইঁদারায় নাবিয়ে মুখোসটা ফেলে দিয়েছি ইঁদারার মধ্যেই। পাশেই ছিল তো ইঁদারাটা—”

"ইঁদারায় নাবাতে গেলেন কেন"

"বাইরে শীতে কি রকম কষ্ট হয় তা বুঝিয়ে দেবার জন্যে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে' নিয়ে গিয়েছিলাম বাপ ব্যাটাকে—"

"তারপর"

"আমার হাল্লা শুনে বেরিয়ে এল দু'একজন। তাদের বললাম, বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, ডাকাতগুলো হয়তো আছে এখনও আশে পাশে। এই শুনে ঘরে ঢুকে পড়ল সবাই। তারপর মালতীকে নিয়ে আমি নিজেই থানায় গেলাম। সেখানে অফিসিয়ালি রিপোর্ট করলাম—"আমি আমার ভাইঝির সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। কিন্তু রাত্রে বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে। ভাইঝির স্বামী আর শ্বশুরকে একটা ডাকাত টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল। কোথা নিয়ে গেছে জানি না, আপনারা সেটা খোঁজ করুন। আমাকে কালই কাজে জয়েন করতে হবে, তাই এই ট্রেনেই আমি আমার ভাইঝিকে নিয়ে চলে যাচ্ছি। যখন কেস হবে' তখন এসে সাক্ষী দেব। ঠিকানা দিয়ে কেটে পড়লাম আড়াইটের ট্রেনে"

"কি হ'ল শেষ পর্যন্ত ?"

"কেস হ'ল। গিয়ে সাক্ষীও দিলাম। ডাকাত ধরা না পড়াতে কেস ধামা চাপা পড়ে' গেল"

"আর মালতী ?"

"মালতী আর ফিরে যায় নি। তাকে স্কুলে ভরতি ক'রে দিয়েছিলাম। এখন সে এম-এ, পাস করে' প্রফেসারি করছে"

"কালীবাবু কিছু করেন নি ?"

"যথেষ্ট করেছিলেন। মকোর্দমা পর্যন্ত হয়েছিল। কিন্তু নিয়ে যেতে পারেন নি আর মালতীকে। আমারও কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারেন নি, সুরপৎ আমার স্বপক্ষে ছিল তো। তুমি মাংসটা দেখ এইবার, জলটা মরে গেছে মনে হচ্ছে—"

কুমার উঠিয়া গেল এবং মাংসটা নাড়িয়া দেখিল।

"ভাগ্যে আপনি বললেন, জল একদম শুকিয়ে গেছে, আর একটু হ'লে ধরে যেত—"

"এইবার তৈলাক্ত কর। বেশ খানিকটা তেলে পেঁয়াজ রসুন আদাটা ভাজ"

পেঁয়াজ রসুন আদা কোটা হইয়া গিয়াছিল, কুমার সেগুলি ভাজিয়া মাংসে ঢালিয়া দিল। ল্যাং ল্যাং এবং ছুঁচকি এতক্ষণ কানখাড়া করিয়া বসিয়াছিল, হঠাৎ তাহারা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পর মুহূর্তেই বাহিরে কুকুরে কুকুরে ঝগড়া বাধিয়া তুমুল কোলাহল উঠিল একটা। একাধিক রুষ্ট কুকুরের চীৎকারে অন্ধকার আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কুমার বলিল, "তাকিয়াটা এসেছে বোধহয়"

"তাকিয়া ? সে আবার কে ?"

"বোসবাবুর কুকুর। বোসবাবু পুষেছিলেন ওটাকে। কিন্তু তিনি বদলি হয়ে গেছেন, ওটাকে আর নিয়ে যান নি। ও আমাদের বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টায় আছে, কিন্তু ল্যাংল্যাং ছুঁচকি কিছুতে আমোল দিচ্ছে না ওকে—"

সহসা একটা কুকুর আর্তনাদ করিয়া উঠিল। কুমার দ্বারপ্রান্তে উঠিয়া গিয়া ডাকিতে লাগিল—"ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভেতরে আয়—"

দেশী কুকুরেরা সহজে কথা শোনো না। অনেক ডাকাডাকির পর তবে ল্যাংল্যাং ছুঁচকি ভিতরে আসিল। যখন আসিল তখনও তাহারা রাগে গরগর করিতেছে। ঘাড়ের লোম খাড়া। বিজয়ীর মতো তাহারা আসিয়া প্রবেশ করিল।

"ঝগড়াটে হিংসুকে কোথাকার। ব'স এখানে—"

কুমার তাহাদের হাত দিয়া ঘরের কোণের দিকে ঠেলিয়া দিল।

"বসে' থাক চুপ করে"

তাহারা বসিবার পর কুমার ডাকিল—"তাকিয়া, তাকিয়া আয়, তাকিয়া—"

কুণ্ঠিত মুখে সসঙ্কোচে পাঁশুটে রঙের একটি বেঁটে মোটা কুকুর আনত নয়নে, আনত পুচ্ছে দ্বারপ্রান্তে আসিল।

"আয়, আয়, ভেতরে আয়—"

তাকিয়া ভিতরে আসিতে সাহস করিল না, সসঙ্কোচে দ্বারপ্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল।

"ওর নামটি বেশ লাগসই হয়েছে। কে রেখেছে"

"আমি। আমিই ওকে প্রথমে পুষেছিলাম। এখন ওকে ফেলে তিনি চলে গেলেন। তাকিয়া, তাকিয়া আ, আ"

তাকিয়া সভয়ে ল্যাজ নাড়িয়া ভিতরে আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ঘরের কোণ হইতে ল্যাল্যাং এবং ছুঁচকি দুইজনেই আবার গরগর করিয়া উঠিল।

"চোপ্। চুপ করে বসে' থাক তোরা। হিংসুকে কোথাকার"

কুমারের ধমক খাইয়া আবার নীরব হইল তাহারা।

এমন সময় বাহির হইতে স্বাতীর গলা শোনা গেল।

"ছোটকাকা, ছোটকাকা—আলো দেখাও"

ল্যাংড়া পেট্রোম্যাকস্ লইয়া বাহির হইল। ক্ষণপরেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে স্বাতী আসিয়া হাজির, তাহার পিছনে স্মিতমুখী সন্ধ্যা।

"মাঝ রাস্তায় ছোট পিসির টর্চের ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। শিগ্গির চল, চিত্রা এসে গেছে—"

তাহার পর কৃষ্ণকান্তের দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমি বড় পিসিকে যত বলছি আপনি এখানেই আছেন, তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কেবল ভাবছে, ভেবেই যাচ্ছে, চলুন"

কৃষ্ণকান্ত সন্ধ্যার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন, "সাহেব কোথা"

"আপনাকে খুঁজছেন"

"আমাকে! কেন"

"গাছের সম্বন্ধে কি যেন জিগ্যেস করবেন। বাগান করবার শখ হয়েছে—"

"কিন্তু আমি তো জঙ্গলের খবর রাখি"

"হয়তো জঙ্গলের গাছই বাগানে লাগাবেন। চলুন"

কুমার জিজ্ঞাসা করিল, "কাকাবাবুর খাওয়া হয়ে গেছে?"

এখনও হয় নি। তবে দিদিমা তাঁর অন্যঘরে তরকারি-টরকারি আলাদা করে রেঁধেছেন। ছানার পায়েস হয়েছে তাঁর জন্যে। চমৎকার হয়েছে পায়েসটা—"

"তুই পায়েসও খেয়েছিস না কি"

স্বাতী নিজেই পায়েস চাহিয়া খাইয়াছিল, কিন্তু বলিল, "দিদি জোর করে' খাওয়ালে—কি করব বল। বললে—চেখে দেখ্ কিন্তু দিলে একটি বাটি। হ্যাঁ, দিদি বললে কলাপাতা কাটানো হয়েছে? যদি না হ'য়ে থাকে শালপাতা নিয়ে যেতে। জামাইরা শুধু থালায় খাবে, আমরা পাতায়—"

"ল্যাংড়া কলাপাতা কেটেছিস তো"

"জি হাঁ—"

"সব নিয়ে চল তাহলে। আগে মাংসের হাঁড়িটা নিয়ে চল"

সকলে বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল।

স্বাতী কুমারকে চুপি চুপি বলিল, "জানো ছোটকাকা, বাবা বড় disappointed হয়েছেন। তিনি ভেবেছিলেন—চিত্রা আসবার আগে টেলিগ্রাম করবে আর তিনি ঘটা করে' স্টেশনে আনতে যাবেন। কিন্তু ওরা খবর না দিয়ে হুট্ করে এসে পড়েছে। কি করবে, টেলিগ্রাম করার সময় পায়নি, সুব্রত লাস্ট মোমেণ্টে ছুটির খবর পেলে—"

"ও, তাই বুঝি—"

হঠাৎ স্বাতী চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছোটকাকা, ওহুটো কি, শেয়াল নাকি!"

সত্যই হুইটি শৃগাল একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাদের দেখিতেছিল।

"এ হুটোর ভবলীলাও শেষ করে' দেব না কি"—কৃষ্ণকান্ত প্রশ্ন করিলেন।

"অনেক তো মেরেছেন আজ। ছেড়ে দিন এ হুটোকে"

শৃগাল হুটিও সরিয়া পড়িল।

"অনেক শেয়াল মেরেছেন বুঝি? কোথা?"—স্বাতী জিজ্ঞাসা করিল।

"পাশের বাগানটায় স্তূপ করা আছে"

"চলুন না দেখি—"

"না এখন নয়। কাল সকালে দেখো"

সন্ধ্যার মৃদুকণ্ঠের গম্ভীর আদেশকে কেহ অমান্য করিতে পারিল না। বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

তাহারা বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিল চন্দ্রসুন্দর ঘরের মেঝেতে বসিয়া গীতাপাঠ করিতেছেন। ঘরের মধ্যে অনেকগুলি ধূপকাটি জ্বলিতেছে। চন্দ্রসুন্দর পরিবেশটিকে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। মেঝের একধারে রাধানাথ গোপও বসিয়া আছেন এবং মুগ্ধচিত্তে গীতার ব্যাখ্যা শুনিতেছেন। তিনি নিজের বাগান হইতে কয়েকটি বড় বড় গ্যাঁদাফুলের মালা আনিয়াছিলেন, সেগুলি চন্দ্রসুন্দরের হুই পার্শ্বে স্তূপীকৃত করা রহিয়াছে। প্রিয়গোপাল এবং সুবাতালী তহশিলদারের ছোট ছেলে সফুর্দিনও একধারে বসিয়া আছে। ইহারা সকলেই চন্দ্রসুন্দরের ছাত্র। ঘরের আর একধারে একটু তফাতে বসিয়া আছে কিরণ, নিখিলবাবুর স্ত্রী কাঞ্চনমালা, স্টেশন মাস্টারের স্ত্রী যোগমায়া এবং মিস বোস। কিরণ এবং যোগমায়ার গলায় আঁচল, হাত হুইটি জোড়-করা। উষাও এখানে ছিল, কিন্তু চিত্রা আর সুব্রত আসাতে উঠিয়া গিয়াছে। ঊর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার

শিয়রে চিত্রাপতবৎ বসিয়া আছে। গগন পিছনের দরজাটা দিয়া একবার উঁকি দিয়া দেখিল। আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল গীতাপাঠ আর কতক্ষণ চলিবে। কথা ছিল সন্ধ্যায় দাত্বর ঘরে মজলিস বসিবে, চম্পা গান গাহিবে। কিন্তু ছোট-দাত্বর গীতা-পাঠ সে সম্ভাবনা রহিত করিয়া দিয়াছে। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। সূর্যসুন্দর চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া শুইয়া ছিলেন। গীতার ব্যাখ্যা মাঝে মাঝে তাঁহার কানে যাইতেছিল, তিনি তাহার কিছু অর্থও হৃদয়ঙ্গম করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহর মুদিত নয়নের সম্মুখে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল সেই পথটা, সেই আদি-অন্ত-হীন নির্জন পথ, যে পথে তিনি একক যাত্রা, যে পথের অপর প্রান্ত হইতে কে যেন আগাইয়া আসিতেছে। তিনি তাহাকে ঠিক চিনিতে পারিতেছেন না, মনে হইতেছে ওই কি মৃত্যু? মৃত্যু কি এভাবে আসে?

হঠাৎ বাহিরে খোল করতাল মৃদঙ্গ বাজিয়া উঠিল।

"ও কি?"

সূর্যসুন্দর চোখ খুলিয়া প্রশ্ন করিলেন।

রাধানাথ গোপ সসম্ভ্রমে উত্তর দিলেন—কিষুণগঞ্জের রামবিলাস বাবাজীর কীর্তনের দল। তাদের খুব ইচ্ছে তারা আপনার হাতার একধারে বসে' নামকীর্তন করবে রোজ। রামবিলাস বলছিল আমি তো ডাক্তারবাবুর ঋণ এ জীবনে শোধ করতে পারব না, তিনি যদি অনুমতি দেন তাহলে তাঁকে নামগান শোনাই—

সূর্যসুন্দর কোন উত্তর দিলেন না।

কাঞ্চনমালা, নিখিলবাবুর স্ত্রী, কিরণের কানে কানে কি যেন বলিলেন।

কিরণ বলিল, কাকীমা বলছেন, একটু দূরে বসে' ওরা বাজাক তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু দাত্বর কানের কাছে যেন গোলমাল না হয়"

"না, না, ওরা দূরে বসেই বাজাবে। ওই হাস্নুহানার ঝাড়ের ওপারে ওদের জায়গা করে' দিয়েছি। মাস্টার মশাইকে জিগ্যেস করে' তবে ওদের খবর দিয়েছিলাম—"

চন্দ্রসুন্দর বলিলেন, "বাজাক না। ভগবানের নাম হবে, ভালইতো"

রাধানাথ গোপ তাহাদের বসাইবার জন্যে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দর পুনরায় গীতাপাঠ আরম্ভ করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পুরসুন্দরী প্রবেশ করাতে তাহা আর হইল না।

পুরসুন্দরী সূর্যসুন্দরের কাছে গিয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার জন্যে গরম লুচি ভেজে আনি দু'খানা ?"

"না। আমি আর রাত্রে কিছু খাব না. দিনে অনেক খাওয়া হয়েছে। রাত্রে না খাওয়াই ভালো"

গগন মাথার দিকের দরজার কাছে পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "ভোরের দিকে আমি না হয় হর্লিক্স্ করে' দেব এক কাপ্।"

"তুমি করে' দেবে ?"

সূর্যসুন্দর সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন।

"আমি খুব ভোরে উঠি যে। আপনার ঠিক পাশের ঘরেই তো আমি আছি। সমস্ত ব্যবস্থা করে' নিয়েছি ওখানে। স্টোভ কুঁজো চায়ের সমস্ত সরঞ্জাম, ওভালটিন্, হরলিক্স—"

গীতাপাঠে বাধা পড়ায় চন্দ্রসুন্দর মনে মনে চটিতেছিলেন, কিন্তু উপায় কি! পুরসুন্দরী তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "রাত তো অনেক হ'ল। আপনার খাবার জায়গা করে' দি ?"

"আমারও তেমন খিদে হয় নি মা"

"তবু যা পারেন খেয়ে নিন। গরম গরম ফুলকো লুচি আপনি বস্‌লে ভেজে ভেজে দেব। আপনার খাওয়া হলে তবে এরা খেতে

বসবে। কুমার মাংসের হাঁড়ি খোলবার আগেই আপনাকে খাইয়ে দিতে চাই”

কিরণ মন্তব্য করিল—“সে-ই ভালো। একে পাখীর মাংস তায় কুমার রেঁধেছে, ঢাকা খুললে ও তো মাৎ করে' দেবে চারিদিকে। কাকাবাবু, আপনি খেয়েই নিন”

“আচ্ছা এই শ্লোকটা শেষ করে' উঠছি”

শ্লোকটা পড়িতেছিলেন কিন্তু তাহাতেও আবার বাধা উপস্থিত হইল। হাই-হিল-জুতা খটখট করিয়া চিত্রা প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গেলেন। শুধু জুতা নয়, ওভার-কোটও পরিয়াছে. হাতে দস্তানা, চোখে চশমা। সে সোজা গিয়া সূর্যসুন্দরের বিছানায় বসিল এবং দুই হাতে সূর্যসুন্দরের গাল দুটি ধরিয়া তাঁহার কপালে চুম্বন করিল। প্রণাম করিল না। চন্দ্রসুন্দর অবাক হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য!

পুরসুন্দরী চন্দ্রসুন্দরের দিকে আড় চোখে চাহিয়া চিত্রাকে বলিলেন, “জুতোটা খুলে আয় বাইরে, এখানে গীতা পড়া হচ্ছে যে। আগে প্রণাম কর, দাদুকে, ছোটদাদুকে—”

“ও”

অপ্রতিভমুখে চিত্রা বাহির হইয়া গেল এবং জুতা খুলিয়া আসিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। চিত্রার স্বামী সুব্রতও দ্বার-প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, তাহার পরিধানে ছিল খাকি সুট। সে-ও পরসুন্দরীর কথাগুলি শুনিয়া হেঁট হইয়া জুতার ফিতা খুলিতে লাগিল। চন্দ্রসুন্দর সুব্রতকে দেখেন নাই, কিন্তু সে যে পুলিস সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট্ তাহা শুনিয়া-ছিলেন।

“বলিলেন, “তুমি দাদু কষ্ট করে' জুতো খুলছ কেন। এখানে আর কেউ কিছু মানছে না, সব জগন্নাথ ক্ষেত্র হ'য়ে গেছে। তাছাড়া গীতা পড়াও হয়ে গেছে। তুমি জুতো পরেই ভিতরে এস”

সুব্রত কিছু বলিল না, মৃদু হাসিল মাত্র, তাহার পর ঘরে প্রবেশ করিয়া গুরুজনদের প্রণাম করিতে লাগিল। তাহার পর সূর্যসুন্দরের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদু, আপনি কেমন আছেন এখন"

"খুব ভালো আছি। তবে সময় হ'য়ে এল, তোমাদের সকলের কাছে বিদায় নিয়ে এবার পারের খেয়ায় উঠ্‌তে হবে"

পার্বতী হঠাৎ দ্বারপ্রান্তে আসিয়া ধমকের সুরে পুরসুন্দরীকে বলিল, "মা, তুমিও এসে গল্পে মেতে গেছ! চিত্রা আয়, সুব্রত তুমিও এস, বাথরুমে গরম জল দিয়েছি। মা, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না এস, আঁচ ব'য়ে যাচ্ছে, বেগুন ব্যাসন সব ঠিক করে' দিয়েছি"

গগনকে আবার দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল।

"ওরে পার্বতী, চিত্রা আর সুব্রতর জিনিস-পত্র ওই হলদে তাঁবুটায় নিয়ে যেতে বললে ছোটকাকা। ওরা ওখানেই থাকবে, তুই গুছিয়ে দে সব—"

"বাবা বাবা, এক হাতে আমি আর ক'দিক সামলাই বল—"

বলিয়াই পার্বতী অন্তর্ধান করিল।

ইহার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দ্বারাপ্রান্তে দেখা দিলেন কবিরাজ মশায়। তিনি হঠাৎ মিলিটারি কায়দায় সুব্রতকে স্যালুট করিয়া বলিলেন—"জয় হিন্দ্"। তাহার পর আকর্ণ বিশ্রান্ত হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমিও কিছুদিন ফৌজে চাকরি করেছিলাম। ফৌজী আদবকায়দা কিছু কিছু মনে আছে এখনও। তারপর সুপারিনটেণ্ড সাহেব কেমন আছ"

"ভাল। আপনি?"

"আমি নেই. যা দেখছ তা অতীতের কঙ্কাল"

চিত্রার বিবাহের সময় কবিরাজ মশায় ছিলেন, তখন সুব্রতর সহিত তাঁহার বেশ আলাপ হইয়াছিল।

পার্বতীর উচ্চকণ্ঠস্বর পুনরায় শোনা গেল।

"চিত্রা, সুব্রত এস, তোমাদের জল ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।"

"যাও, যাও তোমরা যাও। ছোট বামুনদিদিকে আর চটিও না। সেই বুড়ীই বোধহয় পুনর্জন্ম গ্রহণ করে' এসেছে আবার—"

"কার কথা বলছেন—"

"সেকালে আর এক বামুনদিদি ছিলেন এ বাড়িতে, তার কথা তোমরা বোধহয় শোন নি। বিরুবাবুর মনে আছে হয় তো।"

"সুব্রত, চিত্রা-আ—"

আবার পার্বতীর গলা শোনা গেল।

"যাও, যাও তোমরা যাও"

চিত্রা সুব্রত উঠিয়া ভিতরের দিকে চলিয়া গেল।

"আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় কবরেজ মশাই"—কিরণ প্রশ্ন করিল।

"ভুস্‌কারে শুয়ে ঘুমুচ্ছিলাম। ওইখানেই আমি আমার আস্তানা করে' নিয়েছি"

এ অদ্ভুত খবরে সকলে হাসিয়া উঠিল। ভুস্‌কার মানে যে ঘরে গমের ভুসি জমা করা থাকে। প্রকাণ্ড উঁচু ঘর। জানালা দরজা কিছু নাই। একটি দেওয়ালের উপরে শুধু একটি ছোট জানলার মতো ফাঁক থাকে, তাহার ভিতর দিয়াই ঘরে ভুসি ঢালা হয়। ভুসি বাহির করিবার সময়ে সিঁড়ির সাহায্যে সেই পথেই চাকরেরা ঢোকে। ঘরের ছাত হইতে মেজে পর্যন্ত ভুসি ঠাসা থাকে সেখানে। কেবল ওই জানালার ঠিক নীচেই খানিকটা জায়গা খালি থাকে ভিতরে। সেখানে কবিরাজ মহাশয় শুইয়াছিলেন এ সংবাদ সত্যই অদ্ভুত।

কিরণ প্রশ্ন করিল, "ওখানে আপনি উঠলেন কি করে?"

"মই দিয়ে। কুমারবাবুর লম্বা মই আছে যে একটা"

"আপনার গায়ে তো ভুসি-টুসি কিচ্ছু লাগে নি দেখছি"

"আপাদমস্তক কম্বল ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলাম। কম্বলটায় লেগেছে খুব। সেটা খুলে এসেছি"

সূর্যসুন্দর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "ভুস্‌কারে শোওয়া ওঁর অনেক দিনের পুরোনো অভ্যেস"

কবিরাজ অকৃত্রিম আনন্দে খিক খিক করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"সেই কলাচুরির কথা মনে আছে আপনার ডাক্তারবাবু?"

"আছে বই কি—"

উষা আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। সে সবটা শোনে নাই। কিন্তু গল্পের গন্ধ পাইয়াছিল।

বলিল, "কোথায় কলা চুরি হ'ল—"

"এখন হয় নি। হয়েছিল অনেক দিন আগে। তোমাদের জন্মাবার আগে। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। সে বড় মজার গল্প"

"বলুন না"

ছোট-খুকীর মতো আবদার করিয়া উষা বাবার বিছানার একধারে জাঁকিয়া বসিল।

কুমার পিছনের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া কাঞ্চনমালাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কি এখন যাবেন? আমি মথুরার হাতে কাকাবাবুর জন্য খানিকটা রান্না-করা মাংস পাঠাচ্ছি। আপনি যদি যেতে চান মথুরার সঙ্গে যেতে পারেন"

"তাই যাই তাহলে। লণ্ঠন দিও একটা"

"হ্যাঁ লণ্ঠন দেব বই কি"

কাঞ্চনমালা বাহির হইয়া গেলেন।

চন্দ্রসুন্দরও গীতা ফুলের মালাগুলি গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িলেন। এসব আলোচনা তাঁহার তত ভালো লাগিতেছিল না।

কবিরাজ মহাশয় একটি মোড়া টানিয়া বসিলেন এবং শুরু করিলেন তাঁহার গল্প।

"এটা গল্প নয়। আমি যা বলি তা একটাও গল্প নয়, সত্য।

আই অ্যাম এ হিস্‌টোরিয়ান্‌। ডাক্তারবাবুর বাড়ির চারিপাশে তখন বাগান ছিল। ফুল ফল শাকসবজি কপি-আলু সব রকম হ'ত। ডাক্তারবাবু বিতরণ করতে কসুর করতেন না, তবু চুরি হ'ত। কাক-বাদুড়-গরু ছাগলরা তো করতই, মানুষরাও করত। যখনকার কথা বলছি তখন ডাক্তারবাবুর কলা-চাষ করবার শখ খুব প্রবল। জিতুবাবু বলে' এক ব্রাহ্ম ভদ্রলোক তখন ডাক্তারবাবুর বাড়িতে থাকেন এবং চাষ সম্বন্ধে নানা রকম পরামর্শ দিয়ে ডাক্তারবাবুকে উৎসাহিত করতেন। আর আমরা বিনা পয়সায় নানা রকম তরিতরকারি ফলমূল খেয়ে বাহবা বাহবা করতুম। কলা চাষের খুব ধুম চলেছে তখন, বাড়ির চারদিকে নানা রকম কলা-গাছ লাগানো হয়েছে। সে যে কত রকমের কলা, তা আর কি বলব তোমাদের। সব আমার মনেও নেই। চীনে কলা, বর্মী কলা, সিংগাপুরী কলা, কাবুলী কলা, মাদ্রাজী কলা, মর্তমান কলা, অগ্নীশ্বর কলা—এই ক'টা নাম মনে পড়ছে। জিতুবাবু ঢাকা থেকে এক রকম কলা গাছ আনালেন তার নাম 'শফ্‌রি' কলা। তিনি এক ডজন শফরি কলার গাছ লাগালেন, নানা রকম সার-টার দিয়ে। ডাক্তারবাবু রোজ সকালে উঠে রোগী দেখবার আগে কলা-গাছগুলিকে একবার দেখে আসেন। জিতুবাবু তো দু'ঘণ্টা অন্তর দেখছেন। ক্রমে ক্রমে গাছগুলি বাড়ল, তারপর দেখা গেল একটি গাছে কলার ফুল হয়েছে। সেদিন কি আনন্দ সকলের। বাড়িতে নূতন ছেলে হয়েছে যেন। তারপর সেই মোচা কলা ছাড়তে লাগল ক্রমশ। ক্রমশ কাঁদি হ'ল একটা। সবাই এসে চোখ বড় বড় করে' দেখে যেতে লাগল সেটাকে। তারপর যেদিন কলার রং ধরল সেদিন তো হৈ চৈ পড়ে' গেল বাড়িতে। দুটো দল হ'য়ে গেল। বিরুবাবুর মা বললেন—এখুনি ওটাকে গাছ থেকে কেটে ভাঁড়ার ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া হোক, দু' একদিনেই পেকে যাবে। এ শুনে জিতুবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন। তিনি বললেন—গাছে আরও দু' একদিন

থাক, মাটির রসটা পুরো টেনে নিক, তারপর কাটা হবে। জিতুবাবু এসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক, তাঁর কথা অমান্য করা গেল না। কাঁদি গাছেই রইল। তারপর দিন ডাক্তারবাবু কলে বেরুবার আগে সকাল সাতটার সময়ে দেখেছেন কাঁদি গাছে ঝুলছে, আরও দু'চারটে কলা পেকেছে। ন'টার সময় জিতুবাবু গিয়ে দেখলেন—সব সাফ, গাছে কাঁদি নেই, কে কেটে নিয়ে গেছে। হুলুস্থুল পড়ে' গেল। থানায় পর্যন্ত খবর দেওয়া হ'ল। দুপুর বেলা আমদাবাদ থেকে আমি এসে পৌঁছলাম এক বেটো ঘোড়ায় চড়ে'। তখন আমার ঘোড়া ছিল, তার ল্যাজে চুল ছিল না, বাঁ চোখে ছানি, কিন্তু চলত ভালো। বিরুবাবুর মায়ের কাছে খবর পাঠালাম আমি এসেছি। তিনি তো অন্নপূর্ণা ছিলেন, খবর পাঠালেই অন্ন জুটে যেত। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম চারিদিকে কেমন একটা থমথমে ভাব। জিতুবাবু ভুরু কুঁচকে বসে' আছেন, চাকর-বাকরগুলো সবাই সন্ত্রস্ত, উদিৎ সিং তম্বি করে' বেড়াচ্ছে চারিদিকে। তারপর শুনলাম ব্যাপারটা। আমারও রাগ হল' খুব। এ শালা চণ্ডালের দেশ, ডাক্তারবাবু এদের এত দেন, এদের জন্যে এত করেন তবু ব্যাটারা চুরি করতে ছাড়ে না। ডাক্তারবাবু তখনও কল থেকে ফেরেন নি, বিরুবাবুর মা আমাকে আগেই খাইয়ে দিলেন। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘুমুব বলে' মই আনিয়ে ভুসকারে গিয়ে ঢুকলাম। ওখানে নিরিবিলিতে বেশ চমৎকার ঘুম হয়। বিশেষত শীতকালে। বরাবরই আমি ওখানে শুতাম। সেদিন ভুসকারে ঢুকে ভুসোগুলো সরিয়ে একটু জায়গা করতে গিয়ে দেখি ভুসোর মধ্যে কলার কাঁদিটা ঢোকানো রয়েছে। বুঝলাম চুরি করে' কেউ সরিয়ে রেখেছে এখানে। নিয়ে যেতে পারে নি। অন্ধকার হ'লে নিয়ে যাবে। ওখানে শোয়া আর নিরাপদ বলে' মনে হ'ল না। নেবে গিয়ে খবরটি চুপি চুপি উদিৎ সিংয়ের কানে তুলে দিলাম। সাপের ল্যাজে পা পড়লে যা হয় অনেকটা তেমনি হ'ল। উদিৎ সিং তড়াক করে' লাফিয়ে উঠে

তুলতে লাগল, যেন আমাকেই ছোবলাবে। নাকের ছ্যাঁদা ফাঁক হয়ে গেল, ছোট ছোট চোখ তুটো থেকে ছুটতে লাগল আগুন। দাঁতে দাঁত পিষে নীচু গলায় তর্জন করে' আমাকে বললে কোইকো, কোই বাত, নেহি বোলিয়ে। ম্যয় শালেকো পাকড়েঙ্গে। তারপর কি করলে জান ? সেই কলার কাঁদির পাশেই ভুসোর মধ্যে ডুবে বসে রইল। নাকের ছ্যাঁদা তুটি আর চোখ তুটি বেরিয়ে রইল শুধু। ঠিক সন্ধ্যের পরই ধরা পড়ল চোরটা। ডাক্তারবাবু তাকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছিলেন, খেতে পাচ্ছিল না—তাই বাগানের মালী করে' বাহাল করেছিলেন। সেই শালার এই ব্যবহার।

উদিৎ সিংহ তো তাকে জুতিয়ে রক্তারক্তি করে' দিলে, তারপর থানা পুলিস। নির্ঘাত জেল হ'য়ে যেত, ডাক্তারবাবুই আবার বাঁচালেন তাকে। চাকরিও দিলেন আবার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারেন নি। মাস ছয়েক পরে আর এক জায়গায় চুরি করে' ধরা পড়ল সে। তখন জেল হ'য়ে গেল…"

গগন বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, সে অনুভব করিল কবিরাজ মহাশয় যদি আর এক প্রস্থ গল্প আরম্ভ করেন তাহা হইলে বড়ই দেরি হইয়া যাইবে। সে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "চলুন আমরা সব বাইরে গিয়ে বসি। দাতুর সমস্ত দিন বড্ড strain গেছে, উনি এবার একটু ঘুমুন"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ—সেই ভালো। চল বাইরেই যাই আমরা। আমি তো পুরোনো গুদাম ঘরের মতো। আমার মনের দরজা জানলা খুলে দিলে কত যে গল্পের আরশোলা, ইঁতুর, টিকটিকে বেরিয়ে পড়বে তার ঠিক আছে। রাত ভোর হয়ে যাবে।"

হাসিতে হাসিতে কবিরাজ মহাশয় বাহিরে চলিয়া গেলেন। গগন পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, "ওরে নিয়ে আয় এইবার—"

দিগন্ত অতি সন্তর্পণে পা টিপিয়া পাশের ঘর হইতে একটি নীল-শেড-দেওয়া সুদৃশ্য বাতি লইয়া প্রবেশ করিল।

"কোথা রাখব এটা"

"মাথার শিয়রের দিকে এই তেপায়াটার উপর। দাতুর ঘরে রাত্রে এই বাতিটাই জ্বলবে। শেডটা ভালো, স্নিদিং আলো হবে। এই লণ্ঠনগুলো সরিয়ে নিয়ে যা—"

উষা জিজ্ঞাসা করিল, "এটা আবার কোথা থেকে পেলি"

"কাটিহার থেকে আনালাম"

"তাই বুঝি সন্ধ্যে থেকে তু'ভায়ে মিলে ওইটে নিয়ে ঘুজ্‌ঘুজ্‌ করছিস"

দিগন্ত দাদার আদেশ অনুসারে আলোটি যথাস্থানে রাখিয়া লণ্ঠনগুলি লইয়া চলিয়া গেল। সমস্ত ঘরটা একটা নীলাভ স্নিগ্ধ আলোয় ভরিয়া উঠিল।

উষার দিকে চাহিয়া গগন প্রশ্ন করিল—"বেশ সুন্দর হয় নি?"

"চমৎকার"

"দাতুকে এবার ঘুমুতে দাও একটু। তুমি আবার যেন গল্প ফেঁদো না"

"গল্প তো তোমরাই করছ। আমি তো এতক্ষণে এলাম ছেলে তিনটেকে খাইয়ে। ছেলে তো নয়, এক একটা ডাকাত"

"ঘুমিয়েছে ওরা?" সূর্যসুন্দর প্রশ্ন করিলেন।

"না! চক্ষে ঘুম নেই কারো। অথচ সমস্ত দিন হৈ হৈ করে' বেড়িয়েছে! কতক্ষণ আর চাপড়াব। বুড়ো হাতীদের কি আর চাপড়ে ঘুম-পাড়ানো যায়! ওদের বাপের কাছে দিয়ে চলে' এলুম তাই। ওঁরও ইচ্ছে ছিল সন্ধ্যের সময় বাবার কাছে এসে একটু বসেন, কিন্তু যা হৈ হৈ হচ্ছে বসবেন কখন। আমারও ক্লান্ত লাগছে। মোটা মানুষ ঘুরে ঘুরে হাঁপিয়ে পড়েছি। আমি বাবার পায়ের কাছে এই খানটায় একটু গড়িয়ে নি। ওই ছোট বালিশটা আমাকে দে তো উর্মিলা—"

উর্মিলা সূর্যসুন্দরের মাথার শিয়রে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

কোথাও উঠিয়া যায় নাই, কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার অঙ্গুলিগুলি সূর্যসুন্দরের কেশ-বিরল মস্তকে ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল।

উষা মাথায় বালিশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়িল। একটু পরে তাহার নাকও ডাকিতে লাগিল। সূর্যসুন্দর তাহার দিকে সস্নেহে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

গগন তখন চুপি চুপি দাদুর কানের কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, "দাদু, আলোটা ভালো লাগছে তো"

"ওয়াণ্ডারফুল"

"চম্পাকে ডাকব? সে এইখানে তোমার কাছে বসে আস্তে আস্তে গান শোনাক না একটা। গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়—"

"বেশ, সে তো ভালই হবে। কিন্তু ওর কষ্ট হবে না তো, পোয়াতি মানুষ—"

"বাপের বাড়িতে পার্টিতে পার্টিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল এই অবস্থায়। ডেকে আনি?"

"আন তাহলে"

দিগন্ত পাশের ঘরে অপেক্ষা করিতেছিল। গগন সেদিকে চাহিয়া বলিল, "দিগন্ত তোর বৌদিকে নিয়ে আয়। তার আগে ক্যাম্প-চেয়ারটা দাদুর মাথার দিকে পেতে দে। চম্পা ওইটেতে বসে' গান শোনাক দাদুকে—"

বাধ্য বালকের মতো দিগন্ত আসিয়া ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া দিল এবং তাহার পর চম্পাকে ডাকিয়া আনিল। চম্পা যেন গ্রীণ-রুমে অপেক্ষা করিতেছিল। তাহার পরিধানে জরির পাড়-বসানো নীল শাড়ি, খোঁপায় কুন্দফুলের মালা। সে সলজ্জ মৃদু হাসিয়া গগনের দিকে চাহিল, তাহার পর মৃদুকণ্ঠে দিগন্তকে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন গানটা গাইব"

দিগন্ত বলিল, "দিন শেষে বসন্ত যা—"

গগন ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দিগন্তর দিকে চাহিল। সে আশা করিয়াছিল দুপুরের কথা-মতো 'মম যৌবন নিকুঞ্জে' গানটাই গাওয়া হইবে। কিন্তু দিগন্ত এ কি ফরমাস করিল। কিন্তু সে জানে এ সব ব্যাপারে দিগন্তই বেশী সমঝদার, তাই সে আর প্রতিবাদ করিল না।

চম্পা ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল—

"দিন শেষে বসন্ত যা প্রাণে গেল ব'লে
তাই নিয়ে বসে আছি, বীণাখানি কোলে।
তারি সুর নেব ধরে'
আমারি গানেতে ভরে
ঝরা মাধবীর সাথে যায় সে যে চলে'।"

গগন দিগন্ত দুই জনেই নিঃশব্দ চরণে বাহির হইয়া গেল। সূর্যসুন্দর গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি নিজের মাকে দেখিতে পাইলেন। মায়ের কোলে একটি শিশু, তিনিই যেন শিশু হইয়া মায়ের কোলে শুইয়া আছেন, মা যেন মৃদু কণ্ঠে গান গাহিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইতেছেন। মায়ের ছবি ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। বাবা আসিলেন, তাঁহার হাতে এক-গোছা সবুজ দূর্বা। বাবার হরিণটা আসিয়া দূর্বাগুলি খাইতে লাগিল। বাবা চলিয়া গেলে আসিলেন মামা। তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোমার উপর সত্যই অন্যায় করেছিলাম আমি, আমায় মাপ কোরো। মামাও চলিয়া গেলেন, তাহার পর আসিল মন্মথ। হাসিয়া বলিল, কি রে তুইও টিকিট কেটেছিস দেখছি। কোন ভয় নেই। বেশ আছি আমরা এখানে। এখানেও গান গাই। শুনবি? তোর সেই হার্মোনিয়মটা আছে তো। হার্মো-নিয়মটা বাহির করিয়া আনিয়া, তেমনি করিয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া সেই পুরাতন গানটা ধরিল—

উরমির পরে উরমি উঠিয়া
সবলে এ তনু দেয় ডুবাইয়া
ডুবে গিয়ে পুন কেন উঠি ভেসে
কেন নাহি যাই তলায়ে

তাহার পর হঠাৎ থামিয়া বলিল, "হার্মোনিয়মের বেলোটা খারাপ হয়ে গেছে, সারিয়ে নিস।" এই বলিয়া একটু হাসিয়া সে-ও চলিয়া গেল। তাহার পর আসিল নবুদা, তাহার পর রায় মশায়।...সর্বশেষে আসিল 'বউ'—বিরুর মা। মুখে প্রসন্ন হাসি। —মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, ছেলে, মেয়ে বউ, নাতি, নাতবৌ নিয়ে বেশ আরামে আছ দেখছি। যে জগত অতীতে মিলাইয়া গিয়াছে, যে জগতের অধিবাসীরা আর ইহলোকে নাই সেই জগত তাঁহার ঘুমের মধ্যে মূর্ত হইল। প্রায়ই হয়।

....তাহার পর হঠাৎ সব লুপ্ত হইয়া গেল আবার। ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ খুলিয়া দেখিলেন—ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছে, চম্পা উঠিয়া গিয়াছে। উর্মিলা শুধু বসিয়া আছে মাথার শিয়রে। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে কীর্তনের গান—

হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

"কারা হরি নাম করছে ?"

"রামনিবাস বাবাজীর দল কীর্তন করছে, সেই যে সন্ধ্যের সময় এসেছিল"

"ও"

সূর্যসুন্দর আবার চোখ বুজিলেন। উর্মিলা আনতমুখে সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল, তাহার পর যখন অনুভব করিল সূর্যসুন্দর সত্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন ; তখন সে-ও মাথার শিয়রের স্থানটিতে গুটিসুটি হইয়া শুইয়া পড়িল।

সূর্যসুন্দর কিন্তু ঘুমান নাই। তিনি রামনিবাসের বাবা

শ্রীনিবাসের কথা ভাবিতেছিলেন। লোকটা মদ খাইত, মাংসও খুব প্রিয় ছিল তাহার। প্রায়ই তাঁহার বন্দুক লইয়া শিকারে বাহির হইত। হাতের লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। কখনও শুধু হাতে ফেরে নাই। ঘুঘু হরিয়াল শরাল প্রভৃতি প্রায়ই মারিয়া আনিত। শুধু মারিয়া আনিত নয়, তাঁহার আস্তাবলটায় বসিয়া রাঁধিত। একা হাতেই সে পাখীর পালক ছাড়াইত, কুটিত, মশলা বাটিত। বামুনদিদি তাহাকে বাড়িতে আমোল দিতেন না। রান্না করিতে করিতে তাঁহার জন্য খানিকটা আলাদা করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে বাকিটাতে খুব ঝাল দিত। তাহার পর সেই ঝাল মাংসের চাট দিয়া মদ খাইত। রোজ মদ খাইত সে। বস্তুত ইহাই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল। সকালে উঠিয়া পাখীর খোঁজে বাহির হওয়া, পাখী খুঁজিয়া শিকার করা এবং সন্ধ্যায় সেই পাখীর মাংস সহযোগে মদ খাওয়া। যেদিন সে অন্য পাখী পাইত না, সেদিন চড়াই শালিক পর্যন্ত মারিত। ঢিল ছুঁড়িয়া মারিত। এ বিষয়ে অদ্ভুত দক্ষতা ছিল তাহার, মাংস সে কোন রকমে রোজ জোগাড় করিবেই। মাংস তাহার প্রত্যহ চাই-ই, অথচ বাজারে প্রত্যহ মাংস পাওয়া যাইত না, এখনকার মতো তখন গ্রামে গ্রামে কশাইয়ের দোকান ছিল না, পূজার সময় ছাড়া পাঁঠা কাটা হইত না। আদিম বন্য মানবদের মতো তাই শ্রীনিবাসকে নিজের দক্ষতার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। মদ খাইয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছিল শ্রীনিবাস। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল, সবই সে মদে নষ্ট করিয়াছিল। অবশেষে গ্রামের প্রান্তে দশ বিঘার যে আমবাগানটি আছে সেইটি বাঁধা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল সে। হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া দিয়া রীতিমত দলিল-পত্র করিয়া ধার করিয়াছিল। কিন্তু শোধ করিতে পারে নাই। কাহারও ধার সে শোধ করে নাই। অবশেষে একটা নষ্ট স্ত্রীলোকের আশ্রয় লইয়াছিল। সে নষ্ট ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু শ্রীনিবাসের খুব হিতৈষিণী ছিল।

সেই তাহাকে খাইতে পরিতে দিত এবং পাওনাদারদের তম্বি হইতে লুকাইয়া রাখিত। কোনও পাওনাদার শ্রীনিবাসের নাগাল পাইত না। সে নাকি শাখাপত্র বহুল বড় বড় গাছে উঠিয়া লুকাইয়া বসিয়া থাকিত। স্ত্রীলোকটি একটি বালতির ভিতর এক বোতল মদ, কিছু মাংস এবং খানকয়েক রুটি লইয়া গিয়া গাছতলায় দাঁড়াইয়া সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস গাছের উপর হইতে একটি দড়ি নামাইয়া দিত। স্ত্রীলোকটি বালতিতে দড়ি বাঁধিয়া পুনরায় সঙ্কেত করিলে শ্রীনিবাস বালতি উপরে টানিয়া লইত। স্ত্রীলোকটিও তাহার পর গাছে উঠিয়া যাইত। সূর্যসুন্দর একবার স্বচক্ষে তাহাদের একটি গাছের উপরে দেখিয়াছিলেন। পাওনাদারদের ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু যমকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শ্রীনিবাসের অবশেষে কঠিন পীড়া হইল। সিরোসিস্ অব লিভার এবং তদুপরি নিউমোনিয়া। ছিন্নবসনা রুক্ষকেশা শ্রীনিবাসের স্ত্রী আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সূর্যসুন্দরের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল। সূর্যসুন্দর শ্রীনিবাসের চিকিৎসা করিবার জন্য তাহার বাড়ি গেলেন। গিয়া দেখিলেন চিকিৎসা করিবার আর কিছু নাই, শেষ চিকিৎসক যম আসিয়া শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীনিবাস অসহায় দৃষ্টি তুলিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল, দুই গাল বাহিয়া ধারা নামিল। শ্রীনিবাসের পুত্র রামনিবাস তখন চার বছরের শিশু। সে বিছানার পাশে দাঁড়াইয়াছিল, শ্রীনিবাস তাহার হাতটি টানিয়া সূর্যসুন্দরের হাতে দিয়া নির্নিমেষ উৎসুক দৃষ্টিতে সূর্যসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সেই সময় সূর্যসুন্দর একটা নাটকীয় কাণ্ড করিয়াছিলেন। যে হ্যাণ্ডনোট ও দলিল লিখিয়া শ্রীনিবাস একদা তাঁহার নিকট বাগান বাঁধা রাখিয়া আড়াইশত টাকা ধার করিয়াছিল, সেই হ্যাণ্ডনোট ও দলিলটি তিনি বাড়ি হইতে আনাইয়া তাহার সম্মুখেই